সাদেক হুসাইন

পতনের ডাক

পতনের ডাক

রচনা
....
সাদেক হুসাইন
প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ
....
নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা
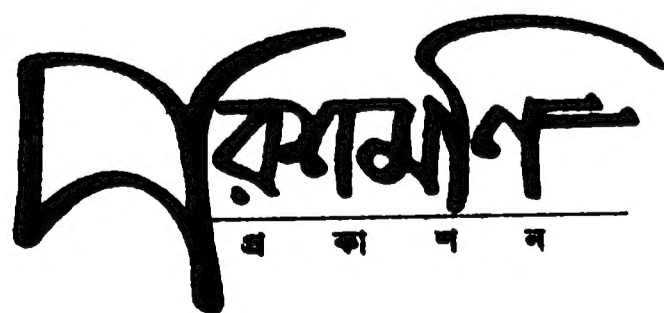
দোকান নং-৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

পৃষ্ঠা	২৪০, ফর্মা ১৫
পরশমণি প্রকাশনা	১৪
©	সংরক্ষিত
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
দ্বিতীয় প্রকাশ প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১০ ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ণ বিন্যাস	মুজাহিদ বিন গওহার জি গ্রাফ কম্পিউটার, মালিটোলা, ঢাকা
মুদ্রণ	জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস সেকশন, হাজারীবাগ, ঢাকা
ডিজাইন	নাজমুল হায়দার সাজ ক্রিয়েশন, ৮৬, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

ISBN-984-8754-00-8

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র / US $ 5

পতনের ডাক

এক.

বাগদাদ। স্বপ্নের নগরী। তিলোত্তমা নগরী। বিস্ময়কর নগরী। শোভা-সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য আর গঠন-শৌষ্ঠ্যবে গোটা বিশ্বে 'নগরকন্যা' নামে খ্যাত। যেনো এ যুগের প্যারিস। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখে যেমন পূর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থা আন্দাজ করা যায় না, তাদের শৌর্য-বীর্য, ক্ষমতা ও দাপটের কথা কল্পনা করা যায় না; তেমনি আজকের বাগদাদকে দেখে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সেই 'নগরকন্যা' বাগদাদের কথা ভাবা যায় না। পত্তনলগ্ন থেকেই বাগদাদ 'নগরকন্যা' নামে বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। অট্টালিকা– দূর-দিগন্ত পর্যন্ত অট্টালিকার বহর। অনেকে একে 'অট্টালিকা নগরী' নামে চিনতো, 'অট্টালিকা নগরী' নামে অভিহিত করতো।

গভীর রাত। বাগদাদের জনগণ সুখনিদ্রায় অচেতন। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। যেনো মরণকাঠির ছোঁয়ায় ঘুমিয়েপড়া নগরী। ঠিক তখন দজলা নদী থেকে কেটে আনা এক নহরের পাশে কয়েকটি পাকা কূপ তৈরি করা হচ্ছিলো। কেউ যদি তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে, তবে মাসের পর মাস মেহনত করেও তা ভাঙা সম্ভব নয়।

কূপগুলো আয়েশী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ'র নির্দেশে তৈরি হচ্ছিলো। অত্যন্ত রহস্যঘেরা, বিস্ময়কর এই কূপগুলো। খলীফা প্রায়ই কূপ খননকাজ পরিদর্শন করেন, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন, দ্রুত তৈরির তাগিদ দেন। খলীফা ছাড়া কেউ জানতো না, কেনো এই কূপগুলো বানানো হচ্ছে। কী তার লক্ষ্য। কী তার উদ্দেশ্য।

কূপগুলো দ্বি-তল। নীচের অংশের ছাদ চুন-সুরকিতে নির্মিত। উপরের অংশের কাজও প্রায় সমাপ্ত। আর অল্প কাজ বাকি। তাই কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ও জুগালি রেখে অন্যদের বিদায় দেয়া হয়েছে। এই রাতের অন্ধকারেই তারা কয়েক ঘন্টায় কাজ শেষ করে ফেলবে।

কূপগুলো নির্মাণকারী রাজমিস্ত্রি, এমনকি এ কাজের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও দারুণ বিস্মিত। তাদের মনেও প্রচণ্ড কৌতূহল। কূপগুলো নির্মাণের রহস্য তারাও জানে না। শুধু কি তারা? খলীফার একান্ত পরামর্শদাতা, ইয়ার–

বন্ধুরাও এর রহস্য অনবহিত। আর জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া, সে তো এক অসম্ভব ব্যাপার। এমন দু:সাহস কারো নেই। খলীফার নির্দেশে কূপগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, ব্যস এ পর্যন্তই। এর বেশি কেউ কিছু জানে না।

শাহীমহল থেকে নহর পর্যন্ত– নহরের উভয় পাশে কড়া ফৌজি প্রহরা বসানো হয়েছে। নহরসংলগ্ন পার্ক বা বাগ-বাগিচাগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে কেউ যেনো এদিকে এসে না পড়ে, তাই এই প্রহরার আয়োজন। নহরের তীর, কূপের আশপাশ এবং রাস্তা থেকে এতোদূর পর্যন্ত ফৌজি প্রহরা বসানো হয়েছে যে, কেউ যেনো বুঝতে ও জানতে না পারে, কারা রাতের অন্ধকারে এখানে এলো এবং গেলো। কূপে যেসব রাজমিস্ত্রি ও জুগালি এতোক্ষণ কাজ করছিলো, তাদের এখন দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর শাহীমহল থেকে গাড়ির আগমন শুরু হলো– খটা খট্ খট্, খটা খট্ খট্। গাড়ির শব্দে মনে হচ্ছে শাহী খান্দানের মহিলারা কূপগুলো দেখতে আসছে।

পূর্ণিমার চাঁদ। পৃথিবীভরা আলো। চারদিকে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। তবুও এদিক-সেদিক আবছা অন্ধকার। আকাশে প্রচুর মেঘের আনাগোনা। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়লে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। আবার মেঘ সরে গেলে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ে। জ্যোৎস্নায় তখন সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠছে।

শাহীমহল থেকে কূপগুলোর দিকে একের পর এক গাড়ি আসা-যাওয়া করতে লাগলো। গাড়ির আওয়াজে রাতের নীরবতা ও নিস্তব্ধতা বারবার ভেঙে খান খান হচ্ছিলো। এই আওয়াজ শুনে রাতের অন্ধকারেও কিছু উৎসুক মানুষ এগিয়ে এলো। কিন্তু ফৌজি প্রহরীরা তাদের আসতে বাধা দিলো। কাউকেই কূপের দিকে অগ্রসর হতে দিলো না। সরল ও ভীতু প্রকৃতির লোকেরা বিনা উচ্চবাচ্যে ফিরে গেলো। কোনো বাদানুবাদ করলো না।

ইতিমধ্যে এক যুবক এলো। বেশভূষা আর পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও উঁচু পরিবারের মনে হচ্ছে। তাকেও ফৌজি লোকেরা বাধা দেয়। সামনে যেতে দিলো না। যুবক অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। দারুণ সাহসী। বাধা পেয়ে যেনো আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠলো। তার জিজ্ঞাসা আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠলো। তার মনের কোণে তখন হাজারো প্রশ্ন। বাধা দেয়ার রহস্য কী? কী হচ্ছে রাতের অন্ধকারে? কী হচ্ছে কূপগুলোকে ঘিরে? কিন্তু কী করা, প্রহরী সিপাইদের বাধাও তো উপেক্ষা করা যায় না। তার মনের জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠলো। তার রহস্য আবিষ্কারের নেশা শক্তিশালী হয়ে ওঠলো।

বাধা পেয়ে যুবক পিছিয়ে এলো। সুযোগের সন্ধানে রইলো। সুযোগ পেলেই দে ছুট। একেবারে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু ফৌজি বেষ্টনী একেবারে নিশ্ছিদ্র।

তা ভেদ করে অগ্রসর হওয়া অচিন্তনীয়। তারপরও যুবক হতাশ হলো না। সামান্য পিছু হটে আবার অন্যদিক দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। এভাবে এক সিপাইর সম্মুখে গিয়ে পড়লো। সিপাই বাধা দিয়ে বললো, শোনো যুবক! নিজেকে ধ্বংস করো না, ফিরে যাও। এই বেষ্টনীর ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা।

কিন্তু যুবক হটলো না। সিপাইর নিকটবর্তী হয়ে বললো, আমি শুধু এটুকু জানতে চাই, এই গাড়িগুলো কেনো আসা-যাওয়া করছে?

ঃ এটা তো কেউ জানে না।

ঃ আমাকে অনুমতি দিলে আমি জেনে নিতাম।

ঃ আমি তো পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছি, এই বেষ্টনীর ভেতরে প্রবেশ করা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা।

ঃ আমার জীবনের প্রতি কোনো মায়া নাই, কোনো মূল্য নেই।

ঃ হয়তো কোনো রূপসীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন? তাই নয় কি?

ঃ ঠিক বুঝেছো। আমার সন্দেহ হয়, এখানে আমার প্রেমাষ্পদের উপর কেউ জোর-জুলুম করছে। তার সাথে কেউ জবরদস্তি করছে।

সিপাই যুবকের কথায় বিস্মিত হয়। যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, তার মানে তোমার প্রেমাষ্পদ শাহীমহলের কেউ হবে।

যুবক বললো, হ্যাঁ।

সিপাই বললো, আমি এ জন্য দুঃখিত, মর্মাহত। তবে সামনে অগ্রসর হয়ো না। এর বেশি অগ্রসর হবার অনুমতি নেই। চলে যাও। দূরে সরে যাও। দেখো, দেখো, ঐ যে অফিসার আসছেন! তিনি দেখলে হয়তো তোমাকে গ্রেফতার করবেন।

চাঁদের উপর থেকে মেঘখণ্ডটি সরে পড়তেই জ্যোৎস্নার আলোতে চারদিক আলোকময় হয়ে ওঠলো। যুবক দেখলো, সত্যিই তো অফিসার এদিকে আসছেন। মুহূর্তে যুবক সরে পড়লো। ইতোমধ্যে আরেকটি পুঞ্জিভূত মেঘমালা চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে দিলো। অন্ধকারের মধ্যে অদূরে দাঁড়িয়েই যুবক সিপাই ও অফিসারের কথা শুনতে লাগলো।

অফিসার বললো, তোমার সাথে কে যেনো কথা বলছিলো?

সিপাই বললো, এক সম্ভ্রান্ত যুবক। রাস্তা পর্যন্ত যেতে চাচ্ছিলো। আমি তাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি।

অফিসার বললো, সাবধান থেকো, কেউ যেনো ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। অন্যথায় খলীফার রূদ্ররোষ থেকে তুমিও রক্ষা পাবে না।

সিপাই বললো, চিন্তার কারণ নেই। আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন আছি।

আবার নীরবতা নেমে আসে। যুবক অফিসারকে চলে যেতে দেখে। ঘন মেঘমালার আঁধারে পূর্ণিমার চাঁদ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। ফলে চারদিকে গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। সে অন্ধকারে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

যুবক ভাবলো, এই তো সুবর্ণ সুযোগ। কাপড় গুটিয়ে আঁটসাঁট করে বেঁধে নিলো। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। যুবক ভয় পাচ্ছিলো– আল্লাহ না করুন, যেনো কোনো সিপাই'র সম্মুখে না পড়ি। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। নির্বিঘ্নে সে সিপাইদের বেষ্টনী ভেদ করে অনেক ভেতরে চলে গেলো।

আকাশ তখন মেঘে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টির ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়তে শুরু করেছে। যুবকের মাথায় রহস্য আবিষ্কারের প্রবল নেশা। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের আনাগোনা। দ্রুত রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো। হঠাৎ বিজলী চমকে ওঠলো। বিজলীর আলোতে যুবক দেখলো, সে প্রহরী সিপাইদের পেছনে ফেলে অনেক ভেতরে চলে এসেছে। এবার সে কূপগুলোর দিকে দ্রুত ছুটে চললো।

গাড়ি আসা-যাওয়া এখন বন্ধ রয়েছে। যুবক যখন কূপগুলোর কাছে পৌঁছে, তখন তার ঢাকনাগুলো বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলো। দুঃসাহসী নির্ভীক যুবক আরো অগ্রসর হলে খলীফার কণ্ঠ শুনতে পেলো– 'আল্লাহর শুকরিয়া, কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। মাটি দিয়ে বন্ধ করার কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন চারদিকে প্রশস্ত করে বালি ফেলে দাও।'

খলীফার কথা শুনে যুবক বিস্মিত হয়। এসবের রহস্য কী? এরই মধ্যে প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো।

খলীফা বললেন, এখন কাজ বন্ধ করো। বৃষ্টি হচ্ছে।

হঠাৎ বিজলী চমকে ওঠলে ক্ষণিকের তরে চারদিকে আলোকিত হয়ে ওঠলো। যুবক সে আলোয় রাজমিস্ত্রি ও জুগালিদের ফিরে যেতে দেখলো। কিছুক্ষণ পর তার বাঁ দিক দিয়ে একটি শাহী গাড়ি দ্রুত চলে গেলো। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। যুবক ভিজে একেবারে জবজবে। সে আর দেরি করলো না। ধীরে ধীরে ফিরে এলো।

দুই.

৬৫৫ হিজরীর কথা। মুস্‌তাসিম বিল্লাহ মুসলিম জাহানের খলীফা। ৬৪১ হিজরীতে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবু আহমদ। হাজেরা নাম্নী এক দাসির গর্ভে তিনি জন্মলাভ করেন। আলেম-ওলামার সাহচর্যে থাকাকালে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও পরহেজগার খলীফা ছিলেন। অত:পর কালের বিবর্তনে, সময়ের দোলাচলে তাঁর একদল ইয়ার-বন্ধু জুটে গেলো।

এদের সাহচর্যে তাঁর ধার্মিকতা ও পরহেজগারীতে চরম ভাটা পড়ে গেলো।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের ন্যায় দরবারে আম ও দরবারে খাসে উপস্থিত হতেন। ফরিয়াদ প্রার্থীদের ফরিয়াদ শুনতেন। জালিম থেকে মজলুমের হক আদায় করে দিতেন। ন্যায়-নীতির সাথে বিচার করতেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের ন্যায় তিনিও অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শুক্রবার জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন।

এটা ছিলো আব্বাসী খলীফাদের এক অম্লান ঐতিহ্য. এক গৌরবময় ইতিহাস। জুমার দিন মসজিদে যাওয়ার প্রাক্কালে খলীফার বিশেষ বাহিনী অত্যন্ত সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হতো। সারি সারি সিপাইর দৃশ্য ছিলো দারুণ বিস্ময়কর, অত্যন্ত মোহনীয়। সিপাইদের হাতে হাতে আব্বাসী পতাকা মুক্ত আকাশে পত্ পত্ করে উড়তো। খলীফা সিপাইদের মাঝে নিজস্ব পোশাকে শ্বেতশুভ্র ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর শরীরে আজানুলম্বিত কালো আলখেল্লা, কোমরে কারুকার্যখচিত কোমরবন্ধ শোভা পেতো। কাঁধে মূল্যবান পশমী চাদর আর মাথায় ঝুঁটিধারী এক অপূর্ব ভাঁজের সাথে লটকে থাকতো দামি দামি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড।

খলীফার পেছনে শাহজাদাদের অশ্ব এগিয়ে আসতো। এভাবে মসজিদে পৌঁছে খলীফা নিজেই জুমার নামায পড়াতেন। খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহর প্রথম কয়েক বছর এমনিভাবেই কাটে। কিন্তু চেতনার অধ:পতন আর কিছু ইয়ার-বন্ধুর অসৎ সাহচর্য তার সর্বনাশ ঘটালো। তিনি ধর্মীয় বিধি-বিধান উপেক্ষা করতে লাগলেন। নামায-রোযা পালনে অনিয়ম দেখা দিলো। এমনকি অম্লান ঐতিহ্য জামে মসজিদে যাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। নামায আদায়ও ছেড়ে দিলেন।

খলীফার দেখাদেখি শাহজাদা-শাহজাদী ও শাহী খান্দানের নর-নারীরাও নামায-রোযার গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। আগে রাস্তায়-রাস্তায়, মহল্লায়-মহল্লায়, ঘরে-ঘরে, আলেম-ওলামার ওয়াজের আয়োজন করা হতো। এখন তার পরিবর্তে গান-বাজনার আয়োজন শুরু হলো। ওয়াজ মাহফিলের পরিবর্তে নাচ-গানের আসর বসতে লাগলো।

খলীফার প্রভাব শাহজাদাদের মাঝে, শাহজাদাদের প্রভাব আমীর-ওমরার মাঝে আর আমীর-ওমরার প্রভাব জনসাধারণের মাঝে প্রতিফলিত হলো। আগে যেখানে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মুসল্লিতে মসজিদ ভরে যেতো, আজ বিভিন্ন বিপদে আপতিত কিংবা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে নিরুপায় হলে তখন শুধু বিপদমুক্তি ও রোগমুক্তির জন্যই মসজিদে আসে। আর যারা স্বচ্ছল-সম্পদশালী নবাব-জমিদার, তারা তো মসজিদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

তাদের অবস্থা ঠিক আমাদের বর্তমান অবস্থার মতো। তারা বিপথগামী

হয়েছিলো, আমরাও আজ বিপথগামী। তারা নামায ছেড়ে দিয়েছিলো, আমরাও নামায ছেড়ে দিয়েছি। তারা নামে মাত্র মুসলমান ছিলো, আমরাও নামে মাত্র মুসলমান রয়ে গেছি। তারা খেলাধুলায় মত্ত থাকতো, আমরাও তাতে মত্ত হয়ে গেছি। তারা নাচ-গান আর আনন্দ-উল্লাসে বিভোর ছিলো, আমরাও সংস্কৃতি চর্চার নামে আনন্দ-উল্লাস আর সিনেমা-টেলিভিশনে বিভোর হয়ে গেছি। তারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলো, আমরাও আল্লাহ তা'আলা ও পরকালকে ভুলে গেছি।

যুবক তখনও অন্য চিন্তায় বিভোর। অন্য ভাবনায় মশগুল। হাঁটতে হাঁটতে সে দজলার তীরে এসে পৌঁছলো।

দজলা। স্বচ্ছ ও নির্মল তার পানি। যেনো স্ফটিক। চারদিক থৈ থৈ করছে পানি। যেমন গভীর, তেমনি প্রশস্ত। ছোট-বড় অসংখ্য জাহাজ ও নৌকা তার বুকে ভেসে চলছে। দজলার উভয় পাশে শহর। তার কূলঘেঁষে বাগ-বাগিচা আর উদ্যান। মাঝে-মাঝে আমীর-ওমরার উঁচু অট্টালিকা। নদীর উভয় তীরে কয়েক মাইল পর্যন্ত মর্মর পাথরের তৈরি সিঁড়ি। স্বচ্ছ নীল পানিতে সাদা ধবধবে মর্মরের সিঁড়ির মিলনে এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

সিঁড়ির প্রান্তে ঘাট। ঘাটে ছোট-বড় নৌকা ও জাহাজ দূর পর্যন্ত ভিড়ে থাকতো। ঘাটটি কয়েক মাইল দীর্ঘ। বজরায় চড়ে যখন অপ্সরী সাদৃশ সুন্দরী রূপসী শাহজাদী আর আমীর-উজীর কন্যারা ঘুরে বেড়াতো, তখন এক বিস্ময়কর মোহনীয় দৃশ্য ফুটে ওঠতো। বজরাগুলো নিখুঁতভাবে সজ্জিত এবং অত্যন্ত মনোরম ছিলো।

যুবক যখন সিঁড়িতে পৌঁছলো, তখনও অনেক নৌকা-বজরা নদীর এপার থেকে ওপার যাচ্ছিলো। তীরে দাঁড়িয়ে যুবক বজরাগুলো দেখছিলো। হঠাৎ নিকটেই বিস্ময়ভরা এক কণ্ঠ ভেসে এলো– 'আরে! আহমার যে!'

যুবকের নাম আহমার। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, তারই সমবয়সী এক যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে নির্মল হাসি। আহমার বললো, আচ্ছা, আহমদ আবুল কাসেম ভাই নাকি?

আহমার ও আহমদ আবুল কাসেম আব্বাসী শাহাজাদাদের পোশাক পরিহিত। আজানুলম্বিত কালো আলখেল্লা। মাথায় ঝুঁটিদার আকর্ষণীয় তাজ।

আহমদ বললো, সেই সকাল থেকে তোমাকে খুঁজে ফিরছি। পাচ্ছি না। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এলাম আর তোমাকে পেয়ে গেলাম। নাজমা রাতে তার এক বান্ধবীর নিকট গিয়েছিলো। এখানে আসবে।

আহমদ যদিও দ্রুততার সাথে কথগুলো বললো; কিন্তু আহমারের চেহারা দেখে মনে হলো, সে কী যেনো গভীরভাবে চিন্তা করছে। আহমার শান্তকণ্ঠে বললো, আচ্ছা

আহমদ! তুকি কি জানো, খলীফা এই নহরের পাড়ে কয়েকটি কূপ নির্মাণ করেছেন?

ঃ শুনেছি, তবে দেখিনি।

ঃ আমি দেখেছি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তা জমিনের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছ। কেনোই তিনি হাউজ বানালেন আবার কেনোই বা তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন?

আহমদ বিনীত কণ্ঠে বললো, শোনো বন্ধু, এর রহস্য উদঘাটনের পেছনে পড়ো না। এর আলোচনাও করো না। অন্যথায় কঠিন বিপদে পড়বে।

আহমার বললো, সতর্ক থাকবো। অত্যন্ত হুঁশিয়ার থাকবো। ও, তুমি নাজমার কথা কী যেনো বলছিলে?

আহমদ হেসে ফেললো। বললো, ঘুমিয়ে ছিলে, না বেঁহুশ ছিলে?

ঃ আমি অন্য চিন্তায় নিমগ্ন। আমি বিভোর। তাই...।

ঃ নাজমা রাতে তার বান্ধবী সাইফার নিকট গিয়েছিলো। এখন তার বজরা আসবে। আমি তাকে নিতে এসেছি।

ঃ তুমি নাজমার সাথে যাওনি?

ঃ না।

ঃ তোমার সামনেই কি নাজমা বজড়ায় চড়েছিলো?

ঃ হ্যাঁ, তোমার কি তাতে কোনো সন্দেহ আছে?

ঃ না।

ঃ দেখো, ঐ তো বজরা আসছে।

একটি সুদৃশ্য বজরা ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। উভয়ের দৃষ্টি বজরার দিকে। দেখতে দেখতে বজরা তীরে এসে ভিড়ে। এক অপ্সরী বজরা থেকে নেমে এলো। মোহমাতাল চেহারা। গায়ে কালো রেশমী পোশাক। স্বর্ণখচিত মুক্তার অলংকার। যেনো পূর্ণিমার ভরা চাঁদের উপচেপড়া জ্যোৎস্না তার চেহারায়। মুক্তাখচিত অলংকারের জ্যোতিতে তার কপোল ঝলমল করছে।

এই যুবতীরই নাম নাজমা। আহমদ আবুল কাশেমের বোন। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে সে যখন উপরে উঠে আসছিলো, তখন যেনো তার সামনে আলোর বৃষ্টি হচ্ছিলো। খলীফা মুস্‌তাসিম বিল্লাহর যুগে মেয়েদের পর্দাও শিথিল করা হয়েছিলো। তাই তারা খোলামেলা চলাফেরা করতো।

আহমারের প্রতি নাজমার দৃষ্টি পড়তেই তার চক্ষু ঝিলমিলিয়ে ওঠলো। নাজমা আহমদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

আহমদ জিজ্ঞেস করে, তোমার বান্ধবী আসেনি?

ঃ না, সে সন্ধ্যায় আসবে।

ঃ ভাবছিলাম, তোমার সাথে তোমার বান্ধবীও থাকবে। তুমি একা আসবে

বুঝলে আমরা এগিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতাম। প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিলো নৌ-বিহারে যাত্রা করার। চলো, এখনই নৌ-বিহারের আয়োজন করি।

ঃ কিন্তু...। বলেই নাজমা থেমে যায়।

আহমদ বললো, কিন্তু কী?

এখন ভ্রমণে মজা হবে না। আমাদের সাথে সুরেলা গায়িকা নেই, নেই পেশাদার নৃত্য পরিবেশনকারী ঊর্বশী মেয়ে। তবে একজন মোল্লা আছে বটে।

একথা বলে নাজমা দুষ্টু চোখে আহমারের দিকে তাকায়।

আহমার হেসে বললো, আরে এ তো কেবল মোল্লা নয়। তোমার কোনো আনন্দ-অনুষ্ঠান কী তার হাত ছাড়া হয়? প্রকাশ্যে না হলে গোপনে তো অবশ্যই...।

নাজমা বললো, তাই তো তোমাকে সাহসী রুস্তম বলতে ইচ্ছে হয়।

আহমার বললো, আপাতত তোমাকে কোনো বিশেষণে মণ্ডিত করছি না। তবে এই যে আহমদ...।

আহমদ তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললো, এই তো বলবে, লোকটা বিলাসী। পাকা নেশাখোর।

আহমার বললো, আমি তোমাকে বিলাসী-নেশাখোর বলবো না বটে; তবে তুমি যে কৌতুকপ্রিয় মানুষ এ কথা সত্য।

নাজমা আহমারের কথা শুনে হাসতে থাকে। গোলাপ-পাঁপড়ির মতো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পায় তার মুক্তার মতো উজ্জ্বল দাঁতগুলো। মনে হচ্ছে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দিয়ে বিজলীর আলো ঠিক্‌রে পড়ছে।

হাসতে হাসতে নাজমা বললো, ভাগ্য ভালো তোমাকে 'কৌতুকপ্রিয়' বলে ক্ষান্ত করেছে। ভাবছিলাম, হয়তো তোমাকে সে 'পাপপ্রিয়'ই বলবে।

আহমদ বললো, এসব আলাপ এখন রাখো।

আহমার বললো, আমি না হয় না বললাম, কিন্তু সকলে উপলব্ধি করছে। এখন মুসলমানরা নারীর আঁচলে জড়িয়ে যেভাবে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আল্লাহকে ভুলে গেছে, তা দেখে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। আমার ভয় হয়, এ দেশে আল্লাহর গজব পতিত না হয়!

ঃ নিশ্চিত থাকো, আল্লাহ আমাদের উপর গজব নাযিল করবেন না।

ঃ মানুষ যেভাবে পাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা দেখে আল্লাহ গজব নাযিল হওয়ার আশংকা হচ্ছে। তাছাড়া আমরা যে এক ভয়াবহ পতনের দিকে এগুচ্ছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

নাজমা বললো, যদি কখনো আমাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয়ও, তবুও

আমি এতোটুকু নিশ্চিত যে, অন্তত সে গজব তোমাকে স্পর্শ করবে না।

আহমার বললো, আমি তো তোমাদেরই একজন।

নাজমা বললো, তুমি কেনো খোদার নিকট কহর ও গজবের জন্য দোয়া করছো?

ঃ আমি তো খোদার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করছি। গজব প্রার্থনা করবো কেনো? তবে মুসলমানের বদ-আমল দেখে আমার শরীর আল্লাহর গজবের ভয়ে কেঁপে ওঠে।

আহমদ বললো, আচ্ছা মোল্লাজী! এসব আলাপ রেখে আমাদের সাথে চলো। সফরের স্বাদটা নষ্ট করে দিও না।

আহমার মৃদু হেসে বললো, তুমি কোন্ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছো?

আহমদ বললো, এটাকেই সফর মনে করতে পারো। আজ আমরা বজরায় চড়ে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যাবো।

নাজমা বললো, এই সফরে তার মত নেই মনে হয়।

আহমদ বললো, সে অমত করে পালাবে কই? এসো ভাই আহমার!

ঃ আচ্ছা, চলো।

তিনজন সিঁড়ি ভেঙে নীচে এসে একটা বজরায় চড়ে বসে। মাঝিরা তাদের বসিয়ে দিয়ে বৈঠা হাতে জোরছে বাইতে শুরু করে।

বজরাটা চমৎকার। তাতে ছোট তিনটি কক্ষ। কক্ষগুলোর সাথে এক চিলতে বারান্দার সামনে এক প্রশস্ত উঠান। কাঠের তৈরি কক্ষগুলো সোনা-চাঁদীর জড়োয়া দিয়ে সাজানো। দরজায় রেশমি কাপড়ের পর্দা ঝুলানো। বারান্দায় বসার জন্য দামি সোফা। সোফার আসনের কভারগুলো ফুলদার রেশমি কাপড়ের। বজরার ভেতরে সম্পূর্ণ শাহী ব্যবস্থাপনা।

তিনজন বাইরে সোফায় বসেছে। দ্রুত চলছে বজরা। আগে-পিছে চলছে বহু বজরা। কেউ যাচ্ছে সোজা দূরে। কেউ যাচ্ছে এপার থেকে ওপারে।

নৌকায় মহিলা-পুরুষ সকল আরোহী উত্তম পোশাকে সজ্জিত। নৌকায় ভ্রমণ করছে ধনী-গরীব সব শ্রেণীর লোক। মহিলারা হেজাব ছাড়া। মহিলাদের কারো সাথে রয়েছে পিতা, কারো সাথে ভাই, কারো সাথে স্বামী। আবার কারো কারো সাথে রয়েছে প্রেমিক।

নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী সকলের মনে আনন্দের বন্যা। খুশিতে সকলের চেহারা উজ্জ্বল। দুঃখের লেশমাত্র নেই কারো চেহারায়।

আল্লাহ বাগদাদবাসীকে দিয়েছিলেন অফুরন্ত সুখ। কারো কোনো অভাব ছিলো না। প্রচুর সম্পদ ছিলো সকলের ঘরে। বাগদাদবাসীর উচিত ছিলো, তাদের প্রতি আল্লাহর এই উদার নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া। কিন্তু উল্টো তারা বিত্ত-বৈভব

ও আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো আল্লাহর কথা। সম্পদের গরমে তারা ছিলো মদমত্ত। কোনো চিন্তা ও শংকা স্পর্শ করতো না তাদের হৃদয়-মন।

এক তালে চলছে নাজমার প্রমোদ তরী। তরীতে বসে চমৎকার দেখাচ্ছে দু'কূলের শ্বেত পাথরে নির্মিত সফেদ সিঁড়িগুলো। একটি তরী তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে তরী থেকে ভেসে আসছিলো হৃদয়কাড়া গানের সুর। সবাই খেয়াল দিয়ে শুনছিলো সে গান।

আহমদ বললো, সম্ভবত এ বজরাটা উজিরকন্যাদের।

ঃ হ্যাঁ, এটিতে হাজেরা আছে। হাজের ও তার খান্দানের মেয়েরা একসাথে গান গাইছে।

ঃ দারুণ গাইছে তো ওরা!

ঃ ওরা তো নিয়মিত সঙ্গীতের তালিম নেয়।

সে যুগে শাহজাদী ও বেগমরা নিয়মিত সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো।

আহমদ যথেষ্ট আগ্রহের সাথে বললো, হাজেরা তো তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

নাজমা হেসে বললো, সে অপূর্ব সুন্দরী, মায়াবী তার অবয়ব।

এক সময় উভয় বজরা কাছাকাছি হয়ে যায়। হাজেরা ও অন্যান্য মেয়েরা অপরূপ সাজে উপবিষ্ট। তারা হৃদয়কাড়া গানের ঝড় তুলছিলো শান্ত নদীর নীলবক্ষে। সকলের নজর ঐ বজরার দিকে।

হাজেরার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে শাহজাদা আহমদ। এমন সময় চলন্ত বজরাদ্বয়ের ঢেউয়ে উভয় বজরায় পানি ছিটকে ওঠে। হাজেরা ও তার বান্ধবীরা ভিজে যায়। ভিজে যায় নাজমা, আহমার ও আহমদ। হো হো করে হেসে ওঠে হাজেরা ও তার বান্ধবীরা। এ অবস্থা দেখে নাজমাও দুষ্টুমী করে হাসে।

আহমার মুখ ভার করে বললো, বেকুবরা আমাকে ভিজিয়ে দিলো।

আহমদ বললো, দেখছো না, ওরাও তো ভিজেছে।

ওদের বজরা থেকে সঙ্গীতের সুর এখনো ভেসে আসছে। আহমদের খেয়াল সেই দিকে। তাদের বজরা এক তালে সামনে এগিয়ে নদীর মোহনায় গিয়ে পৌছে।

এখানে রয়েছে যুদ্ধ নৌ-জাহাজের বিশাল প্লাটফর্ম। বহু জাহাজ নোঙর ফেলে নদীবক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। সেসব জাহাজে পত্ পত্ করে উড়ছিলো আব্বাসীয় খেলাফতের শানদার নিশান। জাহাজের চতুর্দিকে কড়া পুলিশী পাহারা। যুদ্ধ নৌ-বহরের নিরাপত্তায় ছোট নৌকায় চড়ে পুলিশী পাহারা চলতো সর্বক্ষণ। নৌ-বহর থেকে সুঠামদেহী সিপাইদের উজ্জ্বল পোশাক ও আধুনিক হাতিয়ার চকচক করছিলো।

এদের বজরা নৌ-জাহাজ এড়িয়ে পাশ কেটে যাচ্ছিলো। এর মধ্যে তারা দশ মাইল পথ চলে এসেছে। এখনো শেষ হয়নি বাগদাদ শহর।

আহমদ বললো, চলো, এবার ফেরা যাক।

আহমার বললো, এখনই ফিরে যেতে চাচ্ছো কেনো?

আহমদ বললো, এতোদূরে কোনো বজরা আসে না, আশপাশে কোনো বজরা দেখা যাচ্ছে না। এখন ফিরে যাওয়াই ভালো।

নাজমা বললো, ও সময় তোমার বজরাটা থামালে আমি হাজেরাকে অবশ্যই রাতের খানার দাওয়াত দিতাম।

আহমদ বললো, ও রাতের খানা আমাদের মহলে আমার সাথেই খাবে।

নাজমা বললো, মোল্লাজী! রাতের খানায় তোমারও দাওয়াত রইলো।

আহমার বললো, শুকরিয়া।

নাজমা বললো, মনে হয় আমার দাওয়াত কবুল করেছো।

আহমদ বললো, কেনো দাওয়াত কবুল করবে না?

আহমার বললো, তোমার পক্ষ থেকে দাওয়াত পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

নাজমা টিপ্পনি কেটে বললো, বহুত বহুত শুকরিয়া।

আহমদ মাঝিকে বললো, বজরা ঘোরাও, ফিরে চলো।

বজরা ফিরে চলছে। তারা নদীর মোহনা পেরিয়ে আসে। আহমার উঠে বজরার এক কোণায় এসে বসে। আহমদ তার কানে ছোট্ট করে বলে, কাল খলীফা তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। সারাটা রাত আমার দুশ্চিন্তায় কেটেছে।

নাজমা বললো, তোমার চলে যাওয়ার পর খলীফার বিরক্তি ভাব দূর হয়ে গেছে।

আহমার বললো, খলীফা যে কূপ বানিয়েছিলেন...।

নাজমা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করে বললো, ভুলেও কূপের কথা উল্লেখ করো না।

কিছুক্ষণ পর বজরা কূলে এসে ভিড়ে। তারা একে একে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে।

তিন.

আমরা আলোচনা করছি তৎকালীন বাগদাদের কথা। রূপ-সৌন্দর্যে পৃথিবীর সেরা শহর ছিলো বাগদাদ। তাই এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই বাগদাদের গোড়ার ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে। এতোটুকু অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, কে বাগদাদের পত্তন করেছেন এবং কীভাবে এ শহর উন্নতির শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আব্বাসীয় ধারার দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর এই শহরের পত্তন করেন, এই শহরের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শহর প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ ১৪৯ হিজরীতে শেষ হয়।

এখানে এ শহরটি গড়ে তোলার কারণ হলো, প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস- যিনি সাফ্ফাহ্ নামে পরিচিত ছিলেন- তাঁর রাজধানী ছিলো আম্বার নামক শহরে। কিন্তু ঐ এলাকায় রাওয়ান্দীয়া নামক এক ভ্রান্ত ফেরকার জোর তৎপরতা ছিলো। রাওয়ান্দীয়ারা ভংঙ্কর ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ইরান ও খোরাসানের এক শ্রেণীর জাহেল লোক এই ফেরকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের বিশ্বাসের সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তারা পৃথিবীতে মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলো। তারা বিশ্বাস করতো, হযরত আদম (আ.)-এর রূহ ওসমান ইবনে হুসাইন ও জিব্রীল (আ.)-এর রূহ হাইশাম বিন মাইবিয়ার মধ্যে থেকে আল্লাহ জাফর বিন মনসুরের রূহের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উপরন্তু তারা আবু জাফর মনসুরের জেয়ারতকে প্রধান ইবাদত মনে করতো। তারা ব্যাপকহারে আম্বার শহরে বসতি গড়তে থাকে। তারা তাদের বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে। খলীফা তাদেরকে বুঝালেন এবং বললেন, তোমাদের এ বিশ্বাস ভুল। মনসুর খোদা নয়; বরং সে খোদার এক নগণ্য গোলাম মাত্র। কিন্তু এসব কথায় কোনো কাজ হলো না। তারা তাদের বিশ্বাসে অনড় রইলো।

অগত্যা খলীফা এদের দু'শ লোককে গ্রেফতার করে জেলে পুরেন। ফলে রাওয়ান্দীয়ারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। প্রথমে তারা কয়েদখানা অবরোধ করে তাদের স্বধর্মীয়দের মুক্ত করে আনে। এরপর তারা অবরোধ করে সম্রাটের রাজমহল। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন রাজমহলে সেনাবাহিনীও ছিলো না। ছিলো শুধু রাজমহলের প্রহরী-চৌকিদাররা। বিপুলসংখ্যক জঙ্গী অবরোধকারীকে দমন করা কিছুসংখ্যক পাহারাদারের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। তবুও তারা পাইক-পেয়াদাসহ দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। খলীফাও শাহীমহল থেকে বেরিয়ে এসে তরবারী হাতে ওদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। হাস্যকর ব্যাপর হলো, এ পর্যায়ে ভ্রান্ত রাওয়ান্দীয়ারা সরাসরি তাদের খোদার মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যাকে তারা খোদা বলতো এবং যাকে জেয়ারত করা ছিলো তাদের মতে ফরয ইবাদত, তারা এখন তাঁরই সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

খলীফা মনসুর এই বিদ্রোহ দমনের সাথে সাথে রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি রাজধানীর জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে থাকেন। তিনি একদিন দজলার তীরবর্তী শস্য-শ্যামলিমায় ঘেরা নয়রাভিরাম এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। জায়গাটা তাঁর বেশ ভালো লাগে। তখন সেখানে খৃস্টবাদী নস্তুবা ফেরকার বহু বসতি ছিলো। সেখানে থাকতো বহু ধর্মযাজক। সেই যাজকরা খলীফা মনসুরকে বলে, এই দেশের মধ্যে উত্তম হলো এই এলাকার ক্ষেত-খামার ও ফল বাগান। এ এলাকায় পঙ্গপালের উপদ্রব নেই, নেই একটি মশাও।

গ্রীষ্মকালে রাতে শীতল আবেশে মানুষ গভীর নিদ্রায় ঘুমায়। শীতকালে হাল্কা শীত নামে। মানব বসতির জন্য এটি উপযুক্ত স্থান বটে।

এক খৃস্টান যাজক বললো, আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি ফোরাত ও দজলার মাঝামাঝি এই এলাকায় বিশাল এক শহর গড়ে তুলবেন। তার নাম হবে 'মেকলাস'। খলীফা বললেন, আমার নামও তো মেকলাস। দুধমা আমাকে এই নামে ডাকতেন। তিনি আরো বলেন, এই নাম রাখার কারণ হলো, ঐ সময় মেকলাস নামক বিখ্যাত এক ডাকাত ছিলো। আমি তখন ছোট। আমি একদিন দুধমায়ের কাপড় বুননের সুতার লড়ি চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে দেই। দুধমা বিষয়টা জানতে পারলেন। সেই দিন থেকে তিনি আমাকে মেকলাস বলে ডাকতে শুরু করেন।

মনসুর জানতে পারলেন, এ এলাকার নাম বাগদাদ। বহুকাল পূর্বে এখানে বিশাল বিশাল বাগান ছিলো। ছিলো বৃক্ষঘেরা জঙ্গল। ন্যায় বিচারের কিংবদন্তি ইরানের বাদশাহ্ নওশেরাওয়ার বিচারালয় ছিলো এ এলাকায়। যেহেতু মজলুমরা এখানে তাদের জুলুমের 'দাদ' বা প্রতিকার পেতো, তাই পারবর্তীতে এ এলাকা 'বাগদাদ' নামে পরিচিতি পায়।

জায়গাটা মনসুরের পছন্দ হয়। তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত ইমাম আজম আবু হানিফাকে (র.) অবহিত করেন। ইমাম আজম ছিলেন দক্ষ প্রকৌশলী। তাই তাঁকেই দায়িত্ব দেয়া হয় শহরের নক্শা প্রণয়নের। একই সাথে বাবেল, মোসেল, সিরিয়া ও পারস্য থেকে দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। নিয়োগ করা হয় হিসাবরক্ষক ও তদারককারী। কারীগরদের বলে দেয়া হয়, ইমারতগুলো নির্মাণ হবে প্রাচ্য ধাঁচে।

ইমাম আযম আবু হনীফা (র.) শহর ও শাহীমহলের নক্শা তৈরি করে মনসুরকে দেখান। নক্শাটি মনসুরের অত্যন্ত পছন্দ হয়। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর মনসুর নিজ হাতে ১৪৭ হিজরীতে বাগদাদ শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রথম পাথরটি স্থাপনের সময় তিনি একটি আয়াত পাঠ করেন। যার অর্থ হলো– 'পৃথিবীর সকল যমীন আল্লাহ'র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এর কর্তৃত্ব দান করেন।'

বিপুলসংখ্যক কারিগর ও শ্রমিক-কর্মচারির লাগাতার তিন বছর কাজ করার পর ১৪৯ হিজরীতে শহরের প্রাথমিক কাজ শেষ হলে মানুষের বসতি শুরু হয়। মনসুর এ শহরের নাম রাখেন 'মদীনাতুল ইসলাম'। কিন্তু এই নাম সাধারণ মানুষের নিকট অপরিচিত থেকে যায়। কেবল সরকারী দপ্তর ও দলিলপত্রে এ নাম ব্যবহৃত হতো। সেই থেকে আজ অবধি দেশ-বিদেশে সকলের নিকট এ শহর 'বাগদাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

মনসুর এ শহরটি দজলার এক পাড়ে বৃত্তাকারে গড়ে তুলেন। শহরের ভেতরের প্রান্তে তৈরি করা হয় দীর্ঘ খন্দক। খন্দকের পাড়ে তৈরি করেন শহরব্যাপী শক্ত প্রাচীর। প্রাচীরে প্রবেশদ্বার রাখেন মাত্র চারটি। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারের উপর একটি করে স্বর্ণালী গম্বুজ তৈরি করেন। প্রতিটি প্রবেশদ্বার এতোটুকু উঁচু ছিলো যে, ঘোড়সওয়ার বর্শা উঁচু করে অবলীলায় তা দিয়ে চলে যেতে পারে।

নগর প্রাচীরের ভেতরে সামান্য দূরে তৈরি করা হয়েছিলো আভ্যন্তরীণ প্রাচীর। এই প্রাচীর তৈরি হয়েছিলো শাহীমহল ঘিরে বিশাল এলাকা জুড়ে। শাহীমহলে 'আল-খুল্‌দ' এর একটি তোরণ ছিলো স্বর্ণের তৈরি। যাকে বলা হয় 'বাবুয্‌যাহাব'।

শাহীমহলে আল-খুল্‌দের পাশেই একটি সুন্দর মসজিদ ছিলো। মসজিদের বিপরীত পাশে ছিলো শাহজাদাদের বালাখানা ও শীর্ষ আমলাদের বাসভবন। এর পাশ ঘেঁষে তৈরি হয়েছে অস্ত্রাগার, কোষাগার ও সরকারী অফিস-আদালত। এককভাবে এ এলাকাটিকেই এক বিশাল শহর বলা চলে! আলাদা প্রাচীর ঘেরা এই মহলকে 'মদীনাতুল মনসুর' বলা হতো।

তাঁর সময়ে যুবরাজ মাহদী দজলার ওপারে 'মাহদী নগরী' নামে শহর গড়ে তোলেন। একেও বৃত্তাকারে গড়ে তোলা হয়েছিলো। এই শহরও বাগদাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে নদীর উভয় তীর ঘিরে গড়ে ওঠে বিশাল শহর বাগদাদ। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদ শহর বারো মাইল দীর্ঘ পরিধি লাভ করে। শহরের ভেতর থেকে যে সড়কটি সোজা নদীর তীরে গিয়ে মিলিত হয়েছে, সেটিরও দৈর্ঘ্য বারো মাইল। শহরের রাস্তাগুলো ছিলো খুবই চওড়া। সাধারণ রাস্তাগুলো চওড়া ত্রিশ ফিট করে এবং বড় রাস্তাগুলো ষাট ফিট। এ সড়কগুলো শহরকে বহু অংশে ভাগ করে ফেলে। যার প্রতিটি অংশকে মহল্লা বলা হয়। প্রতিটি মহল্লার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলো একজন করে দারোগা। প্রতিটি গলি ও সড়কের মাথায় একজন সান্ত্রী সার্বক্ষণিক পাহারায় নিয়োজিত থাকতো। এই সান্ত্রীদেরকে বলা হতো 'আসহাবুল উরবু'।

নদীর উভয় তীরে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দু'টি টাওয়ার ছিলো। তাতে ফৌজি পাহারা থাকতো সার্বক্ষণিকভাবে। শহরের উত্তর পাশে দজলা থেকে কেটে বহু খাল প্রবাহিত করা হয়েছে শহরের মধ্য দিয়ে। সেইসব খাল থেকে পানির সংস্থান করতো প্রতিটি পরিবার। পার্ক ও বাগ-বগিচায় পানির কখনো সমস্যা হতো না।

শাহীমহল ছিলো বিশাল এলাকা জুড়ে। দেখতে অত্যন্ত শানদার। খলীফার বাসভবন 'কসরুল খুল্‌দ' ছিলো এক বিশাল পার্কের মধ্যখানে। ওই পার্ক অতিক্রম করতে সময় লাগতো কয়েক ঘন্টা। শাহী মহলের ভেতর চিড়িয়াখানাও ছিলো। পশু-পাখির স্থান ছিলো আলাদা আলাদা। মহলের মধ্যে ছিলো বিশাল বিশাল মাঠ, ফল ও ফুলের বাগান।

নদীর উভয় তীরে ছিলো সারি সারি ফলের বাগান। ফুলের বাগানে ফুটে থাকতো জানা-অজানা নানা রঙের ফুল। এর ঘ্রাণে মৌ মৌ করতো চারদিক। বাগদাদের প্রতিটি পরিবার ও মহলের পাশে ফুল ও ফুলের বাগান ছিলো আবশ্যকীয়। আলীশান মসজিদ ছিলো। হাম্মামখানা ছিলো অসংখ্য। বাজার ছিলো বহু। প্রতিটি দোকান ছিলো মালপত্রে ঠাসা। তখন বাগদাদে লোকসংখ্যা ছিলো বিশ লাখ।

চার.

শাহজাদা আহমার। মুসতাসিম বিল্লাহর ভাই আফাজীর পুত্র। মুসতাসিম বিল্লাহ হলেন মুনতাসির বিল্লাহর পুত্র। এই মুস্‌তাসিম বিল্লাহ হলেন বর্তমান খলীফা। আহমার খলীফার চাচাতো ভাই।

তার বাসবভন শাহীমহলে 'কসরুল খুল্‌দ'-এর সন্নিকটে। আহমদ আবুল কাসেমের বাসভবনও তার বাসভবনের নিকটে। উভয় বাসভবনের মাঝে এক নয়নাভিরাম উদ্যান, ফুলের বাগান। এর মাঝদিয়ে কুল কুল রবে প্রবাহিত ঝর্নাধারা। উভয় মহলের সীমানার মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফলের বাগান। বাগানের ভেতর একাধিক ফোয়ারা। অফুরন্ত বিত্ত-বৈভবের মাঝে কাটতো তাদের বিলাসী জীবন।

শাহজাদী নাজমা আহমারকে সন্ধ্যায় দাওয়াত দিয়েছিলো। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করে আহমার মহলের দিকে পা বাড়ালো। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে কৃত্রিম আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শাহীমহল। বাগানগুলোও হয়ে ওঠে আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত।

আহমার বাগানের মধ্যদিয়ে মাঠের অপর প্রান্তে শাহীমহলের বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। বেলকনির উপর সাদা সিমেন্টের আস্তরণ। তার গা ঘেঁষে বেড়ে ওঠা উঁচু শাহীমহলও ধবধবে সাদা। বাগানের বিচ্ছুরিত আলোয় জ্বলজ্বল করছিলো সাদা মহলগুলো।

আহমার বেলকনি পেরিয়ে শাহীমহলে প্রবেশ করে একটা কক্ষ পেরিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে চলে আসে। প্রতিটি কক্ষের দরজাগুলোয় ঝুলছে ভারী রেশমি পর্দা। নীচে বিছানো মূলবান কার্পেট। বিস্তীর্ণ ছাদ। সোনালী রঙে উজ্জ্বল দেয়ালগুলো ডোরাকাটা সবুজ, সোনালী ও আকাশী রং। প্রতিটি কক্ষের ছাদ ও দেয়ালের রং ভিন্ন। দেয়ালের রঙের সাথে মানানসই করে ঝুলানো দরজার পর্দাগুলো।

প্রতিটি কক্ষ চীনা ফুলদানী ও সোনা-রূপার বাহারী আসবাপত্রে সুসজ্জিত। কক্ষগুলো এতো বেশি আলোয় উদ্ভাসিত যে, সামান্য একটি সূঁচ পড়ে থাকলেও

তা চোখে পড়ছে। বহু দাসি আছে এ মহলে। তারা ব্যস্ত বিভিন্ন কাজে।

আহমার দেখলো, নাজমা এক কক্ষে বসে আছে। তার মাথায় শোভা পাচ্ছে সোনালী শাহী তাজ। পরনে কালো রেশমি পোশাক। গলায় ঝিলমিলি মুক্তার হার। পরীর মতো মনে হচ্ছে নাজমাকে। তার আয়নার মতো উজ্জ্বল চেহারায় আলোর ঝলক পড়ায় মনে হচ্ছিলো যেনো বিদ্যুৎ খেলছে তার গোটা অবয়ব জুড়ে।

আহমারকে মিষ্টি চোখে দেখলো নাজমা। মৃদু হেসে তাকে হৃদয় নিংড়ানো অভিবাদন জানালো। পাশের একটি সোফায় বসলো আহমার। নাজমা রসিকতা করে বললো, মনে হয় তোমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

আহমার রাসভারী কণ্ঠে বললো, ক্ষুধা নয়– তোমার 'চাঁদমুখ' দর্শনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আমাকে আসতে বাধ্য করেছে।

আহমার শাহজাদী নাজমাকে সখ করে 'চাঁদ' বলে ডাকে। নাজমা বললো, ক্ষুধার্থ লোকটি কথা ঘুরিয়ে না বলে সরলভাবে বললেই ভালো লাগতো।

ঃ হৃদয়ের কথা-ই তোমাকে বলেছি। তুমি যদি আমার সামনে থাকো, তবে খাওয়ার কথা ভুলে যাই বৈকি।

আহমারের কথায় নাজমা শরম পায়। সে আলোচনার বিষয় পাল্টিয়ে বলে, আমার বান্ধবী হাজেরা এখনই এসে পড়বে।

ঃ নাজমা! হাজেরার সাথে বেশি মাখামাখি করো না। সে ইবনে আলকামীর মেয়ে। ইবনে আলকামী একজন কট্টর শিয়া।

ঃ তা জানি। ইবনে আলকামী ভালো লোক নয় তাও জানি। তবে হাজেরা সত্যিই একটি ভালো মেয়ে।

ঃ আমি শুনেছি, ইবনে আলকামী বিভিন্ন সময় শাহী মহলে লোক পাঠায় তার ব্যাপারে কে কী বলে তা জানার জন্য।

ঃ আমি নিশ্চিত বলতে পারি, হাজেরা তার বাবার গোয়েন্দা নয়। তবে...।

ঃ তবে কী?

ঃ তবে ইবনে আলকামী চাচ্ছে নাজমার সাথে শাহজাদা আবুবকরের বিয়ে হোক। আবুবকর মুসতাসিম বিল্লাহর পুত্র।

ঃ আমি দু'একবার হাজেরাকে দেখেছি। সে অত্যন্ত সুন্দরী। আবুবকর তাকে পছন্দ করতে পারে।

ঃ সমস্যা হলো, হাজেরা কামনা করছে আমার ভাই আবুল কাসেমকে।

ঃ আহমদ আবুল কাসেমের সাথে হাজেরার বিয়েতে ইবনে আলকামী রাজী না-ও হতে পারেন। তিনি ভালো করেই জানেন, আবুবকরের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হলে একদিন সে দেশের রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

ঃ তুমি ঠিক বলেছো। খলীফা হয়তো ভাইজানের সাথে হাজেরার বিবাহে সম্মতি দেবেন না।

ঃ খলীফা এক আশ্চর্য চরিত্রের লোক। তার ঐ যে কূপ...।

কূপের কথা শুনতেই নাজমার চেহারায় পেরেশানী ভেসে ওঠে। বললো, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আর কখনো কূপের কথা উল্লেখ করো না।

ঃ ক্ষমাপ্রার্থী। কূপের কথা উল্লেখ করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। আর কখনো কূপের কথা বলবো না।

এমন সময় হাজেরা এসে কক্ষে প্রবেশ করে। তার পরনে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক ও চমৎকার অলংকার। মাথায় রাজকীয় তাজ। আসলেই হাজেরার চেহারা নিখুঁত এবং পরীর চেয়েও উজ্জ্বল।

নাজমা হাজেরাকে সোৎসাহে অভিবাদন জানায়। উভয়ে এক সোফায় পাশাপাশি বসে।

হাজেরা আহমারকে বললো, দীর্ঘদিন পর আপনার সাথে সাক্ষাৎ হলো।

ঃ সেও তো ঘটনাচক্রে এবং নাজমার কল্যাণে।

নাজমা টিপ্পনি কেটে বললো, বহু আগেই তার ক্ষুধা লেগেছে। এখন যা-তা বলছে।

হাজেরা বললো, আমারও ক্ষুধা লেগেছে।

নাজমা বললো. ভাইজানের অপেক্ষা করছি।

এমন সময় আহমদ আবুল কাসেম কক্ষে প্রবেশ করে বললো, আমিও এসে গেছি।

নাজমা বললো, ভাইজান তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছো।

আহমদ বললো, হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে বটে। আজ শহরে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

নাজমা বললো, কী হয়েছে?

আহমারের পাশে সোফায় বসতে বসতে আহমদ বললো, কী আর বলবো, হাজেরা আবার কিছু মনে করে কিনা। ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক।

হাজেরা বললো, এ দুর্ঘটনার কথা আমিও শুনেছি। শিয়া ও সুন্নীর মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। ঘটনাটা দাঙ্গার রূপ নিয়েছে।

নাজমা বললো, কিছু শিয়া মনে করছে, তারা যা করবে ইবনে আলকামী তাতেই সমর্থন জানাবেন। তাদের এ ধারণা ভুল। বড় বেড়েছে তারা।

আহমদ বললো, ঘটনাক্রমে আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঝগড়াটা মারামারির দিকে গড়াচ্ছিলো। আমি উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে শান্ত করি। আমি ঐ সময় ওখানে না পৌঁছলে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিলো।

নাজমা বললো, আফসোস! কী হলো মুসলমানদের। তারা পরস্পর মারামারি করে মরছে।

হাজেরা বললো, আজকের গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটিয়েছে কয়েকজন শিয়া। আমি আব্বার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি ওয়াদা করেছেন, শিয়াদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন।

আহমদ বললো, এ ব্যাপারে তিনি আন্তরিক হলে কোথাও গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আহমার বললো, এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বললে হাজেরা হয়তো মনে কষ্ট পাবে। আমি তাকে কষ্ট দিতে চাই না।

হাজেরা বললো, আমি কিছুই মনে করবো না। যা বাস্তব ও সত্য তা অকপটে প্রকাশ করতে হবে।

আহমার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, কিছু শিয়া চরম বাড়াবাড়ি করছে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যেখানে সেখানে সুন্নীদের সমালোচনা করছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন কোনো ফেৎনা ঘটার আশংকা রয়েছে, যাতে পুরো শহরবাসী নিরাপত্তাহীনতায় নিক্ষিপ্ত হবে। পরিস্থিতি আদৌ ভালো মনে হচ্ছে না।

হাজেরা বললো, আমি আব্বাকে জোর দিয়ে বলবো, তিনি যেনো যে কোনো মূল্যে শিয়াদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

এমন সময় দাসীরা এসে খানা তৈরি হওয়ার কথা জানায়। চারজন উঠে খাবার কক্ষে চলে যায়। বিরাট এক কক্ষ। দেয়ালে লাল রংয়ের পর্দা ঝুলানো এবং ছাদের রংও লাল। লাল দেয়ালের সাথে ঝুলানো সাদা রেশমি কাপড়। গোল করে রাখা সোফাগুলো। সোফার সামনে টেবিল। টেবিলে বিছানো হয়েছে দস্তরখানা। দস্তরখানার উপর রূপার পেয়ালা-পাত্রে হরেক রকম খাবার।

সকলে খেতে শুরু করে। খানা শেষে হাত ধুয়ে তোয়ালিয়ায় হাত-মুখ মুছে ওখান থেকে ওঠে সামনের বড় এক কক্ষে গিয়ে সকলে বসেছে। ওখানে বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী সুশ্রী দাসি সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। তারা সেখানে পৌঁছতেই বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। একই সাথে তারা সুর করে গান ধরে।

আহমার চলে যেতে চাইলো। আহমদ তাকে যেতে বারণ করলো। আহমার বললো, তাহলে নামায পড়ে আসি।

নাজমা টিপ্পনি কেটে বলে, বহুত আচ্ছা মোল্লাজী।

সে নামায আদায় করে ফিরে এসে দেখে জবরদস্ত গান হচ্ছে। তাদের গান শেষ হলে সবাই বলে, এবার নাজমা ও হাজেরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান শোনাবে।

নাজমা ও হাজেরা প্রস্তুত হয়েছে। বাজনা শুরু হয়ে গেছে। উভয়ে এক সাথে গান গাইছে। গানে গানে মাতিয়ে তুলছে সবাইকে।

গান শেষ হয়েছে। এখন শুধু নিক্কন বাজছে। গানের ঝুমে আহ্মদ এখনো দুলছে।

পাঁচ.

শাহজাদা আহমদ আবুল কাসেম সত্যই বলেছিলো যে, শিয়া-সুন্নীদের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছিলো এবং তা সংঘাতের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিলো। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মাঝেও এমনি এক দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। দুনিয়ার মুসলমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একভাগ পরিচিত হলো 'শিয়ানে আলী' (আলী গ্রুপ) নামে, দ্বিতীয় ভাগ 'শিয়ানে মু'আবিয়া' (মু'আবিয়া গ্রুপ) নামে।

যারা নিজেদেরকে শিয়ানে আলী বলে পরিচয় দিতো এবং হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে মিছিল করতো, তারা আশ্চর্য ধরনের লোক ছিলো। হযরত আলী (রা.)-এর উপর নাখোশ হয়ে তারা কেটে পড়লো। তবে তারা খামুশ রইলো না। হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা শুরু করলো। কিছু লোক সমালোচনা করছিলো মাত্রাতিরিক্ত। ইতিহাসে এরাই খারেজী নামে চিহ্নিত। বিভিন্নভাবে বহু প্রক্রিয়ায় তারা হযরত আলী ও হুসাইনকে (রা.) কষ্ট দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এরাই তাঁদের শহীদ করেছিলো।

তখন যারা শিয়ানে আলী বলে পরিচিত ছিলো, মুসলমানদের মতোই তারা ধর্ম পালন করতো। ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের কোনো পার্থক্য ছিলো না। শিয়া-সুন্নী সকলে সেভাবেই অযু-গোসল করতো, আযান দিতো ও নামায আদায় করতো, যেভাবে প্রিয়নবী (সাঃ) করতেন। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়-আসয় নিয়ে ছিলো দ্বন্দ্ব। এসব কারণেই একে অপরের চরম সমালোচনা করতো। পরস্পরে দ্বন্দ হলেও সকলে মসজিদে আসতো, সবাই কুরআন তেলাওয়াত করতো, একই নিয়মে আযান ও নামায আদায় করতো। প্রায় তিনশ' বছর পর্যন্ত উভয় দল এভাবেই চলেছিলো। রাজনীতি ছিলো তাদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

বনী আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। তখন আব্বাসী খেলাফত নামেমাত্র টিকে আছে। সাম্রাজ্যের মূল নেতৃত্ব চলে আসে বনী বুইয়াদের হাতে। আব্বাসীয় খলীফাদের দুর্বলতা ও পতন আঁচ করে তারা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়। আলাদা মতাদর্শ হিসেবে 'শিয়া'র আবির্ভাব ঘটে।

এই জঘন্য শিয়াতন্ত্রের সূচনা করেছিলো মোয়েয্‌যুদ্দৌলা বিন বুইয়াহ দাইলামী। সে ছিলো আশ-শুজা বুইয়াহ্-এর কনিষ্ঠ পুত্র। এই মোয়েয্‌যুদ্দৌলা বাগদাদ দখল করে আব্বাসী খলীফা মুক্‌তাদী বিল্লাহ্‌র চোখ উপড়ে ফেলে। তাকে জেলে বন্দি করে রাখে। তারই রাজাসনে উপবিষ্ট করায় পুতুল খলীফা আবুল কাসেম ফযল বিন মুকতাদির বিল্লাহকে। এ ঘটনা ঘটে ৩৩৪ হিজরীতে। এই পুতুল সুলতানকে খতীউল্লাহ খেতাবে ভূষিত করা হয়। মোয়েয্‌যুদ্দৌলা খলীফার

জন্য নির্দিষ্ট অংকের ভাতা জারি করে। খেলাফতের মূল কর্তৃত্ব সে নিজের হাতেই রাখে। নিজের নামেই মুদ্রা ছাপায়।

মোয়েয্যুদ্দৌলা আপন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের এই সুযোগে ক্ষমতাকে আরো পোক্ত করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উস্কে দিয়ে নিজের পক্ষে লোক ভেড়ানোর হীন তৎপরতায় মত্ত হয়। অনুকূল হাওয়া পেয়ে শ্রাবণের তুফানের মতো ফুঁসে ওঠে শিয়াবাদ। মোয়েয্যুদ্দৌলা নিজেও ছিলো শিয়া। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথমদিকে মুখে মুখে হযরত আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরের প্রতি সুধারণা প্রকাশ করতো বটে; কিন্তু সুযোগমতো আপন ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশ ঘটিয়ে শিয়াদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

লোকটা ছিলো চরম অত্যাচারি ও স্বৈরাচারি। সামান্য অপরাধে মানুষকে কঠিন শাস্তি দিতো। তার জুলুম-জবরদস্তিতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জনতা দারুণ ভয় করতে থাকে তার জুলুম ও রাজনৈতিক চালবাজীকে। এই বদবখ্ত বাগদাদ জামে মসজিদের প্রধান দরজায় এই কথা লেখাবার দুঃসাহস দেখায়– 'মুআবিয়া, আবুবকর, ওমর ও ওসমানের উপর লানত বর্ষিত হোক।' নাউযুবিল্লাহ। সে ভেবেছিলো, লোক এরূপ লেখা দেখে তার ভয়ে কিছু বলবে না।

তবে এই লেখা দেখেই জনতা তার এই ধৃষ্টতার প্রতিবাদ জানায়। তারা তৎক্ষণাৎ এই লেখা মুছে ফেলার দাবি জানায়। অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রতিবাদে আগুনের মতো জ্বলে ওঠলো পুরো শহর। শহরে দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুতুল খলীফা খতীউল্লাহ তাকে বিষয়টা বোঝায়। কিন্তু সে বুঝবার চেষ্টা করলো না। সে জিদ ত্যাগ করলো না। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছিলো প্রতি মুহূর্তে। উপায় না দেখে সুন্নী উজিরে আজম মুহাম্মদ বিন মাহদী কৌশলে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, যদি ওটা মুছে এ বাক্যটি লিখে দেয়া হয়, তবে উভয়পক্ষের কারো আর প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকবে না। সে রাজি হলো। পূর্বের লেখা মুছে মসজিদের প্রধান দরজার উপর লিখে দেয়া হলো– 'মুআবিয়া ও আহলে রাসূলের উপর যারা জুলুম করেছে তারা অভিশপ্ত'।

মোয়েয্যুদ্দৌলার নাম ছিলো আহমদ। তার মধ্যে শিয়াপ্রীতি ছিলো অতিমাত্রায়। দূর-দূরান্তের শিয়ারা এ খবর শুনে ব্যাপকহারে বাগদাদে এসে আস্তানা গাড়ে।

সে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক সরকারী সুবিধা দিতে থাকে। দিন দিন শিয়াদের সংখ্যা বাড়তে থাকে বাগদাদে। শিয়ারা মোয়েয্যুদ্দৌলাকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ফলে সে যা বলতো, শিয়ারা তাই করতো। তাদের প্রতি মোয়েয্যুদ্দৌলার আর্থিক সহযোগিতা বাধ্য করেছিলো তাকে সমর্থন করতে। এই অর্থ তাদেরকে অন্ধ করেছিলো সত্যের পথে চলতে।

হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি মোয়েয্‌যুদ্দৌলা চরম শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে। তাই সে হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতবরণের দিন ১৮ই জিলহজ্বকে 'ঈদে গদীর' হিসেবে ঘোষণা করে। ভক্তরা তা সোৎসাহে পালন করে।

তারা সারাদিন ঢোল-তবলা বাজিয়ে আনন্দ করে। খানা-পিনাসহ নাচ-গানের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাত্রা ছাড়িয়ে মদপান চলে। ঐদিন আনন্দে-উৎফুল্ল ছিলো শিয়াপন্থী সকল সদস্য। সে বছর থেকে শুরু হয় 'ঈদে গদীর' নামক অনুষ্ঠানের।

মোয়েয্‌যুদ্দৌলা ছিলো বাগদাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। খলীফা ছিলেন তার ভাতাভোগী পুতুল। তবে যেহেতু সে-ই খলীফাকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করিয়েছিলো, তাই খলীফা তার মতের উল্টো কিছু করতেন না। উল্টো করার মুরোদ তার ছিলো না। যাচ্ছেতাই করতো মোয়েয্‌যুদ্দৌলা। ইসলামী দুনিয়ায় তার নামে মুদ্রা চালু করা হলো। সর্বত্র তারই নামে খুৎবা চলছিলো। তার আকাঙ্খা ছিলো, ইসলামী দুনিয়ার সব মানুষ তার অনুসরণ করুক। সবাই শিয়া হয়ে যাক।

ছয়.

বনু বুইয়াদের শাসনামল ৩৩৪ হিজরীতে শুরু হয়ে ৪৪৭ হিজরীতে শেষ হয়। এই সোয়াশ বৎসরের ইতিহাস মুসলমানদের মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, কপটতা ও নেফাকী সৃষ্টির ইতিহাস। এ দীর্ঘ সময় মুসলমানদের দু'টি দল শিয়া ও সুন্নির ঝগড়া-ফাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদের কলংকময় ইতিহাস। হাঙ্গামা ও মারামারির সাথে সাথে উভয় দলে কপটতা ও নেফাকীর প্রাদুর্ভাব ঘটে।

ইতিহাস বলে, বুইয়া ছিলো জেলের ছেলে। আহলে বাইতকে ভালোবাসার দাবিদার শিয়ানে আলীর এক লোকের হাতে সে মুসলমান হয়েছিলো। তাই তাকে শিয়া বলা হতো। তার সন্তানরা উন্নতি করতে করতে শাসক পর্যন্ত হয়েছিলো। রাজার আসন দখল করেছিলো। কিন্তু আফসোসের কথা, বনু বুইয়ারা আহলে বাইতের সাথে কখনো সদাচরণ করেনি। তাদের মান-সম্মানের দিকে কখনে খেয়াল করেনি। রাজ্য পরিচালনায়, শাসনকার্যে তাদের কোনো অংশ দেয়নি। তাদের কোনোরূপ সহযোগিতা করেনি। ওরা শুধু মুখে মুখেই আহলে বাইতের মহব্বত করে, ভালোবাসার দাবি করে।

আসলে এটা ছিলো তাদের এক প্রতারণা-ধোঁকাবাজি। তারা মন দিয়ে আহ্‌লে বাইতকে মোটেও মহব্বত করতো না। বরং মুখে মুখে তাদের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে তারা আহ্‌লে বাইতের মহব্বতকারীদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেছে। আর তারা তা হাসিল করেও নিয়েছে। তারাই মুসলমানদের মাঝে দু'টি

দল সৃষ্টি করে একটি দলকে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এতো শক্তিশালী করলো যে, তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। তাদের উপর কথায় কথায় নির্যাতন চালাতো। তাদের কোণঠাসা করে রাখতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমান পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত থাকবে আর তাদের রাজত্ব স্থায়ী হবে।

মুসলমানদের সরলতা ও অকপটতাকে পুঁজি করে তারা সোয়াশ বৎসর মুসলমানদের শাসন করেছে। কিন্তু যারা মুসলমানদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিলো, একদিন তারা সেই কপটতার শিকার হলো। কপটতা গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করলো। সেই গৃহযুদ্ধই তাদের ধ্বংস করে। তারা রাজত্ব হারায়। তারা নির্বংশ হয়ে যায়। পৃথিবীর বুকে কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট রইলো না তাদের।

কিন্তু যে বিদ্‌আত, যে কুসংস্কার, যে আচার-আচরণ আর যে কুফ্‌রী রসম-রেওয়াজ তারা রেখে গেছে, তা আজো মুসলমানদের মাঝে দেখা যাচ্ছে। সবচে' বড় কথা হলো, তারা মুসলমানদের মাঝে যে কপটতা ও বিভেদ জন্ম দিয়েছিলো, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে মুসলমানদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

বনু বুইয়াদের শাসনক্ষমতা ধ্বংসের পর যদিও শিয়াদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়েছে, রাজক্ষমতা তাদের হাতছাড়া হয়েছে, তথাপি সংখ্যাধিক্যের অহংকারে তারা কারণে-অকারণে ঝগড়া-বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হতো।

তারপর আব্দুল্লাহ আবু আহমদ খলীফা হয়ে মুসতাসিম বিল্লাহ উপাধি ধারণ করলে মানুষ ধারণা করলো, হয়তো আব্বাসী খেলাফতের টলটলায়মান সিংহাসনটি আবার শক্তপায়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই খলীফা ছিলেন ভীতু, নির্বোধ ও কুমতিপরায়ণ। তিনি মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামীকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। ইবনে আলকামী ছিলেন এক কট্টরপন্থী শিয়া। তবে অত্যন্ত ধূর্ত। খলীফার উপর এমনভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন যে, খলীফা তাকে খেলাফতের মালিক মোখতার বানালেন। পরিশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, খলীফা শুধু নামেমাত্র খলীফা রইলেন আর ইবনে আলকামীই খেলাফতের সকল কাজ পরিচালনা করতে লাগলেন। এতে শিয়ারা আবার উজ্জীবিত হলো। আবার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলো। প্রকাশ্যে সুন্নীদের সমালোচনা ও গালমন্দ করতে লাগলো।

দাঙ্গাবাজ শিয়ারা খেলাফত সম্পর্কেই প্রশ্ন করতো। তারা মহান সাহাবীদের নির্মল চরিত্রে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করতো। অথচ, মুয়েয্‌যুদ্দৌলাহর পূর্বে অবস্থা এমন ছিলো না। সে সময় পরস্পরে এ ধরনের কুৎসিত আলোচনা হতো না,

দলাদলিও ছিলো না। শুধু মুসলমানরা দু'ভাগ হয়েছিলো। যদিও তাদের মাঝে রাজনৈতিক মতানৈক্য ছিলো। কিন্তু মোয়েয্‌যুদ্দৌলা এসে তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করলো। কাল পরিক্রমায় তা তীব্র আকার ধারণ করলো। কারণ, মোয়েয্‌যুদ্দৌলার পর স্বার্থবাদী সেই সব লোক ক্ষমতায় এসেছিলো, যারা নিজেদের ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সেই হিংসা ও বিদ্বেষের জ্বলন্ত শিখায় আরো ইন্ধন যুগিয়েছিলো। তারা পরিস্থিতিকে বিস্ফোরণ্মুখ করে তুলেছিলো। এ সবই ছিলো স্বার্থবাদিতার ফসল।

তবে উভয় দলেই কিছু চিন্তাশীল ও পরিণামদর্শী ব্যক্তি ছিলো। তারা বাদানুবাদ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে স্বজনদেরকে, নিজের দলের লোকদেরকে বারণ করতো। কিন্তু কেউ তাদের কথা কানে তুলতো না। তবুও তারা একত্রে বসে নিজেদের অদূরদর্শিতার কথা আলোচনা করতো। শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করতো এবং আক্ষেপ করতো।

আসলে শিয়া-সুন্নি কোনো বিষয় ছিলো না। বরং উভয় দলের কিছু সন্ত্রাসী ও অজ্ঞ-গোঁয়ার লোকেরাই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। সে দ্বন্দ্ব প্রায়ই দাঙ্গার রূপ নিতো। প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামী জানতেন, যতোদিন পর্যন্ত এই ফেত্‌না, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত তার ক্ষমতা থাকবে। আমীর-উমরা বা দরবারের অন্য কেউ এদিকে মনোযোগ দেবে না। তারা ভাববে, প্রধানমন্ত্রী তো আছেন। তিনি তো হুকুমত পরিচালনা করছেন। আমাদের এতে নাক গলানো উচিত হবে না। এ সুযোগে ইবনে আলকামী শিয়াদের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতেন।

এক দিনের ঘটনা। এক শিয়া সন্ত্রাসী বাজার দিয়ে যাচ্ছিলো আর বলছিলো, অভিশাপ তাদের উপর, যারা আমীরের (হযরত আলী রা.-এর) হক লুটে নিয়েছে। এক পৌঢ় শিয়া সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। সে তাকে ধমক দিয়ে বললো, কী বাজে কথা বকছো! সন্ত্রাসী বললো, তবে কি তুমি সুন্নী যে তোমার এ কথা ভালো লাগছে না? পৌঢ় শিয়া বললো, আমি সুন্নী নই- শিয়া। তবে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এতে ঝগড়া-ফাসাদ আর সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসী বলতে লাগলো, মসজিদে মসজিদে ঘোষণা করে দাও, শিয়াদের আযান থেকে ভিন্ন আযান যেনো মসজিদে দেয়া না হয়। এক সুন্নী বললো, এ ধরনের কথা বলে কেনো নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছো? সন্ত্রাসী বললো, চুপ থাকো। জানো না, শাসনক্ষমতা এখন আমাদের হাতে? সুন্নী বললো, শাসনক্ষমতার গর্বে বাজে কথা বলছো কেনো? সন্ত্রাসী বললো, তোমাদের বুযুর্গদের উপর লানত। সুন্নী বললো, সাবধানে কথা বলো। অন্যথায় চড় মেরে মুখ বাঁকা করে দেবো। সন্ত্রাসী তো ঝগড়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত। তাই সে সুন্নীকে এক ঘুষি মারলো। সুন্নীও ঘুষির জওয়াব ঘুষি

দিয়েই দিলো। তখন সন্ত্রাসী শিয়া চিৎকার দিয়ে ওঠলো– আমীর আলাইহিস সালামের দোহাই! অভিশাপ্তরা আমাকে মেরে ফেললো!

বাজারের সময় ছিলো। তার চিৎকার শুনে কয়েকজন শিয়া দৌড়ে এসেই সুন্নীকে প্রহার করতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে বিরাট হাঙ্গামা বেঁধে গেলো। কয়েকজনের মাথা ফেটে গেলো। হাত-পা জখম হলো। সারা বাজারে শোরগোল, ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেলো।

ঘটনাক্রমে সে দিক দিয়েই প্রধানমন্ত্রী মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী কোথাও যাচ্ছিলেন। তার দেহরক্ষী একশ' সিপাহীও সাথে ছিলো। তারা সবাই শিয়া ছিলো। ইবনে আলকামী ধমক দিলেন। সাথে সাথে মারামারি বন্ধ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, এটা কেমন নিলর্জ্জ আচরণ? সেই সন্ত্রাসী শিয়া দৌড়ে এসে ইবনে আলকামীর বাহনের পাদানী ঝাপটে ধরলো। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, হুজুর! দেখুন এই বদমাশ সুন্নীরা আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। তারা বলছে আমাদের শিয়াদের নাকি বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ইবনে আলকামী ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন, সুন্নীদের শুনিয়ে দাও, বাগদাদে শিয়ারা থাকবে। সুন্নীরা বাগদাদ ছেড়ে চলে যাও।

এক সুন্নী অগ্রসর হয়ে বললো, এ ধরনের কোনো কথা কোনো সুন্নী বলেনি। আপনি তদন্ত করুন এ ফেত্নার সূত্র কী?

ইবনে আলকামী বললেন, আহলে বাইতের প্রেমিক মিথ্যা বলতে পারে না। এখানে যে সুন্নীরা আছে তাদের গ্রেফতার করো।

সিপাইরা সব সুন্নীকে গ্রেফতার করলো। ঘটনাক্রমে সেই পৌঢ় শিয়াও এসে পড়লো, যে সন্ত্রাসীকে উস্কানীমূলক কথা বলতে বারণ করেছিলো, বুঝিয়েছিলো এবং সবকিছু দেখেছিলো। সে প্রধানমন্ত্রীকে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করুন। এই ব্যক্তি, যে আপনার সাওয়ারীর পাদানী ধরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে সুন্নীদের গালমন্দ করেছে। আমি তাকে বুঝিয়েছি, বারণ করেছি। তখন সে আমাকেও ধমক দিয়েছে।

ইবনে আলকামী বললেন, তুমি সাদাসিধে মানুষ। এসব কীভাবে বুঝবে? সুন্নীরা ফেতনাবাজ এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে না দিলে এরা সত্যকে মানতে নারাজ।

বৃদ্ধ শিয়া বললো, আপনি প্রধানমন্ত্রী। ইনসাফ করুন।

ইবনে আলকামী বললেন, চুপ করো। আমি ইনসাফই করছি।

বৃদ্ধ শিয়া নীরব হয়ে গেলো। তখন ইবনে আলকামী সিপাইদের বললেন, এই বদজাত সুন্নীদের টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলো।

সিপাইরা তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

সন্ত্রাসী বললো, এখন মজা বুঝলে তো!

ঘটনাস্থলে শিয়ারাই বেশি ছিলো। তারা বললো, সুন্নীদের জায়গা এখন জেলখানায়। কিন্তু কিছু চিন্তাশীল বুদ্ধিমান শিয়াও সেখানে ছিলো। তারা বললো, হায়! গৃহযুদ্ধের কারণে তো জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সাত.

কূপের কথা প্রায়ই আহমারের মনে পড়তো। সে জানতে চেষ্টা করতো, কেনো কূপগুলো নিমার্ণ করা হলো এবং কেনোইবা তা বন্ধ করে ফেলা হলো। সে যখন নাজমার নিকট কূপের কথা তুলেছিলো, তখন নাজমা খুব পেরেশান হয়েছিলো। তাই সে বুঝে ফেলেছিলো, নিশ্চয় কূপগুলোকে ঘিরে কোনো রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সে অস্থির।

একদিন সে বসে বসে এই চিন্তা-ই করছিলো। ইতিমধ্যে খলীফার উত্তরাধিকারী আবুবকর আসলো। আহমার তাকে স্বাগতম জানালো, এক মূল্যবান সোফায় বসালো এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করলো।

আবুবকরের বয়স অল্প। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। স্বাস্থ্যবান। চেহারায় বীরত্ব ও দূরদর্শিতার আলামত বিকশিত। সে বললো, মোল্লাজ্বী কী চিন্তা করছিলে?

আহমার রোজা-নামাজে খুব পাবন্দ ছিলো বলে শাহী খান্দানের সবাই তাকে মোল্লাজী বলে ডাকতো। সে বললো, চিন্তা করছিলাম, নহরের পাড়ে কূপ কেনো নিমার্ণ করা হয়েছিলো আবার কেনো সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হলো।

কথাটা বলার সময় সে আবুবকরের চেহারার দিকে দৃষ্টি রাখছিলো। কূপের কথা শোনামাত্র সে পেরেশান হয়ে ওঠলো। বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে ওকথা ভুলে যাও।

আহমার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, তাহলে কি কূপগুলোকে ঘিরে কোনো রহস্য লুকায়িত আছে?

ঃ আমি তো বললাম, কূপগুলোর আলোচনা করো না। কেউ জানে না, খলীফা কেনো সেগুলো বানিয়েছেন। কূপগুলো নিমার্ণকালীন সময় কাউকে সেদিকে যেতেও দেয়া হয়নি। সাধারণ লোকেরা কূপের কথা জানেও না।

ঃ ভারি বিস্ময়কর কথা!

ঃ বিষয়টি বিস্ময়কর হোক বা যা হোক, তুমি মুখ বন্ধ করে রাখো। শাহী খান্দানের অতি অল্প কয়েকজনই কূপ খননের কথা জানে। আর যারা জানে, তাদেরকে মহামান্য খলীফা বলে দিয়েছেন, যেনো তারা কখনো এর আলোচনা না করে। সুতরাং তুমিও সে কথা ভুলে যাও।

ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি।

ঃ বলুন। তার অন্তরে তখন ভীষণ আশঙ্কা আলোড়িত হচ্ছিলো। সে কামনা করছিলো, আবুবকর যেনো নাজমার ব্যাপারে কোনো আলোচনা না করে। বারংবার তার দিকে তাকাচ্ছিলো আবুবকর কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললো, আমি ইবনে আলকামীকে বিশ্বাস করি না।

ঃ আপনি কি আলকামী সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? আহমার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ঃ হ্যাঁ, তিনি কোনো গভীর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আহমারের কণ্ঠে চরম বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললো, ষড়যন্ত্র করছে!

ঃ হ্যাঁ, আমার ধারণা তো তা-ই।

ঃ শুধু ধারণা-ই?

ঃ হ্যাঁ, শুধু ধারণা। তবে সেই ধারণাকে নিশ্চিত মনে করতে পারো।

ঃ এমন ধারণা কেনো সৃষ্টি হয়েছে?

ঃ আমি তদন্ত করে দেখেছি, তিনি কতিপয় যুবক ও কিছু নির্বোধ প্রকৃতির শিয়াকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার জন্য নিযুক্ত করেছেন। তারা কারণে-অকারণে সুন্নীদের লক্ষ্য করে উস্কানীমূলক কথা বলে এবং উভয় দলের মাঝে দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

ঃ কিন্তু তার প্রমাণ কী?

ঃ শুনলাম, গতকাল শফীক নামের এক সন্ত্রাসী অকারণে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো। সেখানে ইবনে আলকামীও এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শফীকের পক্ষ্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজনাকর কথা বলেছেন। সুন্নীদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। সেখানে যতো সুন্নী জড়ো হয়েছিলো, সবাইকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঃ আপনার ধারণা বাস্তব। এ ঘটনায় শিয়ারাও নির্দোষ, সুন্নীরাও নির্দোষ। সবকিছু ঘটাচ্ছেন ইবনে আলকামী নিজে। তিনি কিছু সন্ত্রাসী লালন করছেন। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তিনি চাচ্ছেন দেশময় দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক।

ঃ ইতিপূর্বে আমি মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামীর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কথা শুনেছি। তবে তা সুন্নীদের থেকে শুনেছি। তখন ধারণা করেছিলাম যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শিয়া, তাই তারা তার বিরুদ্ধে লেগেছে। কিন্তু গত রাতে হাসান আসাদ– যিনি অত্যন্ত বুযুর্গ এবং শিয়া-সুন্নী সকলের শ্রদ্ধাভাজন– এসে আমাকে শফীকের সন্ত্রাস ও ইবনে আলকামীর বাড়াবাড়ির কথা শুনালেন। বললেন, তিনি নিজে ইবনে আলকামীর নিকট শফীকের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কথা বলেছেন। কিন্তু ইবনে আলকামী তাকে শাসিয়ে নীরব করে দিয়েছেন।

ঃ হাজেরা আমাকে বলেছিলো, একদিন সে কিছু শিয়া সন্ত্রাসীদের ফেত্‌নার কথা তার পিতাকে বুঝিয়েছিলো আর তার পিতা বলেছিলেন, আমি তাদের বুঝিয়ে দেবো।

ঃ হাজেরা অত্যন্ত ভালো মেয়ে। আমি জেনেছি, ইবনে আলকামী আমার সাথে তার বিয়ে দিতে চায়। অত্যন্ত রূপসী ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের মেয়ে। আমি আনন্দের সঙ্গেই তাকে আমার জীবন সঙ্গীনী হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সে ভাই আহমদ আবুল কাসেমকে ভালোবাসে। আর আহমদও তার প্রেমে বিভোর। তাই এখন আমি হাজেরাকে আমার বোনের মতো মনে করি।

ঃ আপনি পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ। শাহ্জাদী নাজমাও আপনার প্রশংসা করে।

আবুবকর মৃদু হাসতে হাসতে আহমারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো, আমি জানি, নাজমার মন তোমার দিকেই ঝুঁকে আছে। তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। নাজমা অনিন্দ্যা সুন্দরী, বাগদাদের অপ্সরী। যে তাকে একবার দেখেছে, সে-ই তাকে ভালোবেসেছে। সে তোমাকে কামনা করে আর তুমি... অবশ্যই।

আহমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, এমন এক রূপবতী সুন্দরী, কে তার ভালোবাসা না চায়।

আহমারের সন্দেহ হলো। ভাবতে লাগলো, সে যেনো তার প্রেমাস্পদের সাথে প্রেম না করে বসে এবং উত্তেজিত হয়ে তাকে ভালবাসতে নিষেধ না করে দেয়। তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আবুবকর বললো, আমি তোমাকে আমার ভাই মনে করি আহমার! আমি বলতে পারবো, এখন তোমার অন্তরে কোন্ কথাটি ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি জানি, এখন তুমি কী চিন্তা করছো। নিশ্চিত থাকো। আমি নাজমাকে যন্ত্রণায় ফেলবো না। যদিও আমি জানি, আমি চাইলে নাজমার সাথে আমার বিবাহ হবে অত্যন্ত সহজেই। কিন্তু আমি দু'টি মিলিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ কামনা করি না।

আহমার কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কীভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করবো।

ঃ এটা কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো বিষয় নয়। আমিও একজনকে চাই।

ঃ সে সৌভাগ্যের অধিকারিনী কে?

ঃ এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে।

ঃ আপনি তাকে কোথায় দেখেছেন?

ঃ একদিন রাতে আমি দজলার তীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জোৎস্নাভরা রাত। চাঁদের আলোয় দিনের মতো মনে হচ্ছিলো পুরো জনপদ। ইতিমধ্যে একটি বজরা এসে ভিড়লো। বজরা থেকে এক যুবতী নামলো। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে, যেনো পরী। আমি তার রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে গেলাম। আমি তাকে দেখলাম। সেও আমাকে দেখলো।

তার দৃষ্টির তীর আমার হৃদয়ের মর্মমূলে বিদ্ধ হলো। নিকটে তার গাড়ি

দাঁড়ানো ছিলো। সে তাতে চড়ে চলে গেলো। সারারাত আমাকে সেই বিমুগ্ধকর দৃশ্য কষ্ট দিলো।

তার কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমি একাকি দজলার তীর ধরে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক বাগান থেকে মধুর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসছিলো। আমি বাগিচার দরজায় পৌঁছলাম। হঠাৎ আমার সম্মুখে এক নারীমূর্তি এসে দাঁড়ালো। আমি চেয়ে দেখি, এই সেই রূপসী, যে আমাকে রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলো।

আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। সে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বললো, উহ্ আপনি! আমার মনে হলো যেনো ফেরদাউস জান্নাতের হুর আমার সামনে। সে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আমার পরিচয় জানতে চাইলো।

তবে আমি তাকে বলিনি যে, আমি খলীফার উত্তরাধিকারী। নাম জিজ্ঞেস করলে বললো, ফেরদাউস। এক জমিদারের কন্যা। আমি তার বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। এ পর্যন্ত কয়েকবার তার সাথে সাক্ষাৎও হয়েছে।

ঃ আরে, চমৎকার কাহিনী তো!

ঃ আমার মন চায় আমি তাকে বলে দেই, আমি কে? কিন্তু ও কথা বলতে আমার সাহস হয় না, পাছে যদি সে আমার পরিচয় পেয়ে ভড়কে যায়!

ঃ আমার মনে হয় তার নিকট আপনার ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ঃ আমি ভেবে দেখবো।

ঃ একদিন তাকে আপনার শাহী মহলে দাওয়াত দিন।

ঃ যদি তুমি নাজমাকে দায়িত্ব দাও, তাহলে সে-ই সুন্দরীকে রাজপ্রসাদে নিয়ে আসতে পারবে।

এমন সময় নাজমা ও আহমদ এসে হাজির হলে তারা উভয়ে তাদের স্বাগতম জানায়।

আট.

রূপের রাণী নাজমা। অনিন্দ্য, উজ্জ্বল রূপ জ্যোতি বিকিরণ করছে চারদিকে। কোনো স্থানে উপবেশন করলে মনে হচ্ছে যেনো সেখানে রূপের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। তার ডাগর চোখের চাহনী নিমিষে দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিমোহিত করে ফেলছে।

নাজমা তার সেই ডাগর চোখের দৃষ্টিতে আহমারকে দেখলো। আহমার বললো, কী মজার ব্যাপার! আমরা উভয়ে তো এখন তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম।

নাজমা মৃদু হেসে বললো, করবেই তো!

আবুবকর হেসে বললো, আচ্ছা, বোন নাজমা কি তাহলে আমাদের কথা বিশ্বাস করছে না?

নাজমা বললো, যদি জ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকে, তবে তো বিশ্বাস না করার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

নাজমার কথায় আহমদ হেসে ফেললো। বললো, তুমি ভাই আহমারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তুমি তো তাকে অপমান করে ফেলেছো।

হঠাৎ নাজমা খিলখিলিয়ে হেসে বললো, এই কথা। আচ্ছা তাহলে আমি আহমারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আবুবকর বললো, সে ক্ষমা চেয়ে নিলো আহমার ভাই! তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো?

আহমার মিটি মিটি হেসে বললো, জবরদস্তিভাবে ক্ষমা আদায় করার তৎপরতা চলছে। তাই ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না।

আহমদ বললো, ঐ দুষ্টের তামাশার এমন উত্তরই হওয়া সমীচীন।

নাজমা বললো, ভাইজান! আপনিও তাহলে এক আশ্চর্য মানুষ। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম আর আপনি তা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন!

আবুবকর বললো, নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

নাজমা বেশ ভালো বলে দাঁড়াতে উদ্যত হয়। কিন্তু আহমার নাজমার দাঁড়ানোকে পছন্দ করলো না। সে একে ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করলো। তাই বললো, বেশ, বেশ, ক্ষমা হয়ে গেছে। আর দাঁড়াতে হবে না।

আবুবকর বললো, তুমি তো দেখছি বেশ ভালো মানুষ। ক্ষমা করে দিলে!

আহমার বললো, একেবারেই ক্ষমা করে দিয়েছি।

নাজমা হেসে বললো, শুকরিয়া, কথায় কথায় অনেক দূর চলে এসেছি। আচ্ছা, এখন বলুন তো, কেনো আমার কথা আলোচনা হচ্ছিলো?

আবুবকর চোখের ইশারায় আহমারকে নিষেধ করে দিলো।

আহমার বললো, তোমার উচ্ছৃংখলতার কথাই আলোচনা করছিলাম।

নাজমা বললো, আপনি করছিলেন?

আহমার বললো, আমার মুখে কি এ আলোচনা শোভা পায়? জ্ঞানী ব্যক্তিই করছিলো।

আবুবকর মৃদু হেসে বললো, আমরা দু'জনে মিলেই করছিলাম। সুতরাং গর্জনটা যেনো শুধুমাত্র আমার উপরই বর্ষিত না হয়।

নাজমা বললো, আমার কি এমন দুঃসহাস হতে পারে?

আবুবকর বললো, দুঃসাহস, হা... না।

অকস্মাৎ সবাই হেসে ফেললো। নাজমা খিল খিল করে হাসতে লাগলো। তার

দন্তরাজির ঔজ্জ্বল্যে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। অতিরিক্ত হাসার কারণে তার চোখ সজল হয়ে ওঠলো এবং গন্ডদেশ রক্তিম আকার ধারণ করলো। ফলে তার রূপলাবণ্য আরো মোহময় আকার ধারণ করলো। আহমার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার রূপশোভা অবলোকন করতে লাগলো।

নাজমা বললো, ক্ষমা করবেন, আপনার কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ আমাকে হাসতে বাধ্য করেছে।

আহমদ তিরস্কার করে বললো, নাজমা! ভদ্রতা বজায় রাখো।

আবুবকর আহমদকে বললো, ভাই আহমদ! বোন নাজমাকে কিছু বলো না। নাজমার আনন্দ-উল্লাস আমার কাছে খুবই ভালো লাগে।

আহমার বললো, ক্ষমা করবেন। আমরা নানা কথার তালে আপ্যায়নের কথা ভুলেই গেছি।

আবুবকর হেসে বললো, এতো তাড়াতাড়ি তোমার ফলের কথা স্মরণ হলো?

আহমার বললো, আমার ভুল হয়ে গেছে। তবে আসল কথা হলো, আপনি আসার সাথে সাথে এমন সব কথা-বার্তা শুরু হলো যে, কিছুই স্মরণ নেই। আর তাই আহমদ আসার পর তারা সবাই হাসি-উল্লাসেই মেতে আছে।

আহমার হাতে ইংগিত করতেই কয়েকজন দাসি দৌড়ে এলো। সে তাদের কিছু আপ্যায়ন করার নির্দেশ দিলে তারা শশব্যস্তে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক দাসি এসে নতশিরে দাঁড়ালো। আসরের সবাইকে বললো, চলুন।

সবাই উঠে অন্য কামরায় গিয়ে পৌছালো। কামরাটি খুব প্রশস্ত, অত্যন্ত সুসজ্জিত। প্রত্যেক টেবিলের সামনে একটি করে চেয়ার। টেবিলটি ধবধবে সাদা চাদরে আচ্ছাদিত। প্রতিটি চেয়ারে একটি করে তোয়ালে। দু'জন দাসি চিলম্‌চি নিয়ে এলো। সবাইকে হাত ধোয়ালো।

টেবিলে নানা জাতের নানা ধরনের সুস্বাদু ফল। সবাই খাওয়া শুরু করলো। আহমদ বললো, আমি শুনতে পেলাম, শফীক নামের এক ব্যক্তি এক মহল্লায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

আবুবকর বললো, আমি শুনেছি ইবনে আলকামী শফীক ও তার দাঙ্গাবাজ সাথীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছে। তাহলে কাজটি নিশ্চয় শফীকই করেছে।

আহমদ বললো, আমি ভাই আহমারের নিকট এ জন্য এসেছি যে, আমরা দু'জনে আমীরুল মু'মিনীনকে এ ঘটনাটি জানাবো। ঘটনাক্রমে আপনিও এসে পড়েছেন। আপনিও আমাদের সাথে চলুন?

আবুবকর বললো, আমার তো ধারণা, ইবনে আলকামী শিয়া-সুন্নীর মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বিশেষ কোনো মতলব হাছিল করতে চাচ্ছে।

আহমদ বললো, আমারও একই ধারণা। শুধু আমার-আপনারই নয়– বরং সকল সুন্নীর এবং শান্তিপ্রিয় শিয়াদেরও এই একই বিশ্বাস।

আবুবকর বললো, আমি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শিয়ার সাথে সাক্ষাত করেছি। তারা এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে মোটেই পছন্দ করে না। কারণ, এতে খেলাফতের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাহলে তাতারীদের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসাত্মক তুফান আমাদের দিকেও ছুটে আসবে।

আহমার বললো, তোমার ধারণাই সঠিক। কারণ, এখন মোঙ্গলরা ইরানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি তারা আমাদের গৃহযুদ্ধের সংবাদ পায়, তবে নিঃসন্দেহে তারা বাগদাদ আক্রমণ করবে। তারা এমন বর্বর ও দস্যু জাতি যে, তাদের মোকাবেলা করার শক্তি আব্বাসী খেলাফতের নেই। আল্লাহ না করুন, তারা এখানে এসে কোনো প্রলয় না ঘটায়।

আহমদ বললো, পরিস্থিতি সেদিকেই মোড় নিচ্ছে। এ জন্য খলীফাকে এ ঘটনাগুলো শীঘ্রই জানানো দরকার।

আবুবকর বললো, আমি আপনাকে খলীফার নিকট নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি।

শেষে সিদ্ধান্ত হলো, যুবরাজ আবুবকর, শাহজাদা আহমার এবং আহমদ তিনজন খলীফাকে ঘটনাগুলোর বিবরণ শুনাবে। তারা কথা বলছিলো আর খাচ্ছিলো। আহার শেষ হলে দাসিরা এগিয়ে এসে তাদের হাত ধুইয়ে দিলো। তারা তোয়ালে দ্বারা হাত-মুখ মুছে নিলো।

তারা একটি ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসলো। ফোয়ারাটি একটি হাউজের মাঝে অবস্থিত। মর্মর পাথরে নির্মিত হাউজের চার পাশে ঘের। তাই মর্মর পাথরে বসেই হাউজের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়।

পিতলের ফোয়ারা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি তীব্রবেগে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে ফোয়ারার চার পাশে লুটিয়ে পড়ছে। হাউজের চারদিকে মনোমুগ্ধকর ফুল বৃক্ষের সারি। ডালে ডালে বিচিত্র আকার ও রঙের ফুলরা যেনো হাসছে। মাঝে মাঝে দেবদারু বৃক্ষ বীথিকা। সে এক মোহময় স্বর্গীয় দৃশ্য।

কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকার পর আবুবকর আহমদের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে দূরে ঘুরতে লাগলো। এভাবে সে আহমারকে সুযোগ দিলো, যেনো সে নাজমাকে তার প্রেম কাহিনী শুনিয়ে তার সাথী বানিয়ে নেয়।

তারা সরে যাওয়া মাত্রই আহমার বললো, নাজমা! তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি আসার পূর্বে আমরা তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম?

ঃ আমি বুঝেছি। তবে আমার বদনাম করতে তোমরা কেনো এমন উঠে-পড়ে লেগেছো?

ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমার সাহায্য কামনা করে।

নাজমা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো, তার মানে?

ঃ এমনভাবে দৃষ্টি ফেলো না। তাহলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি আমার থেকে কী চায়?

ঃ এক সুন্দরীর ব্যাপারে তোমার সাহায্য কামনা করে।

ঃ কোন্ সুন্দরী?

ঃ আমি তোমাকে তার পুরো ঘটনাটি বলছি। বলেই সে তাকে আবুবকর ও ফেরদাউসের পুরো ঘটনা শোনালো। নাজমা মনোযোগের সাথে শুনলো।

ঃ যুবরাজ চায়, তুমি ফেরদাউসকে তোমার সাথে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসবে।

ঃ যুবরাজ ভালোই করেছে যে, তার নিকট নিজের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি। তবে ফেরদাউসের বাড়ি কোথায়? কে আমাকে তা চিনিয়ে দেবে?

ঃ জ্ঞানী ব্যক্তিই একদিন তোমাকে তার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

ঃ আমি যুবরাজকে সাহায্য করবো।

ঃ শুকরিয়া। এবার তাহলে তোমার বিশ্বাস হলো যে, আমরা দু'জন তোমার আলোচনা করছিলাম।

ঃ আমি তো আগেই বিশ্বাস করেছিলাম।

ঃ যুবরাজ তোমার ও তোমার রূপ-সৌন্দর্যের খুব প্রশংসা করছিলো।

নাজমা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখলো। ঠিক তখন কারো পদশব্দ অনুভূত হলো। আবুবকর এবং আহমদ ফিরে আসছে।

আহমদ বললো, এখন আমি অনুমতি চাচ্ছি। আমাকে যেতে হবে।

সে নাজমাকে নিয়ে চলে গেলো।

আহমার আবুবকরকে জানালো, সে তার ঘটনাটি নাজমাকে বলে দিয়েছে। নাজমা সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবুবকর তার কৃতজ্ঞতা আদায় করলো এবং বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

নয়.

আবুবকরের ঘটনা শুনে নাজমা দারুণ বিস্মিত হলো। শাহজাদীদের ছেড়ে সে কীভাবে একজন সাধারণ জমিদারের মেয়ের প্রেমে পড়লো! ইবনে আলকামীর মেয়ে হাজেরা কতো রূপসী, কতো আকর্ষণীয়া! তাকেও তার পছন্দ হলো না। নাজমার মনে হলো, আবুবকর সম্পর্কে তো শাহী মহলগুলোতে একথা প্রসিদ্ধ যে, সে মেয়েদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে না। শুধু কী তাই? সে তার সমসয়সী শাহজাদীদের সাথে হাসিমুখে কথাও বলে না।

যেদিন সে আবুবকরের ঘটনাটি শুনেছে, তার কয়েকদিন পরের ঘটনা। সে একটি শাহী গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলো। তার প্রহরায় চারজন সৈন্য সামনে ও চারজন পেছনে বসা। তারা একটি বাগিচার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর অতিক্রম করার পর রাস্তার শেষ প্রান্তে একটি মনোরম বাগিচা পরিদৃশ্য হলো। সে গাড়ি থামিয়ে বাগিচায় প্রবেশ করলো। তার মনে হলো, সে যেনো এই বাগিচায় ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে।

বাগিচাটি মনোরম। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সবুজ-শ্যামল গাছের সারি চলে গেছে। রাস্তার উভয় পাশে দেবদারু বৃক্ষের সারি দেখে মনে হলো যেনো প্রকৃতি বৃক্ষগুলোকে প্রহরার কাজে নিয়োজিত করেছে। আর বৃক্ষগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। দেবদারু বৃক্ষগুলোর মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। গাছে গাছে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। এদিকে-সেদিকে পাখ পাখালির বিস্ময়কর তান। ফুলে ফুলে ভরা বাগানটির স্থানে স্থানে ফোয়ারা। সে এক অপরূপ দৃশ্য।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটি চিৎকার ধ্বনি কানে আসলো। মেয়েলি কণ্ঠ। করুণ আর্তনাদ। সাহায্যের আবেদন পরিস্ফুট। নাজমা নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। দ্রুত অগ্রসর হলো। সামনেই মেহেদি বৃক্ষের ঘন সারি। মানবদেহ থেকে বৃক্ষগুলো উঁচু উঁচু। বৃক্ষের ঘন সারির মাঝে ঢুকে পড়লো সে। আবার সেই মেয়েলি কণ্ঠ– দূর হ, বদমাশ! জবাবে পুরষালি কণ্ঠ ভেসে এলো– কীভাবে দূর হবো? এক যুগ ধরে আমি তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে মরছি!

ঃ আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

ঃ কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি আর আজ...।

ঃ শয়তান! দূরে সরে কথা বল্।

ঃ শোন হে অপ্সরী! আমার নাম শফীক। তোমাকে পাওয়ার আশায় আমি বাগদাদে হাঙ্গামা শুরু করেছি। আমি চাই একদিন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে আর আমি তোমাকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবো।

ঃ তুই নিচু, ইতর। উজীরে আজমকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তুই ফেতনার আগুনে বাতাস দিচ্ছিস্।

ঃ তুমি মিথ্যে বলোনি। তবে একথাও সত্য যে, আমি এক গুলিতে দু'টি শিকার করতে চাচ্ছি। উজীরে আজমকেও সন্তুষ্ট করবো আর তোমাকেও তুলে নিয়ে যাবো।

নাজমা বুঝে ফেললো লোকটি শফীক। কিন্তু মেয়েটি কে বুঝতে পারলো না। শফীক এবং মেয়েটি নাজমার অদূরেই ছিলো। কারণ, তাদের মাঝে মাত্র কয়েকটি

মেহেদির ঘন বৃক্ষ অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। তাই নাজমা তাদের চেহারা দেখছিলো না। তবে স্পষ্টভাবে তাদের কথা শুনছিলো।

শফীক বললো, প্রেয়সী আমার! রূপসী আমার! তুমি যদি আমার সাথে যেতে তৈরি হও, তবে বাগদাদ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে। আমিই বাগদাদে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছি। আমি কিছু দুর্ধর্ষ বন্ধু-ইয়ার যুগিয়ে নিয়েছি। ইবনে আলকামী দিনার-দেরহাম খরচ করেন আর আমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করি। যদি তুমি আমার হয়ে যাও, তাহলে আমি দাঙ্গা ছেড়ে দেবো। এখন বলো, তুমি আমার হওয়া পছন্দ করো, না বাগদাদের ধ্বংস পছন্দ করো।

মেয়েটি বললো, আমার ত্যাগ যদি বাগদাদকে আসন্ন ধ্বংস থেকে মুক্তি দিতে পারে, তবে আমি প্রস্তুত।

শফীক বললো, আমি জানি, তুমি অত্যন্ত জেদী মেয়ে। তুমি আমার কথা মানবে না।

সাথে সাথে আর্তনাদ শোনা গেলো। নাজমা দ্রুত অগ্রসর হলো। ঘন বৃক্ষের ফাঁক-ফোকর চিরে সে অপর পার্শ্বে পৌঁছলো। দেখলো, শফীক হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। চোখে তার কামনার আগুন। দূর থেকেই নাজমা উচ্চ কণ্ঠে বললো, খবরদার!

শফীক ফিরে নাজমাকে দেখলো। তার ধমকের কোনো প্রতিক্রিয়াই শফীকের মাঝে পরিলক্ষিত হলো না। তবে বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো। ওদিকে ভয়াতুরা সুন্দরী সাক্ষাৎ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলো। তার বুকটা উঠানামা করছিলো।

শফীক নাজমাকে হুঁশিয়ার করে বললো, আমার অভীষ্টে বাধা দিয়ে পরে আক্ষেপ করবে কিন্তু হে নবাগতা সুন্দরী!

নাজমা রাজকন্যা। শাহী খুন তার শিরায় শিরায় বহমান। শফীকের কথা শুনেই তার চেহারা রক্তাভ হয়ে গেলো। কোমরে খঞ্জর ঝুলানো ছিলো। টেনে খঞ্জর বের করে দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হলো। নাজমাকে বীরাঙ্গনা বেশে দেখেই শফীক কেটে পড়ার চেষ্টা করলো।

কিন্তু নিমিষে নাজমা তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। বললো, প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তওবা করে পালিয়ে যা। অন্যথায় খঞ্জরটি সমূলে তোর বক্ষে প্রবিষ্ট দেখতে পাবে।

শফীক সাহস সঞ্চয় করে খঞ্জরটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় হাত বাড়ালো। নাজমা নিমিষে হাত সরিয়ে নিলো। খঞ্জরের হালকা স্পর্শে শফীকের হাত কেটে গেলো। অমনি সে পড়িমরি করে ছুটে পালালো। নাজমা উচ্চকণ্ঠে বললো, দাঁড়া, কোথায় পালাচ্ছিস্? রাজ সিপাই আসছে।

শফীক আর ফিরে দেখলো না। গাছের ফাঁক-ফোকর ভেদ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো। সে এমন ভয় পেলো, যেনো নাজমা খঞ্জর নিয়ে তার পেছেনে পেছনে ছুটে আসছে।

এবার নাজমা মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো। এখনো সে দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে। বুকটা দ্রুত উঠানামা করছে। চেহারায় রঙিন আভা পরিস্ফুট। নাজমা দেখলো, মেয়েটি শুধু রূপসীই নয়, সাক্ষাৎ অপ্সরী। যেনো জান্নাতের হুর। তার চেহারায় এমন যাদুময় তীব্র আকর্ষণ যে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়েই থাকতে মন চায়।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে নাজমাকে দেখে বললো, চরম মুহূর্তে আপনি আমাকে বাঁচালেন। কীভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা আমার জানা নেই।

ঃ কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। তবে আমি ভেবে অবাক্ হই, তুমি এই বদবখতের পাল্লায় পড়লে কী করে আর তার সাথে এখানে এলেই বা কীভাবে!

ঃ আমি তার সাথে আসিনি। বরং সে আমার পিছু নিয়েছিলো।

ঃ এ বাগিচা কি তোমাদের?

ঃ না– আমার এক বান্ধবীর। এ বাগিচাটি আমার খুব পছন্দনীয়। তাই প্রায়ই আমি এখানে বেড়াতে আসি। কখনো আমার বান্ধবীর সাথে কখনো একাকি। আজও আমি বেড়াতে এসেছিলাম। আমি জানতাম না, এই বদমাশ আমার পিছু নিয়েছে। আমি যখন মেহেদি বৃক্ষের সারির মাঝে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ সে আমার সামনে এসে উপস্থিত হলো।

ঃ সে কি পূর্বেও তোমার সামনে এসেছিলো।

ঃ হ্যাঁ, কয়েকবার সে আমার সামনে এসেছিলো। কিন্তু আজ আমি বুঝেছি, সে ইচ্ছে করে দূরভিসন্ধি নিয়েই আমার সামনে আসতো।

ঃ তুমি কার মেয়ে?

ঃ আমি ইয়াকুব জমিদারের মেয়ে।

ঃ এসো ফোয়ারার পাশে বসে কথা বলি।

তারা সেখান থেকে উঠে কয়েকটি ফুলকুঞ্জ অতিক্রম করে একটি আকর্ষণীয় ফোয়ারার পাশে গিয়ে উপবেশন করলো।

ফোয়ারার বিন্দু বিন্দু পানি উছলে উঠে বাতাসের ঝাপটায় উড়ে তাদের শরীরে এসে পড়ছে।

নির্মল গোলাপী গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ফোয়ারার পানি মুক্তার মতো ঝলমল করছে।

নাজমা বললো, তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললো, আমার নাম ফেরদাউস।

ফেরদাউস! নাজমার কণ্ঠ চিরে একরাশ বিস্ময় বেরিয়ে এলো।

ফেরদাউস নাজমার দিকে দৃষ্টি তুলে বললো, জ্বি। আমি ফেরদাউস। কিন্তু পনি এতো বিস্মিত হচ্ছেন কেনো?

ঃ একজন থেকে তোমার কথা শুনেছিলাম।

ঃ আমার কথা শুনেছিলেন? কার থেকে?

ঃ এসো আমার সাথে চলো। ঐতো আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

উভয়ে ওঠে বাগিচার বাইরে চলে এলো। ফেরদাউস গাড়িটি দেখে বিস্মিত হলো। বললো, আচ্ছা, আপনি তাহলে শাহজাদী?

ঃ তুমি নিজেই জানতে পারবে আমি কে।

ঃ এখনি বলে দিন।

ঃ গাড়িতে ওঠে বসো।

উভয়ে গাড়িতে আরোহণ করলো। গাড়ি চলতে লাগলো।

দশ.

আহমদ, আহমার এবং আবুবকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তারা খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে ইবনে আলকামীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবে। তাই একদিন তারা খলীফার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

তিনজনই ঘোড়ায় আরোহণ করে যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ ফটকে পৌঁছুলে প্রহরীরা তাদের সালাম দিলো। সে ফটকে আড়াইশ' প্রহরী সর্বদা প্রহরার কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা ফটক অতিক্রম করে এক প্রশস্ত পথ ধরে চলতে লাগলো। বিশাল খেলাফত প্রাসাদকে মনে হলো, প্রাচীরবেষ্টিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রাসাদের মাঝে মাঝে বাগ-বাগিচা আর ফুল বাগানের সমাহার। মাঝে মাঝে স্বচ্ছ পানির নালা। রাজ-প্রাসাদের এক পার্শ্বে বিরাট এক চিড়িয়াখানা। বাঘ, ভল্লুক, সিংহ, হাতি, হরিণ ইত্যাদি বহু হিংস্র ও পালিত পশু সেখানে আলাদা আলাদা খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর তারা আরেকটি ফটকের সামনে উপস্থিত হলো। এ ফটকটি আগেরটির তুলনায় আরো উঁচু। অতিশয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। এ ফটকেও আড়াইশ' সৈনিক প্রহরার কাজে নিয়োজিত। সৈনিকরা তাদের সালাম দিলো। ফটক অতিক্রম করে তারা একটি ফুল বাগানের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। ফুল বাগানটি দারুণ বিস্ময়কর। সবুজ ঘাস আর বাহারী রঙের ফুলের ছোঁয়ায় বাগানটি জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। মর্মর পাথরে নির্মিত মনোমুগ্ধকর ফোয়ারা থেকে উছলে উঠা পানির দৃশ্য মনকে পাগল করে তোলে। সুদূর বিস্তৃত

ফুল বাগানের পরই ফলের বাগিচা। নানা ধরনের ফল পেকে পেকে গাছে ঝুলে আছে। ফলের সুমিষ্ট গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে। ডালে ডালে পাখিদের কল-কাকলিতে বাগিচাটি আরো জীবন্ত, আরো স্বপ্নময় হয়ে ওঠেছে।

ফুল-ফলের বাগিচা অতিক্রম করে তারা একটি সুদৃশ্য পার্কে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে রাজ-প্রাসাদের দাসিরা উপস্থিত ছিলো। তারা ঘোড়া থেকে নামামাত্র দাসিরা এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলো। পার্ক অতিক্রম করে তারা অলিন্দে গিয়ে পৌঁছলো। মর্মর পাথরে নির্মিত সিঁড়ি, অলিন্দ বরং গোটা প্রাসাদটি। দুধের মতো সাধা ধব্ধবে বিশাল প্রাসাদ। এটা খেলাফত প্রাসাদ, শাহীমহল। তাই সেবিকা বা দাসির এখানে কোনো অভাব নেই। প্রত্যেক দাসির রূপময় চেহারা, চমৎকার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, কালো কুচকুচে সুরভিত কেশদাম, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ আর গোটা দেহে মূল্যবান অলংকার সামগ্রী। সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে। আবুবকরকে দেখেই দাসিরা এক বিশেষ ভঙ্গিমায় মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে। তারপর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে চলে যায়।

যুবরাজ আবুবকর প্রাসাদে প্রবেশ করে। প্রাসাদের প্রত্যেকটি কামরা রং মহলের মত সুন্দর ও মনোরম করে তৈরি করা হয়েছে। দরজায় দরজায় তাক লাগানো রং-বেরঙের উজ্জ্বল রেশমি কাপড়ের পর্দা, সোনা ও রূপার তৈরি ঝলমলে জরি দ্বারা সজ্জিত। সুন্দর সুন্দর কার্পেট বিছানো। মর্মর পাথরের টেবিলগুলো কারুকাজকরা চাদরে আবৃত। তার উপর স্বর্ণের ফুলদানীতে বাহারী ফুলের সমাহার।

তারা দাসিদের সঙ্গে এগিয়ে চললো। কয়েকটি কামরা অতিক্রম করে এমন একটি কামরায় পৌঁছলো, যার প্রত্যেকটি জিনিস স্বর্ণের তৈরি। দরজায় স্বর্ণ-সুতায় তৈরি চমৎকার ঝালরবিশিষ্ট পর্দা। স্বর্ণের কারুকার্যখচিত বিভিন্ন নক্‌শা। স্বর্ণসুতায় তৈরি কার্পেট, টেবিলের চাদর। স্বর্ণের ফুলদানী। মোটকথা, সবকিছুই স্বর্ণের তৈরি। সে কামরায় একটি হাউজ বিদ্যমান। হাউজের দেয়াল ও তার ফোয়ারাটিও স্বর্ণের তৈরি। হাউজের মাঝে যে মাছগুলো সাঁতার কাটছিলো, তার রং সোনালী– তাও যেনো স্বর্ণের তৈরি।

সে কামরায় সেবায় নিয়োজিত দাসি, নর্তকী ও গায়িকারা সোনালী রঙের মূল্যবান পোশাক পরে আছে। আর খলীফা আবু আহমদ আব্দুল্লাহ মুসতাসিম বিল্লাহ খান্দানী কালো রঙের পোশাক পরে এক সোফায় বসে আছেন। তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কয়েক ব্যক্তি পাখা দ্বারা বাতাস দিচ্ছে। সেবিকা, নর্তকী ও গায়িকা তন্বী নারীরা দুর্লভ সুগন্ধিতে সুভাসিত। আর খলীফাকে মনে হচ্ছিলো যেনো তিনি সুগন্ধিতে ডুবে আছেন।

যুবরাজ ও শাহজাদাদ্বয় অগ্রসর হয়ে খলীফাকে সালাম করলো। খলীফা

সালামের জবাব দিয়ে তাদের দিকে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। কারণ, সে সময় সেখানে সুন্দরী রূপসী উদ্ভিদ-যৌবনা নর্তকীরা মনো:মুগ্ধকার নৃত্য পরিবেশন করছিলো। যুবরাজ ও শাহজাদাদের আগমনে নৃত্যানুষ্ঠানে কিছুটা ছেদ পড়লো।

খলীফা ইঙ্গিতে বসতে বললে তারা একটি সোফায় বসে পড়লো। গায়িকারা গান শুরু করলো। সুরের তালে তালে এক মোহময় অবস্থা সৃষ্টি হলো। দেয়ালে দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি ওঠলো। সে এক অন্য জগত, অন্য দুনিয়া।

কিছুক্ষণ পর গান বন্ধ হলে যুবরাজ আবুবকর বললো, মহামহিম খলীফা! আমরা আপনার নিকট কিছু কথা বলতে এসেছি।

ঃ বলো।

ঃ আমরা নির্জনে বলতে চাই।

খলীফা দাসিদের ও অন্যান্য মেয়েদের হাতে ইশারা করলেন। সকলে একে একে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

ঃ বলো, তোমরা কেনো এসেছো?

ঃ আহমদ ভাই আপনাকে কিছু ঘটনা শুনাতে চায়।

খলীফা আহমদের দিকে ফিরে তাকালেন। আহমদ বললো, আমরা মহামহিম খলীফার সমীপে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে এসেছি, যার মাধ্যমে বাগদাদের শান্তি ও নিরপত্তা ধূলিসাৎ করা হচ্ছে। কিছু দাঙ্গাবাজ শিয়া এসব করছে, যাদেরকে চিন্তাশীল দূরদর্শী নেতৃস্থানীয় শিয়ারাও ভালো বলে না। ইতিমধ্যে তারা কিছু হৃদয়বিদারক কাণ্ডও ঘটিয়েছে। তাদের যদি যথাসময়ে দমন না করা হয়, তাহলে এই দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধের আগুন বাড়তেই থাকবে।

ঃ আমি তো জানি কিছু দুশ্চরিত্র বদমাশ সুন্নী যুবক শিয়াদের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বাধ্য করছে। তারাই বাগদাদের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে।

ঃ হয়তো উজীরে আজম ইবনে আলকামী আপনাকে এ তথ্য দিয়েছেন।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে বাস্তব ও সত্য ঘটনা হলো, দাঙ্গাবাজ শিয়ারাই এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। তাদের মধ্যে এক যুবকের নাম শফীক। সে-ই তাদের নেতা। তারই ইশারায় একে একে সব দুর্ঘটনা ঘটছে। আর শফীকের পৃষ্ঠপোষক হলেন উজীরে আজম ইবনে আলকামী স্বয়ং।

খলীফা আহমদের কথা পছন্দ করতে পারলেন না। তাই বললেন, অত্যন্ত আফসোসের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, কেউ কেউ এ বিষয়টি পছন্দ করছে না যে, আব্বাসী খেলাফতের উজীরে আজম একজন শিয়া কীভাবে হতে পারে! ঐ ধরনের সুন্নীদের থেকেই এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে।

ঃ আসলে বাস্তব বিষয়টি একেবারে বিপরীত। সুন্নীরা নির্দোষ আর উজীরে আজমের সাথে কারো কোনো বিরোধ নেই। সবাই আন্তরিকভাবে কামনা করে, শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা অটুট থাকুক। মানুষ নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করুক।

ঃ ইব্‌নে আলকামী একজন নেকদিল মানুষ। সে তো শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে।

আবুবকর বললো, মহামহিম খলীফা! যদি ঘটনা এমনই হতো, তবে তো অভিযোগই থাকতো না। বরং বাস্তব ঘটনা হলো, ইব্‌নে আলকামী কোনো ষড়যন্ত্র করছেন। তিনিই নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে চান। এই তো কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। এক বাজারে প্রকাশ্যে শফীক সুন্নীদের কুৎসা গাইতে লাগলো। ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। হাঙ্গামা সৃষ্টি হলো।

হাসান আসাদ শিয়াদের নেতৃস্থানীয় ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনিও তাকে বুঝালেন। কিন্তু শফীক তাকে ধমকালো। তাঁর কোনো পরোয়া পর্যন্ত করলো না।

ইতিমধ্যে ইব্‌নে আলকামী সেখানে পৌঁছলেন। তিনি অত্যন্ত উত্তেজনামূলক কথা বললেন।

সুন্নীদের গ্রেপ্তার করে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন। আর শাসিয়ে বলে গেলেন, সুন্নীরা অত্যন্ত ফেতনাবাজ। তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে না ফেললে তারা শান্ত হবে না। যেনো প্রচ্ছন্নভাবে তিনি দাঙ্গাবাজদের সুন্নীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে উৎসাহ দিয়ে গেলেন।

ঃ না সে এমন বলতে পারে না।

ঃ আমি শিয়াদের সাক্ষ্য-প্রমাণেই এ কথা প্রমাণিত করে দিতে পারি। তাছাড়া যে সুন্নীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদি তাদের ব্যাপারে তদন্ত করা হয়, তবে গোটা বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ঃ আচ্ছা, বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখবো।

ঃ নিরপরাধ বন্দিদের ব্যাপারে আপনার হুকুম কী?

ঃ যদি তুমি তাদের নিরপরাধ মনে কর, তবে তাদের ছেড়ে দাও।

যুবরাজ আবুবকর খলীফার শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো। খলীফা বললেন, আরো কিছু বলার আছে কি?

আবুবকর বললো, শুধু এতোটুকুই নিবেদন যে, আপনি ইব্‌নে আলকামীর ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। সবার অজান্তে নিরপেক্ষভাবে আপনি বিষয়টি তদন্ত করুন।

খলীফা বললেন, আচ্ছা, তা-ই করবো।

যুবরাজ আবুবকর, শাহজাদা আহমদ ও আহমার খলীফাকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলো।

এগারো.

ফেরদাউস নাজমার সাথে গাড়িতে আরোহণ করে যাচ্ছে। নাজমাকে ঘিরে তার যতোসব চিন্তা। পূর্ব থেকেই সে শাহী গাড়ি চিনতো। তার দৃঢ়বিশ্বাস, নাজমা অবশ্যই শাহজাদী।

ফেরদাউসের মাথায় চার কোণ বিশিষ্ট বিস্ময়কর এক টুপি। উজ্জ্বল মুক্তা দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত। আলোর পরশে মুক্তাগুলো থেকে থেকে ঝলমলিয়ে ওঠছে। দারুণ সুন্দর লাগছে ফেরদাউসকে। নাজমার ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। বললো, কী ভাবছো ফেরদাউস!

ফেরদাউস নাজমার মোহময় সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো, আমি আপনার ব্যাপারই চিন্তা করছি। আমি তো একটি ভুল করে ফেলেছি।

ঃ কী ভুল করেছো?

ঃ আমি আপনাকে বোন বলে ফেলেছি!

ঃ এতে ভুলের কী হলো?

ঃ কোথায় শাহজাদী আর কোথায় আমি!

ঃ তুমি কি সাধারণ মেয়ে?

ঃ তাই তো।

ঃ এটা তোমার হীনম্মন্যতা বৈ নয়। তুমি তো পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুন্দরী। যদি ইহলোকে পরী বলতে কিছু থাকে, তাহলে তুমিই সেই পরী।

ফেরদাউস তার পটোলচেরা চোখ দু'টি নাজমার দিকে তুলে ধরলো। বললো, আর আপনি?

ঃ লৌকিকতা রাখো। আমাকে আর আপনি বলবে না।

ঃ তাহলে কী বলবো?

ঃ আমি যেভাবে তোমার সাথে কথা বলি, ঠিক তেমনি তুমি আমার সাথে কথা বলবে, সম্বোধন করবে।

ঃ এটা অভদ্রতা হবে।

ঃ তুমি আমাকে বোন বলেছো। সুতরাং আমি তোমাকে বোনই মনে করবো।

ঃ আপনি আমাকে কতো সম্মান দিচ্ছেন!

ঃ এরপরও আবার তুমি 'আপনি' বলছো।

ঃ না আমি ঐ দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারবো না।

ঃ তুমি নিজেই আমাকে বোন বলেছো। অথচ এখন বোন হওয়াকে অস্বীকার করছো।

ঃ এ গর্বের বিষয়টিকে আমি কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি?

ঃ তাহলে আমার কথা মেনে নাও।

ঃ আচ্ছা, হৃষ্টচিত্তেই মেনে নিলাম।

নাজমার গাড়িটি তার প্রাসাদে এসে প্রবেশ করলো। দাসিরা ছুটে এসে চার দিক ঘিরে দাঁড়ালো। নাজমা এবং ফেরদাউস গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগলো। দাসিরা তাদের পিছু পিছু আসতে লাগলো। তারা শাহীপ্রাসাদে এসে উঠলো। প্রাসাদের কক্ষগুলোর সাজসরঞ্জাম দেখে ফেরদাউস বিস্ময়ে বিমূঢ়। নাজমা তাকে নিজ কক্ষে নিয়ে গেলো। একটি মনোরম সোফায় গিয়ে বসলো। ঠিক তখন ফেরদাউসের অন্তরে একটি চিন্তা এসে উঁকি দিলো। ভাবলো, নাজমা তাকে বলেছে, সে কার নিকট থেকে জানি আমার আলোচনা শুনেছে। তাহলে সেই ব্যক্তিটি কে? তার ইচ্ছে হলো, সে নাজমাকে সেকথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সাহস হলো না।

নাজমা বললো, স্থির হয়ে বসো, কিছুক্ষণ আরাম করো।

ফেরদাউস মৃদু হেসে বললো, আমি কোমলদেহী নই।

ফেরদাউসের কথায় নাজমা হেসে ফেললো। বললো, মাশাআল্লাহ। ঝড় কবলিত ফুলবৃন্তের মতো এঁকে-বেঁকে দুলছিলে। বলেছিলে, দুরাচার শফীকের ঘটনায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

ফেরদাউস অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। বললো, আমি সারা জীবন তোমার কৃতজ্ঞ থাকবো। তুমি একেবারে সময় মতোই উপস্থিত হয়ে আমাকে ঐ লম্পট থেকে বাঁচিয়েছো।

নাজমা বললো, আমি তো নতুন কিছু করিনি যে, আবার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে।

তখন কয়েকজন দাসি এসে বিনীতকণ্ঠে খাবার প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ দেয়। ইতিমধ্যে দ্বি-প্রহর হয়ে গেছে। নাজমা ফেরদাউসের হাত ধরে তুলে নিয়ে বললো, এসো খাবার খেয়ে নেই।

ফেরদাউস বললো, কিন্তু আমি তো এক সাধারণ মেহমান।

নাজমা বললো, তুমি আমার বোন। তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

উভয়ে খাবার ঘরে পৌঁছলো। সৌরভে ভরা সুস্বাদু খাবার সাজানো। অল্পবয়স্কা রূপবতী দাসিরা মূল্যবান ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা গিয়ে চেয়ারে বসলো। দাসিরা তাদের হাত ধুয়ে দিলো। তারা খাবার শুরু করলো।

খাবার শেষে তারা শোয়ার কামরায় এসে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর ফেরদাউস বললো, অনুমতি হলে আমি বাড়িতে ফিরে যাই। বাড়ির সবাই আমার অপেক্ষা করছে।

ঃ দু'একদিন রেড়িয়ে গেলে বেশ ভালোই হতো।

ঃ আরেকদিন এসে থাকবো।

ঃ আচ্ছা, তাহলে চলো আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

ঃ তুমি! ফেরদাউস বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে নাজমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঃ আমি আমার বোনের বাড়ি চিনে নেবো।

ফেরদাউসের বিনয়ভরা কণ্ঠ। বললো, বাড়ি! আমাদেরও একটা বাড়ি!

ঃ তোমার ঐ বিনয় রাখো এবং স্মরণ রাখো ফেরদাউস! ভাগ্য একদিন নিশ্চয় তোমাকে বিরাট উপহার পেশ করবে।

উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। নাজমা এক দাসিকে গাড়ি তৈরি করতে বললো। তারপর কয়েক থান রেশমি কাপড় ও একটি অতি মূল্যবান দ্যুতিময় মুক্তার মালা ফেরদাউসের সামনে রেখে বললো, বোনের উপঢৌকন কবুল করো।

নাজমা এমনভাবে কথাটি বললো যে, ফেরদাউস তা অস্বীকার করতে পারলো না। সে তা কবুল করে নিলো। উভয়ে শাহী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে আরোহণ করলো। গাড়ি তার নিজস্ব গতিতে চলতে লাগলো। গাড়ির আগে চারজন ও পেছনে চারজন প্রহরী। নাজমা ফেরদাউস থেকে তার বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে প্রহরীদের বললে তাদের একজন ইয়াকুব জমিদারের বাড়ি চিনে ফেললো। গাড়ি সেদিকে ছুটে চললো।

ফেরদাউস বললো, আমি তো আমার বোনের নামটা জানতে পারলাম না।

ঃ আমার নাম নাজমা।

ফেরদাউস মৃদু হেসে বললো, যদি নামটি 'হুর-এ-ফেরদাউস' হতো তবেই না ঠিক হতো।

নাজমা আনন্দিত বদনে মাথা দুলিয়ে বললো, বেশ! শুকরিয়া।

বাগদাদের মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা তখন ছিলো অত্যন্ত করুণ। বৈষয়িক ও জাগতিক বিষয়ে তারা চরম উন্নতিতে পৌঁছেছিলো বটে। উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী ও যুবতীরা খোলামেলা বেপর্দা চলাফেরা করতো। তাই নাজমা আর ফেরদাউস নেকাবহীনভাবে খোলা মুখেই যাচ্ছে আর পথচারি তরুণ যুবকরা তাদের সৌন্দর্যে ও রূপ-লাবণ্যে মোহাবিষ্ট হয়ে হা করে দেখছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ফেরদাউসের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। প্রকাণ্ড দ্বি-তল বাড়ি। ফেরদাউস বললো, নেমে এসো।

নাজমা বললো, আমি বাড়িটি চিনে নিয়েছি। যখনই তোমার কথা স্মরণ হবে, এসে উপস্থিত হবো।

ফেরদাউস বললো, আমার আবদার রক্ষার্থে কিছুক্ষণের জন্য হলেও এসো।

নাজমা বললো, অমন করে বলবে না। আচ্ছা, তাহলে চলো।

তারা যখন উভয়ে গাড়ি থেকে নামছিলো, ঠিক তখন ইয়াকুব জমিদার বাড়ি থেকে বাইরে বেরুচ্ছিলেন। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি শাহী গাড়ির উপর পড়লো। আর অমনি তার হৃদয় ছ্যাঁৎ করে ওঠলো। তিনি আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ, এ ধরনের গাড়ি কারো বাড়িতে পৌঁছা মানে হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংস বয়ে আনা। কিন্তু পরক্ষণেই তার দৃষ্টি ফেরদাউস ও নাজমার উপর গিয়ে পড়লো। ফেরদাউসের হাসি হাসি মুখ দেখে নিমিষে তার ভয় ও আতঙ্ক দুরীভূত হয়ে গেলো। ফেরদাউস নাজমাকে বললো, ইনি আমার আব্বা।

নাজমা সহাস্যবদনে এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলো। ইয়াকুব জমিদার নাজমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের বাহার দেখে বিস্ময়ে থ খেয়ে রইলেন। ফেরদাউস বললো, আব্বাজান! ইনি শাহজাদী নাজমা।

শাহাজাদী! এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো জমিদার ইয়াকুবের কণ্ঠ চিরে। পরক্ষণেই উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, এসো শাহজাদী এসো, শুভেচ্ছা তোমার আগমনে, শত সহস্র শুভেচ্ছা।

ফেরদাউস নাজমাকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলো। পেছনে পেছনে জমিদার ইয়াকুবও এলেন। জমিদারের বাড়ি। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সৌন্দর্যমণ্ডিত। ভারি চমৎকার। বাড়ির মাঝে ছোট একটি ফুল বাগান। বাগানে নানা জাতের রং-বেরংয়ের ফুলের অপূর্ব সমারোহ। বাগানের মাঝে একটি ফোয়ারা। ফোয়ারার পানি উছলে শূন্যে ছড়িয়ে বিন্দু বিন্দু আকার ধারণ করে আবার নীচে নেমে আসছে। ভারি মনোরম সে দৃশ্য!

ফেরদাউস নাজমাকে নিয়ে তার মায়ের নিকট গেলো এবং নাজমাকে বললো, ইনি আমার আম্মিজান জুবায়দা। নাজমা সালাম দিলো। জুবায়দা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নাজমা বললো, বসুন আম্মিজান!

ফেরদাউস বললো, আম্মিজান বসুন, শাহজাদী আমাকে বোন ডেকে আপন করে নিয়েছে।

জুবায়দা বসলেন। ফেরদাউস-নাজমাও তার পাশে বসলো। ফেরদাউস শফীকের বাড়াবাড়ি এবং অকস্মাৎ নাজমার আগমন এবং উদ্ধারের কাহিনী শুনালো। জুবায়দা শাহজাদীর অনেক অনেক শুকরিয়া আদায় করলেন।

ফেরদাউস এক দাসিকে ডেকে নাজমার উপঢৌকনগুলো এনে তার আম্মাকে দেখালো। তার আম্মা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বিমুগ্ধ হলেন। অত:পর নাজমা বিদায়ের অনুমতি চাইতেই জুবায়দা বললেন, শাহজাদী! তোমার উপযুক্ত আমাদের এখানে কিছুই নেই। কিন্তু তবুও তোমাকে কিছু না কিছু খেতেই হবে।

ইতিমধ্যে দাসিরা কয়েকটি রেকাবি ভরে রকমারি ফল নিয়ে এলো। জুবায়দা, ফেরদাউস এবং নাজমা তা খেলো। এরপর নাজমা বিদায়ের অনুমতি চাইলে পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জুবায়দা তাকে বিদায়ের অনুমতি দিলেন।

নাজমা তাকে সালাম জানিয়ে গাড়িতে আরোহণ করে শাহী প্রাসাদে ফিরে এলো।

বারো.

বাগদাদের প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি এলাকায় মনোরম ফুলের বাগান বিদ্যমান। মহাসড়ক ও সাধারণ পথের উভয় পাশে সবুজ-শ্যামল ঘাস ও গাছের সারি।

প্রতিটি বিপণী ও বাজারের পাশে বা সামনে মর্মর পাথরে শান বাঁধানো ছোট ছোট নহর। নহরের উভয় পাশে মোহময় সুবাস-সৌরভে ভরা মায়াময় ফুল বাগান। স্বচ্ছ পানির এই নহরগুলো প্রত্যেক রাস্তা ও বাজারে প্রবাহিত হয়ে পানিসিক্ত করে প্রতিটি বাগানকে।

শাহীমহলগুলোতে বড় বড় নহর। আমীর-উমরা ও রঈসদের বাড়িতে ছোট ছোট নহর এবং সাধারণ মানুষের প্রতিটি বাড়িতে ছোট ছোট নালার মাধ্যমে স্বচ্ছ পানি পরিবেশিত হয়। এর পানিতে বাগ-বাগিচা, পার্ক ও ফুলের বাগান সিক্ত হয় এবং দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হয়। গোটা বাগদাদ শহরে সুপরিকল্পিতভাবে ছোট বড় পানির নহর ও নালা প্রবাহিত, যা বাগদাদের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট।

শাহীমহলগুলোতে, আমীর-উমরা এবং মধ্যবিত্ত প্রতিটি মানুষের বাড়িতে ভূগর্ভস্থ কুঠরী পর্যপ্ত আলো-বাতাস পৌঁছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে বাগদাদের মানুষরা সাধারণত ভূগর্ভস্থ কুঠরীতেই থাকে। সেখানে লু হাওয়া বা উত্তপ্ত বাতাস অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সর্বদা শীতল-স্নিগ্ধ থাকে। পড়ন্ত বিকেলে সবাই বেরিয়ে আসে।

বাগদাদের মার্কেটগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মার্কেটের দোকানগুলো সুসজ্জিত ও সুপ্রশস্ত। বাদগাদের অধিবাসীরা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে দূর দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্য বাগদাদে নিয়ে আসে। প্রথমে তা পাইকারী মার্কেটে বিক্রয় হয়ে প্রতিটি খুচরা মার্কেটে গিয়ে পৌঁছে। একেক পণ্যের মার্কেট একেক জায়গায়। সারা দিন এবং রাত দু'টা পর্যন্ত মার্কেট খোলা থাকে। সর্বদা রূপসী সুন্দরী যুবতীরা আর যুবকরা মার্কেটে ভিড় জমায়।

মেয়েরা সাধারণত চার কোণবিশিষ্ট টুপি ব্যবহার করে। শাহী বংশের আমীর-উমরার মেয়েদের টুপির উপরে মূল্যবান হিরকখণ্ড ঝলমল করে। তার নিম্ন অংশে স্বর্ণখচিত লেছ লাগানো থাকে। এই আকর্ষণীয় টুপির উদ্ভাবক হলেন খলীফা

হারুনুর রশীদের বৈমাত্রেয় বোন আউনিয়া। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা মুক্তা ও জমররদ পাথরসজ্জিত গোল টুপি ব্যবহার করে। তাতে চীনের তৈরি স্বর্ণের লেছ লাগানো হয়। মেয়েদের মাথায় এ টুপি বেশ চমৎকার মানায়। রূপসী ও সুন্দরী মেয়েদের রূপ সুষমাকে দিগুণ করে তোলে।

উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়েরা চমৎকার পোশাকে ও বিস্ময়কর অলংকারে সজ্জিত হয়ে খোলামেলা চলাফেরা করে। মার্কেটে-বাজারে ও বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ইসলামী বিধি-বিধানের কোনো তোয়াক্কা নেই। মাঝে-মধ্যে নিরালায় নির্জনে পেয়ে যুবকরা এদের উত্তক্ত করে না তা নয়, তবুও নির্লজ্জের মতো মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে-মার্কেটে ঘুরে কেনাকাটা করে আর সময় কাটায়।

প্রত্যেক মাজহাবের লোকই বাগদাদে বসবাস করে। শিয়ারাও বসবাস করে। তবে বাহ্যিকভাবে তাদের মাঝে কোনো মতভেদ ও বিরোধ নেই। সবাই মিলেমিশেই থাকে। তবে হাম্বলী, শাফেয়ী এবং শিয়াদের আবাস ভিন্ন ভিন্ন মহল্লায়। আর হানাফী মাযহাবের লোকেরা সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তারা গোটা শহরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। প্রতিটি মহল্লায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গোটা শহরে দশটি কলেজ। প্রত্যেক কলেজ সংলগ্ন বিরাট লাইব্রেরী। এছাড়াও অনেক লাইব্রেরী আছে। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর সংখ্যাও প্রচুর।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ছয় বৎসরে এক বিশাল লাইব্রেরী ভবন তৈরি করেছেন। ভবন তৈরির পর ষাট উট বোঝাই করে অগণিত গ্রন্থ এনে তাকে সাজিয়েছেন। তারপর দিনে দিনে সেই লাইব্রেরীর গ্রন্থের সংখ্যা এতো বেশি হয়েছে যে, গ্রন্থের তালিকার খাতা বহন করতে ষাটটি উটের প্রয়োজন হয়।

এ লাইব্রেরীর খরচের জন্য খলীফা মুসতানসির বিল্লাহ কয়েকটি গ্রাম ওয়াকফ্ করে দিয়েছেন। বিশাল এই লাইব্রেরী ভবনটি অত্যন্ত মনো:মুগ্ধকর। দু'দিকে চিত্তহারী ফু্লের বাগানে নানা জাতের, নানা রঙের সুগন্ধি ফুলের বিশাল সমারোহ। মাঝে মাঝে দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা। ফোয়ারার চার পাশে মর্মর পাথরের গোল চত্বর। পাঠকদের পড়ার জন্য আছে চমৎকার ব্যবস্থা।

অবাধ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ছেলে-মেয়েরা সবাই লেখাপড়া করে। পুস্তকালয়গুলোতে মানুষের অসম্ভব ভিড়। আমীর, রঈস ও শাহজাদারা পর্যন্ত গ্রন্থের সন্ধানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। লাইব্রেরীগুলোতে সর্বপ্রকার গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, হাদীস, ফিকাহ, গণিত প্রভৃতি বিদ্যা শব্দ প্রকরণ, বাক্য প্রকরণ, দর্শন, তর্কবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, কবিতা, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ সেখানে বিদ্যমান।

বাগদাদে প্রত্যেক শাস্ত্রের অনেক পণ্ডিত বসবাস করেন। প্রায়ই তারা লাইব্রেরীতে গিয়ে মিলিত হন। প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচিমত গ্রন্থ বেছে বেছে পড়েন। তারা পরস্পর চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার কথাও আলোচনা করেন।

আমীর-উমরা এবং খেলাফতের উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবীরা শাহী পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে। হাঁটু পর্যন্ত বিলম্বিত কালো আলখেল্লা, কোমরে অলঙ্কৃত মূল্যবান বেল্ট, আর মাথায় ঝুঁটিদার টুপি। প্রত্যেক মাজহাবের, প্রত্যেক স্তরের মানুষই কালো পোশাক পরিধান করে। আব্বাসী খলীফাদের অনুকরণেই তারা এ পোশাক পরিধান করে। তবে বিচারপতি এবং মুফ্তি সাহেবরা টুপির উপর পাগড়ি এবং পাগড়ির উপর কালো রঙের রোমাল ব্যবহার করেন। কখনো কাঁধেও ফেলে রাখেন।

নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সবাই কালো রঙের পোশাক পড়ে বাজারে মার্কেটে, পার্কে, বাগানে, দজলা নদীর তীরে এবং দজলা নদীতে বজরায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়। এ পোশাক পুরুষকে বেশ মানায় আর মেয়েদের রূপ লাবণ্যকে দ্বিগুণ করে তোলে।

বাগদাদ নগরীতে প্রচুর হাম্মামখানা। মহল্লায়-মহল্লায়, বাজারে-বাজারে হাম্মামখানা। প্রত্যেকটি হাম্মামখানা অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইনে রুচিসমৃদ্ধ করে তৈরি করা। সাত কামরা বিশিষ্ট এই হাম্মামখানাগুলো। শীতল ও উষ্ণ স্বচ্ছ পানি থাকে সর্বক্ষণ। গোসল করাতে পারদর্শী ব্যক্তিরা জনসাধারণকে ধুয়ে মুছে সুন্দরভাবে গোসল করিয়ে দেয়। অধিকাংশ হাম্মামখানা খেলাফতের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীনও কিছু হাম্মামখানা আছে। নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাম্মামখানা। পুরুষের হাম্মামখানায় পুরুষরা আর নারীদের হাম্মামখানায় নারীরা গোসল করিয়ে দেয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন হাম্মামখানাগুলোয়ও দু'ধরনের ব্যবস্থা। বাগদাদের অধিবাসীরা বাড়িতে গোসল না করে হাম্মামখানায় গিয়ে গোসল করে। তাই সর্বদা হাম্মামখানায় ভিড় লেগে থাকে।

হাম্মামখানায় সুবিন্যস্ত কামরাগুলোতে উষ্ণ পানির ব্যবস্থা। প্রত্যেক কামরায়ই নিয়োজিত কর্মচারিরা ঘষে-মেজে গোসল করায়। সাত কামরা অতিক্রম করে গেলে শরীরে কোনো প্রকার ময়লার লেশ পর্যন্ত থাকে না। হাম্মামখানা থেকে গোসল করে ঝরঝরে হালকা পরিচ্ছন্ন শরীরে বেরিয়ে এলে মনে এক ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন আমেজের আনন্দ শিহরণ খেলতে থাকে।

অবশ্য কিছু মানুষ দজলা নদীতেও গোসল করে। কিন্তু মর্মর পাথরের সিঁড়িতে গোসল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মেয়েদের হাম্মামগুলোতে সাজসজ্জায় পরদর্শীনী বিউটিশিয়ান মেয়েরা থাকে। তারা যুবতীদের সাজিয়ে গুছিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে। সত্য বলতে কি, সে যুগের বাদগাদ আজকের প্যারিসকেও হার মানাতো।

তেরো.

নাজমার মনে একতিল স্বস্তি নেই। ফেরদাউসের সাথে সাক্ষাতের পর থেকে তার মন কেবলই আকুলি বিকুলি করছে। কখন আহমার বা আবুবকর আসবে। কখন তাদের বলবে, ফেরদাউসের সাথে তার হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। তাই সে দারুণ আনন্দিত। আর এই আনন্দে সে আবুবকর ও আহমারকে শরিক করতে উদ্‌গ্রীব। সেদিন আবুবকর বা আহমার কেউ এলো না। কিন্তু সে তার ভাই আহমদের সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা সমীচীন মনে করলো না। কারণ, সে দেখেছিলো, আবুবকর আহমদকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলো এবং আহমারকে তার নিকট এ জন্য রেখে গিয়েছিলো, যেনো সে তার নিকট আবুবকরের কাহিনী বর্ণনা করে তাকেও সাথে নেয়। আবুবকরের এই বিষয়টি আহমারই জানে। আহমদ কিছুই জানে না। তাই নাজমা আহমদকে কিছুই বললো না।

রাতটা নাজমার খুব কষ্টে কাটলো। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সকালের নাস্তার পর আবুবকরের সাথে সাক্ষাৎ করবে। সে ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে গোসল করে নিলো। বিউটিশিয়ান মেয়েরা তাকে সাজিয়ে দিলো। তারপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নতুন কাপড় পরিধান করলো। অন্যান্য শাহজাদা ও শাহজাদীদের মতো সেও দিনে তিনবার কাপড় পরিবর্তন করে। সকালে, দুপুরে ও রাত্রে। এরপর নাস্তা করলো। আহমারের নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। গাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। যেই না সে গাড়িতে উঠতে যাবে, অমনি আহমার ও আবুবকর এসে উপস্থিত।

আহমার বললো, কোথায় যাচ্ছো?

নাজমা মুচ্‌কি হেসে বললো, আজ এতো সাত সকালে এলে যে?

ঃ আহমার ভাই নিয়ে এলো, তাই।

ঃ কেনো?

ঃ আমি কেনো? যে নিয়ে এসেছে সে-ই বলুক!

আহমার বললো, বললে কেনো, নাজমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তুমি অস্থির হয়ে আছো?

আবুবকর বললো, বোনের সাথে সাক্ষাতের জন্য যদি ভাই অস্থির হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

আহমার বললো, বানিয়ে বানিয়ে কথা বাড়ানোর কী প্রয়োজন? ফেরদাউসের আলোচনা শুরু করো।

নাজমা হেসে ফেললো। বললো, ভেতরে এসে বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতোক্ষণ কথা বলা যায়।

আহমার বললো, শুকরিয়া, বসার অনুমতি হয়েছে, আমার তো ধারণা ছিলো...।

নাজমা কথাটা সমাপ্ত করে বললো, হয়তো কোনো বাহানায় আজ বিদেয় করে দেয়া হবে।

আহমার বললো, জ্বি, তবে আমরা আজ শুধু সাক্ষাত করার জন্য আসিনি; বরং জেঁকে বসতে এসেছি।

উভয়ে সোফায় বসে পড়লো।

আহমার বললো, এখন তো আমাকেও বসতে হবে।

নাজমা বললো, বহুত আচ্ছা, বসুন।

ঃ জ্ঞানী লোকটি তোমার নিকট এসেছে।

নাজমা মুচকি হেসে বললো, অত্যন্ত দয়া করেছেন।

ঃ আমি তোমাকে ফেরদউসের বাড়ি দেখিয়ে দিতে এসেছি।

ঃ তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে।

নাজমার কথা শুনে আবুবকর ও আহমার উভয়েই বিস্মিত ও হতবাক্ হলো। হঠাৎ একই সাথে উভয়ে বলে ওঠলো, তুমি ফেরদাউসের সাথে সাক্ষাত করে ফেলেছো?

ঃ জ্বি। কীভাবে সাক্ষাত হলো শোনো।

নাজমা ফেরদাউসের সাথে হঠাৎ সাক্ষাত হওয়া, ফেরদাউসকে শাহী মহলে নিয়ে আসা এবং তার সাথে তার বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলো।

আবুবকর দাঁতে দাঁত পিষে বললো, বজ্জাত শফীককে আমি অবশ্যই চরম শিক্ষা দেবো।

আহমার বললো, না, এটা সমীচীন হবে না। সে সন্ত্রাসী। তাকে শাস্তি দিলে শিয়ারা মনে করবে, প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে। তারা অপপ্রচার শুরু করবে। কারণ, তারা প্রকৃত কারণটি জানে না। শিয়া জনসাধারণকে ক্ষেপানো ঠিক হবে না।

নাজমা বললো, এটাই বাস্তব কথা। এটাই সমীচীন যে, শফীককে কিছুই বলা হবে না।

আবুবকর বললো, আচ্ছা, তাহলে কিছুই বলবো না।

নাজমা বললো, সত্যই ফেরদাউস অত্যন্ত রূপবতী, লজ্জাবতী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্না মেয়ে।

ঃ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, তুমি তাকে পছন্দ করেছো।

ঃ খু-ব পছন্দ হয়েছে।

ঃ আচ্ছা, তাহলে কি ফেরদাউসের ওখানেই যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিলো?

ঃ না, আপনাকে ফেরদাউসের সাথে সাক্ষাতের সুসংবাদটি জানাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

ঃ শুকরিয়া।

ঃ বাসি মুখে কেবল শুকরিয়া আর শুকরিয়া। কোথায় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন? কোথায় মিষ্টি-মিঠাই?

ঃ চলো, তোমার মুখ মুক্তা দ্বারা ভরে দেবো।

ঃ শুধুই মুক্তা দ্বারা– হীরা, পান্না পাবো না?

নাজমা মৃদুমধুর হাসলো। আবুবকর বললো, আচ্ছা বলো তো, কবে তুমি সেই বাগদাদের হুরকে নিয়ে আসবে?

ঃ আপনি যখন বলবেন।

ঃ আজ কোনো এক সময় নিয়ে এসো।

ঃ বেশ ভালো কথা। কিন্তু আপনি তার সাথে দেখা করবেন কীভাবে?

আবুবকর বললো, এতোদিন পর্যন্ত যেভাবে দেখা-সাক্ষাত করে আসছি, সেভাবেই।

ঃ আমি কী জানি, আপনি কীভাবে দেখা-সাক্ষাত করতেন।

ঃ আমীর-উমরার পুত্রদের পোশাকে।

ঃ কোথায় সাক্ষাত হবে?

ঃ এখানেই, তোমার প্রাসাদে।

ঃ সে কি বলবে না যে, আপনি এখানে এলেন কীভাবে?

ঃ আমি এই প্রাসাদেরই লোক।

ঃ না, এটা ঠিক হবে না।

ঃ এতো তাড়াতাড়ি ফেরদাউসের নিকট তোমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হওয়া উচিৎ হবে না।

ঃ কেনো?

ঃ সে বিষয়টাকে আকাশের চাঁদ ধরার মতো অসম্ভব মনে করতে পারে।

ঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো সে ভয়ে আসা-যাওয়াই ছেড়ে দেবে।

ঃ আপনার যা ইচ্ছে।

ঃ আচ্ছা তাহলে কী এখন ফেরদাউসের নিকট যাচ্ছো নাজমা?

ঃ হ্যাঁ, আমি এখনই যাচ্ছি।

আহমার ও আবুবকর চলে গেলো আর নাজমা গাড়িতে চড়ে ফেরদাউসের বাড়িতে গেলো। সে দেখলো, কয়েকজন যুবক ফেরদাউসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শাহী গাড়ি দেখেই তারা কেটে পড়লো। নাজমা গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে প্রবেশ করলো। ফেরদাউসের আম্মা জুবায়দা তাকে সহাস্যবদনে আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন আর ফেরদাউস তাকে পেয়ে খুশিতে আটখানা। তারপর তিনজনে বসে কথা বলতে লাগলো।

জুবায়দা বললেন, অনুগ্রহ করে আবার তুমি এসেছো!

নাজমা বললো, বোন ফেরদাউসের অনুরোধ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে।

ফেরদাউস বললো, তুমি না এলে আমি আজ অবশ্যই যেতাম।

নাজমা বললো, আমি তোমাকে নিতে এসেছি এবং আম্মাজানকেও।

জুবায়দা বললেন, আহা, তুমি কতো ভালো...।

নাজমা বললো, তৈরি হয়ে নিন, আম্মাজান!

জুবায়দা বললেন, আমাকে মাফ করো মা। আরেকদিন আসবো। হ্যাঁ, ফেরদাউস যেতে পারে। তবে তোমাকে কিন্তু দুপুরের খানায় আমাদের সাথে অবশ্যই শরিক হতে হবে।

নাজমা বললো, অত্যন্ত আনন্দের সাথেই শরিক হবো।

জুবায়দা বললেন, খাবার প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই তুমি তৈরি হয়ে নাও ফেরদাউস!

নাজমা বললো, হ্যাঁ, ফেরদাউস! তৈরি হয়ে নাও।

জুবায়দা দাসিদের ডেকে দ্রুত খাবার তৈরির নির্দেশ দিয়ে দিলেন। ফেরদাউস গোসল করার জন্য চলে গেলো। জুবায়দা নাজমার সাথে কথা বলতে লাগলেন। ফেরদাউসের কেশদাম রেশমের মতো কোমল, আজানুলম্বিত, চিত্তহারী। সাজসজ্জায় পারদর্শী মেয়েরা তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো। তারপর ধবধবে পরিচ্ছন্ন কাপর পরে ফেরদাউস তৈরি হয়ে এলো।

ফেরদাউস যখন নাজমার নিকট এলো, তখন নাজমা তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তার স্মৃতিময় চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। এরপর খাবার এলে তারা খাবার খেলো। আহার শেষ হলে নাজমা জুবায়দাকে বললো, আপনার অনুমতি হলে আমি আগামীকাল নিজেই ফেরদাউসকে পৌঁছিয়ে দেবো।

জুবায়দা বললেন, আচ্ছা, অনুমতি রইলো।

নাজমা ও ফেরদাউস বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলো। শাহী গাড়ি আপন গতিতে শাহী ঢংয়ে চলতে লাগলো।

চৌদ্দ.

জ্ঞান-গরিমা, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তায় হাজেরা এক অসাধারণ মেয়ে। শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা সৃষ্টিকারী যুবক দলটিকে সে দারুণ ঘৃণা করে। তাদের অপরিণামদর্শী কাণ্ডে শিউরে ওঠে সে। হাজেরা বাস্তববাদী। সংকীর্ণতামুক্ত, উদার মেয়ে। শিয়া মেয়েদের মতো অসংখ্য সুন্নী মেয়েও তার সখী। শিয়া-সুন্নী উভয় গোষ্ঠীর সাথীদের চে' সে দাঙ্গাবাজ যুবক দলটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অনেক বেশি খবর জানে।

সাধারণ শিয়ারা শান্তিপ্রিয়। নিরুপদ্রব জিন্দেগীই তারা পছন্দ করে। কিন্তু স্বগোত্রীয় দাঙ্গাবাজ, উচ্ছৃঙ্খল ঐ যুবক দলটির কাছে তারা নিরুপায়। কিছুই তাদের করার নেই। বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তারা বেয়াদবী করে- ইজ্জতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই তাদের ভয়ে সবাই নীরব। কেউ কিছু বলে না।

প্রত্যেক গোত্র ও শ্রেণীতেই অশান্ত ও দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোক থাকে। আছে সুন্নীদের মধ্যেও। তবে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কাজ তারা করতে সাহস পায় না। তাই বলে শফীক ও তার দলবলের অপকর্মে তারা নীরব থাকতে পারে না। ক্ষেপে ওঠে তারা। লড়াই করে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও কেউ তাদের বুঝালে তারা নীরব ও শান্ত হয়ে যায়। জাতীয় সম্প্রীতি ও ঐক্যের খাতিরে কিছুই বলে না।

হাসান আসাদ একজন মর্যাদাবান ও সম্মানী শিয়া। তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি শিয়ারা দারুণ সতর্ক। সুন্নীরাও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। ইবনে আলকামী তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে খুব অবহিত। কিন্তু তিনি যখন শফীকের বাড়াবাড়ির কথা ইবনে আলকামীর নিকট তুলে ধরলেন, তখন ইবনে আলকামী তাকে ধমক দেন। নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের জন্য তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখলেন না।

হাসান আসাদ এতে দারুণ মর্মাহত হলেন। বিষয়টি সহজে হজম করতে পারলেন না। তিনি মনের যাতনায় অস্থির হয়ে বেদুইন বেশে বাগদাদ ছেড়ে মিসর বা দামেশ্‌ক চলে যাওয়ার ইচ্ছে করলেন। দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাপারটি গোপন রইলো না। এক কান দু'কান হয়ে অবশেষে সংবাদটি যুবরাজ আবুবকরের কানেও পৌঁছে। তৎক্ষণাৎ আবুবকর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বিনীত কণ্ঠে বললো, আপনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কেনো চলে যাচ্ছেন?

হাসান আসাদ বললেন, আপনাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট নই। ইবনে আলকামীর আচরণ আমাকে অসহনীয় দুঃখ দিয়েছে। তাই আমি বাগদাদ ছাড়ার সংকল্প করেছি।

আবুবকর বললো, কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, আপনি বাগদাদ ছেড়ে চলে গেলে মানুষ বলাবলি করবে, সুন্নীরা এমন সম্মানিত শিয়াকে পর্যন্ত বাগদাদে থাকতে দিলো না। তারা তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করলো। এতে শফীক ও তার দাঙ্গাবাজ দল চরম সুযোগ পেয়ে যাবে। আপনার নাম ভাঙ্গিয়ে তারা ফেতনা ও দাঙ্গার মাত্রা বৃদ্ধি করবে। এতে ইবনে আলকামীর অসৎ উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে। দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণ হবে না।

হাসান আসাদের কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, আরে! আমি তো এদিকটি একবারও

ভেবে দেখনি! আচ্ছা, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, বাগদাদ ছেড়ে কোথাও যাবো না। কিন্তু ধুরন্ধর ইবনে আলকামী কি আর বাগদাদ ধ্বংস না করে ছাড়বে!

প্রত্যাশায় ভরা কণ্ঠে আবুবকর বললো, আপনার মতো মহান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ইনশা আল্লাহ ইবনে আলকামীরা কিছুই করতে পারবে না।

হতাশায় ভরা হাসান আসাদের কণ্ঠ। বললেন, শোনো আবুবকর! আমার মন কিন্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে বাগদাদকে ধ্বংস করেই ছাড়বে। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি আর বাগদাদ ছেড়ে কোথাও যাবো না। বাগদাদের কল্যাণে প্রয়োজনে জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করবো না।

আবুবকর উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, বেশ! হাজার শুকরিয়া; আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন।

ঃ আচ্ছা, তুমি খলীফার নিকট সবকিছু খুলে বলো না কেনো?

ঃ তাঁকে সবকিছু অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর উপর ইবনে আলকামীর এমন প্রভাব যে, তিনি ইবনে আলকামীর বিরুদ্ধে কোনো কথাই শুনতে চান না।

ঃ হ্যাঁ, এটা তো দারুণ শংকার কথা। সেদিন তো সে নির্বিচারে চরম লাঞ্ছনার সাথে উপস্থিত সকল সুন্নীকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো!

ঃ অবশ্য খলীফা তাদের মুক্তি দিয়েছেন।

ঃ কিন্তু এটা ইনসাফ হয়নি। যারা তাদের উপর অত্যাচার করেছে, যদি তাদের শাস্তি দেয়া হতো, তবেই তা ইনসাফ হতো।

ঃ আপনার কথা ঠিক। তবে এটাও কম সফলতা নয় যে, খলীফা তাদের মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।

ঃ আমার মনে হচ্ছে, সে খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে বাদশাহ হবে অথবা বনু বুইয়াদের মতো খলীফাকে নিজের আয়ত্ত্বে রেখে স্বাধীনভাবে নিজেই খেলাফত পরিচালনার চিন্তায় আছে।

ঃ আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

ঃ একারণেই আমার বাগদাদ ধ্বংসের ভয় হয়।

ঃ এমনটি ভাববেন না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের অকল্যাণ করবেন না।

আবুবকর সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলো। হাসান আসাদ বাগদাদ পরিত্যাগের ইচ্ছা মুলতবি করলেন। শফীক এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিমর্ষ হলো। সে মনে মনে ফন্দি আঁটছিলো, হাসান আসাদ চলে গেলেই শিয়াদের এই বলে উত্তেজিত করে তুলবে যে, সুন্নীদের জ্বালাতনে হাসান আসাদের মতো উদার হৃদয়ের মানুষটিও বাগদাদে থাকতে পারলেন না। সুন্নীদের নির্যাতন আর সহ্য করা যায় না। কিন্তু তার সকল ফন্দি বিফলে গেলো। ইবনে আলকামীরও দুঃখের সীমা রইলো না।

অবশ্য আরেকটি বিষয় ইবনে আলকামীকে আরো বেশি ক্ষিপ্ত করে তুললো। তাহলো, সে যে সব সুন্নীদের গ্রেপ্তার করেছিলো, খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তাদেরকে তার পরামর্শ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়টি সে কিছুতেই সহ্য হতে পারছে না। তাই সে ভীষণ চিন্তিত, কীভাবে খলীফার ক্ষমতা হ্রাস করা যায়।

হাজেরা বললো, আব্বাজান! খলীফা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যের উৎস। আমি মনে করি, তার ব্যাপারে অমন চিন্তা করা আপনার ঠিক হবে না।

ঃ শোনো মেয়ে! এতেই যে আমার গোত্রের কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি!

ঃ আল্লাহর অনুগ্রহে ও আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে বংশ মর্যাদায় আমরা এখন সকলের শীর্ষে।

ঃ হ্যাঁ, তবে যে শীর্ষে আমি পৌঁছুতে চাচ্ছি, তার নাগাল আমি এখনো পাইনি।

ঃ তাহলে আপনার ইচ্ছে কী?

ঃ আমি চাই খেলাফতের সকল শক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসুক আর খলীফা আমাদের আঙুলের ইশারায় চলুক।

ঃ কিন্তু খলীফার লোকেরা কি তা মেনে নেবে?

ঃ ক্ষমতার প্রতাপে অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমার গোত্রের নির্বোধ লোকেরা তো বোঝে না, আমি কী করতে চাচ্ছি, কী আমার উদ্দেশ্যে।

ঃ আপনি তাদের বিষয়টি বুঝান।

ঃ এখনো আমি এই কথাটি স্পষ্টভাবে বলতে পারছি না। কারণ, শিয়ারা সংখ্যালঘু। দাঙ্গা সৃষ্টি হলে শিয়ারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখনই তারা আমার কথামতো চলবে। আর তখনই আমি সুন্নীদের উপর কঠোর আচরণ করবো। তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে উদ্দেশ্য হাসিল করবো এবং ক্ষমতা আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

ঃ কিন্তু আপনি এ দিকটি চিন্তা করেছেন কি যে, যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শিয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে পরাজয়বরণ করে, সুন্নীরা বিজয়ী হয়, তাহলে আপনার মন্ত্রীত্বটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না আর আমাদের গোত্রের লোকেরা বাগদাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে?

ইবনে আলকামী যেনো একটি নতুন চিন্তার বিষয় পেলেন। হাজেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমার কী অভিমত?

ঃ আমি তো এটাই ভালো মনে করি যে, আপনি মর্যাদার যে উঁচু স্থানে পৌঁছেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিন্তা পরিত্যাগ করুন।

ঃ আমার চিন্তা এমনই ছিলো। আমি ভেবেছিলাম যুবরাজের সাথে তোমার বিয়ে হবে। এভাবে ক্ষমতা আমাদের গোত্রের হাতে চলে আসবে। কিন্তু এতে দীর্ঘ

সময়ের প্রয়োজন। তাই সে চিন্তা পরিহার করেছি। যার হাতে এক নির্ভীক দুর্দান্ত দাঙ্গাবাজ দল রয়েছে, তার নাম শফীক। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

ঃ আপনি নিঃসন্দেহে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার মনে হয় এ পথে আপনি সফল হতে পারবেন না। শাহজাদাদের মাঝেও এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেছে।

ঃ কোনো পরোয়া নেই। শাহজাদাদের নাকেও আমি খত পরিয়ে দেবো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ এটা কীভাবে সম্ভব?

ঃ খলীফা আমার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত। তিনি নির্দ্বিধায় মাথা পেতে আমার কথা মেনে নেন। এর কারণ খলীফা বুদ্ধিহীন এবং দারুণ ভীতু। কথার তালে তালে আমি শাহজাদাদের সম্পর্কে তার অন্তরে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেবো। ব্যস, কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

ঃ এতে কি শাহজাদারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবে না?

ঃ তারা এতোটুকু দুঃসাহস পাবে না। হঠাৎ ইবনে আলকামী ওঠে বাইরে চলে গেলেন। মনে হলো, কোনো জরুরি কাজের কথা স্মরণ হয়েছে তার।

পনেরো.

নাজমার সাথে ফেরদাউস শাহী প্রাসাদে এলো। সে জানে, আজ নাজমা তাকে যেতে দেবে না। রাতেও তাকে শাহী প্রাসাদেই থাকতে হবে। নাজমার সাথে সাক্ষাতের পরই সে শাহী প্রাসাদ দেখছে। প্রাসাদের ফাঁকে ফাঁকে মনোরম, হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্যময় ফুল ও ফলের বাগান আর মাঝে মাঝে স্বচ্ছ পানির নহরমালা, যেনো মর্তের বুক চিরে জান্নাতের বিকাশ।

দুপুরে আহার শেষে তারা বিশ্রাম করছিলো। এক দাসি এসে বললো, আবুবকর এসেছেন।

নাজমা বললো, ফেরদাউস! তুমি বিশ্রাম করো। আমি আসছি।

ফেরদাউসের ঠোঁটে মিটি মিটি হাসি। ফোড়ন কেটে বললো, লোকটা তোমার কে?

ঃ সে যুবরাজ। আমার ভাই।

ঃ তার নাম শুনেই যে উঠে বসলে, ব্যাপার কী?

ঃ ব্যাপার আবার কী? আজ সে যুবরাজ, কিছুদিন পরই খলীফা হবে।

ঃ আর তুমি হবে খলীফাপত্নী।

ঃ ভবিষ্যতই বলবে কে হবেন খলীফাপত্নী।

ঃ কেনো? অন্য কেউ ভবিষ্যৎ খলীফার পত্নী হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি?

ঃ হ্যাঁ, এক মেয়ে আছে। সে ফুলের চেয়েও বেশি কোমল। চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর। কিন্তু ভবিষ্যৎ খলীফাপত্নী হতে সে নারাজ। অথচ যুবরাজ তার কামনায় অধীর। কিন্তু...?

ঃ কিন্তু আবার কী?

ঃ অন্য সময় বলবো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নাজমা দ্রুত চলে গেলো। অন্য কামরায় আবুবকর তার অপেক্ষা করছিলো। নাজমা তাকে বললো, তোমার ফেরদাউস এসে গেছে।

ঃ আল্লাহর শুকরিয়া, তাহলে চলো।

ঃ কেনো? কী উদ্দেশ্যে?

ঃ সাক্ষাৎ করবো।

ঃ এভাবে দেখা করা ঠিক হবে না। বরং কিছুক্ষণ পর আমি তাকে নিয়ে বাগানে ঘুরতে যাবো। তখন তুমি আসবে আর আমি কেটে পড়বো।

ঃ তাহলে তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।

ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ধৈর্য ধরো।

আবুবকর চলে গেলে নাজমা মিটি মিটি হাসতে হাসতে ফেরদাউসের নিকট ফিরে এলো। ফেরদাউস বললো, বেশ, সাক্ষাৎ হয়েছে বুঝি! ওষ্ঠাধরে মধুর হাসির লীলা আর আঁখিতে উল্লাসের লহরী দেখা যাচ্ছে।

ঃ ঐ মেয়েটি নাকি শাহী প্রসাদে এসেছে। তাই আমাকে বললো, তুমি চলো। আমি বললাম, না, আজ নয়, আমার এক সখী এসেছে, ওকে রেখে যাবো না। সে বললো, তোমার সখীও কি আমার দুশমন যে. আজই তার আসতে হলো?

ঃ আহ! তুমি বেচারার সাথে গেলে না কেনো?

ঃ তোমাকে একা, নিঃসঙ্গ ফেলে কীভাবে যাই?

ঃ আমাকেও সাথে নিয়ে যেতে। আমি যুবরাজের প্রেমাস্পদকে একটু দেখে নিতাম।

ঃ ইনশাআল্লাহ! আরেকদিন দেখাবো।

নানা কথার মালা গাঁথতে গাঁথতে বেশ সময় চলে গেলো। এখন পড়ন্ত বিকেল। বাইরে ফুরফুরে বাতাসের প্রচুর আনাগোনা। নাজমা বললো, এসো ফুল বাগান থেকে একটু ঘুরে আসি।

ফেরদাউস তার সাথে বেরিয়ে পড়লো। বাগানে পৌছে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করলো। তারপর ফোয়ারার পাশে এসে বসলো। ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত পানি বিন্দু বিন্দু আকার ধারণ করে আবার ফোয়ারাতেই পড়ছে। আর পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের মিষ্টি আলো তাতে চমৎকার রংয়ের সৃষ্টি করেছে। বিস্ময়ভরা চোখে ফেরদাউস তা-ই দেখছিলো। ইতিমধ্যে আহমার এলো। ফেরদাউস তাকে দেখে বললো, ঐ, উনি কে আসছেন?

ঃ উনি মোল্লাজী। শাহী প্রসাদে এ নামেই খ্যাত। রোযা-নামাযে দারুণ পাবন্দ। তার নাম শাহজাদা আহমার।

আহমার এগিয়ে এসে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, মাফ করবেন। অনুমতি ছাড়াই চলে এলাম।

ঃ কেনো এলেন?

ঃ শুনলাম, হাজেরা নাকি এসেছে।

ঃ জি-না।

ঃ একটু খুঁজে দেখবেন কি?

নাজমা হেসে ফেললো। সে তাকে বাজিয়ে দেখতে চায়। তাই বললো, আসুন, খোঁজ নিয়েই দেখি সে এসেছে কিনা। বোন ফেরদাউস! অল্প কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

নাজমা আহমারের সাথে চলে গেলো। ফেরদাউস একাকি বসে আবার ফোয়ারার পানির খেলা দেখছে। বিন্দু বিন্দু পানির কণাগুলো ঝিলমিল করে বাতাসে ভেসে আবার ফোয়ারায় নেমে আসছে। স্বচ্ছ পানি ভেদ করে হাউজের তলায় দৃষ্টি পড়ছে। লাল, সবুজ, নীল রংয়ের মাছ তাতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে। হঠাৎ তার কানে মৃদু পদবিক্ষেপের শব্দ ভেসে এলো। মনে করলো, বুঝি নাজমা ফিরে আসছে। কিন্তু ফিরে তাকাতেই তার আক্কেল গুড়ুম। সাদা ধবধবে পোশাকে আবুবকর দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বললো, আরে! আপনি এখানে!

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে এলে কীভাবে?

ঃ শাহজাদী নাজমার সাথে এসেছি। কিন্তু আপনি?

ঃ আমি এই প্রাসাদের প্রহরীদের অফিসার।

ঃ আগে তো কখনো এ কথা বলেননি।

ঃ এটা কি আর বলার মতো বিষয়?

ঃ কেনো? এটা কী কোনো সাধারণ চাকরি?

ঃ না, সাধারাণ নয়, তবে খুব অসাধারণও নয়।

ঃ আমি ধারণা করেছিলাম, হাশেম সাহেব কোনো জমিদার হবেন। কিন্তু এখন দেখছি মস্ত এক চাকুরীজীবী।

আবুবকর ফেরদাউসের নিকট তার নাম হাশেম বলেছিলো। তাই সে নামেই ফেরদাউস তাকে সম্বোধন করতো।

আবুবকর বললো, জমিদারীর চেয়ে শাহী প্রসাদের প্রহরীদের অফিসারের পদমর্যাদা কি কম?

ঃ না, তা বলছি না।

ঃ আমার ইচ্ছা এই চাকুরি ছেড়ে দেবো।

ঃ না, কিছুতেই ছাড়বেন না।

আবুবকরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ঝিলিক। বললো, আচ্ছা, তোমার যখন এই হুমুক, তা হলে ছাড়ছি না।

ফেরদাউস ছানাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো, তাহলে আপনি আবার...।

লজ্জা ও জড়তায় সে কথাটা পূর্ণ করতে পারলো না। আবুবকর তা পূর্ণ করে বললো, দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছেন।

লজ্জাভরা দৃষ্টিতে ফেরদাউস তার দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ।

ঃ ফেরদাউস! তুমি আমাকে যাদু করেছো। নিশ্চয় তুমি মায়াবীনী, সুন্দরী, যাদুকরী।

ঃ আরো কিছু বলুন।

ঃ আমি সত্য বলছি।

মেয়েদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিলো না। কয়েকবার আমার বিয়ের আলোচনা হয়েছে। আমি বার বার প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু যখন তোমাকে দেখলাম...।

ঃ জ্বি–

ঃ আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম।

ফেরদাউস খিলখিল করে হেসে ওঠলো। ফুটন্ত গোলাপের মতো ফুটে ওঠলো তার চেহারা। বললো, কিন্তু আমি তো আপনার বিবেক-বুদ্ধিতে কোনো পার্থক্য দেখছি না।

ঃ এটাই তো নির্বুদ্ধিতার আলামত যে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে কথা বলছি। যদি শাহজাদী নাজমা এসে দেখেন, তবে নিশ্চয় রাগ করবেন।

ঃ এ মুহূর্তে এদিকে কেনো এলেন?

ঃ হৃদয়ের আকর্ষণ টেনে এনেছে।

ঃ আচ্ছা আপনি কি বলতে পারেন, শাহজাদী নাজমা এখন কেনো মোল্লাজীর সাথে গিয়েছেন।

মোল্লাজী নামটি শুনে আবুবকর হেসে ফেললো। বললো, শাহজাদা আহ্মারকে মোল্লাজী নামে ডাকা হয়।

ঃ হ্যাঁ, তিনিই হবেন। তাহলে শাহজাদী নাজমা কি তার বাগদত্তা?

ঃ ওসব তো কিছুই জানি না। তবে এ ধরনের কিছু একটা হওয়ার সম্ভবনা আছে।

ঃ দেখলাম, শাহজাদী নাজমা তার কথা ফেলতে পারলেন না। তিনি হাজেরা নামের এক মেয়েকে খুঁজছিলেন। সেই মেয়েটি কে?

ঃ হাজেরা উজীরে আজম ইবনে আলকামীর মেয়ে। হয়তো মেয়েটি এদিকেই এসেছিলো।

ঃ মেয়েটি কি প্রায়ই এদিকে আসে?

ঃ হ্যাঁ, আচ্ছা তোমাকে একটি কথা বলি, যদি আমি উন্নতি করতে করতে অন্য কিছু হয়ে যাই...।

ফেরদাউস হেসে ফেললো। বললো, বাঘ, সিংহ না অন্য কিছু?

আবুবকর বললো, বাঘ-সিংহ নয় বরং ফৌজের কর্নেল, উজীর বা অন্য কিছু?

ঃ আর কী? শাহজাদা?

ঃ শাহজাদা হওয়া তো কঠিন। কিন্তু তুমি তাতে ভয় পাবে না তো?

ঃ আপনি যাই হোন, তাতে ভয় পাওয়ার কী আছে?

ঃ সুন্দরী মায়াবীনী তো। তাই তোমার কোনো ভয় লাগে না।

ফেরদাউস দেখলো, নাজমা আসছে। বললো, ঐ তো শাহজাদী আসছেন।

উহ্ বলেই আবুবকর চলে গেলো। নাজমা এসে জিজ্ঞেস করলো, কে যেনো এসেছিলো?

ঃ প্রাসাদের প্রহরীদের অফিসার।

নাজমা রহস্যময় মিটি মিটি হাসলো। বললো, ফুল নেবে কি?

ঃ চলো।

ঃ উভয়ে ফুল বাগানের দিকে চলে গেলো।

ষোলো.

ইবনে আলকামী চাচ্ছিলেন, যেনো দ্রুত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। কিন্তু দূরদর্শী, বুদ্ধিমান শিয়া ও সুন্নীরা তা হতে দেয় না। শফীক প্রতিদিনই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে চলছে। এতে শিয়া-সুন্নীদের মাঝে একটু আধটু শোর-হাঙ্গামাও হচ্ছে। কিন্তু তা শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দাঙ্গার রূপ নিতে পারছে না। মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী যা চাচ্ছেন, তা হচ্ছে না। তাই তার অনেক কষ্ট, অনেক আক্ষেপ।

ইবনে আলকামী জানতেন, নেতৃস্থানীয় শিয়ারা ফেতনা-ফাসাদ চায় না। তাই তিনি একদিন তাদের নির্জনে তিরষ্কার করে বললেন, সুন্নীদের দুঃসাহস দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। শিয়ারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আপনারা তাদেরই পক্ষ নিচ্ছেন। এটা আত্মঘাতি বৈ কিছুই নয়।

মধ্য বয়সী এক শিয়া দাঁড়িয়ে বললো, মূর্খ সুন্নীরা শিয়াদের মন্দ বলে। আর মূর্খ শিয়ারা সুন্নীদের নিন্দা করে। এই সুযোগে কিছু সন্ত্রাসী দাঙ্গা বাঁধাতে চাচ্ছে। আমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করি না। তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে থামিয়ে দেই।

ইবনে আলকামী ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। বললেন, তাহলে কী আপনারা চান,

শিয়ারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে থাকুক?

মুহাম্মদ আউল নামের এক শিয়া দাঁড়িয়ে বললো, বিষয়টি এমন নয়। বরং হাঙ্গামাকরী কিছু শিয়াই সুন্নীদের গালমন্দ করে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

ইবনে আলকামী বললেন, আপনারা তো দারুণ সরল মানুষ দেখছি!

সুন্নীরা একটি ভয়াবহ দাঙ্গার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা এখন সময়ের অপেক্ষা করছে।

আউল মুহাম্মদ বললো, আমরা এমন কথা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি।

ইবনে আলকামী অপ্রস্তুত হলেন, লজ্জিত হলেন। কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর লোকেরা উঠে চলে গেলো। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, যতোক্ষণ না শিয়াদের উপর কোনো মহাবিপদ না আসবে, ততোক্ষণ তারা সুন্নীদের বিরোধিতায় উৎসাহী হবে না। আর যতোক্ষণ শিয়ারা তার সাথে না আসবে, ততোক্ষণ তার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

এতোদিন পর্যন্ত তিনি শফীকের কার্যপলাপে ভরসা করে আসছিলেন। তার বিশ্বাস ছিলো, শফীক দারুণ দুঃসাহসী, অত্যন্ত ফেতনাবাজ। নিশ্চয় এমন এক ফেতনা সৃষ্টি করবে, যার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হবে। তাই তিনি তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

শফীক কখনো উজীরে আজমের প্রাসাদে যায়নি। সে প্রাসাদের বিস্তৃতি ও শোভা-সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। দু'শ সুন্দরী দাসি প্রাসাদের কাজে নিয়োজিত। মধ্য বয়সী, অল্প বয়সী ও যুবতী সব দাসি অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ কাজ করছে। বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো শফীক।

উজীরে আজমের কামরায় পৌঁছুলে তিনি তাকে বিশিষ্ট সম্মানিত মেহমানের মতোই স্বাগত জানালেন। তারপর মহা মূল্যবান সোফায় নিয়ে বসালেন।

শফীক নিচু প্রকৃতির মানুষ। এতোটুকু আপ্যায়নেই সে ভুলে গেলো। ইবনে আলকামী বললেন, শহরের খবরা-খবর কী?

শফীক বললো, মনে হয় আল্লাহ তায়ালা বাগদাদের অধিবাসীদের উপর খুব মেহেরবান। সম্পদের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। আর সবাই নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছে।

ঃ কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতির খবর কী?

ঃ আমি প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত করবো। শহরের শান্তি নিরাপত্তা ধূলির সাথে মিশিয়ে দেবো। কিন্তু সবচে' বড় বাধা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই; তারা আমাদের সমর্থন দিচ্ছে না।

ঃ দুর্ভাগ্য, এই হতভাগ্যরা বোঝে না যে, আমি আর তুমি যা চাচ্ছি, তা আমাদের সম্প্রায়ের জন্য কতো কল্যাণকর। যদি আমি খলীফা হয়ে যাই তাহলে তো আমাদের গোটা সম্প্রদায়ই উপকৃত হবে। শিয়াদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

আর সুন্নীদের শক্তি হ্রাস পাবে।

ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের বর্ষীয়ান নেতা ও আমীররা অত্যন্ত নির্বোধ ও ভীতু। আমি যখনই কোনো পরিকল্পনা নিয়ে সাফল্যে পৌঁছুতে যাই, তখনই তারা বাধা সৃষ্টি করে। আমার সকল প্রচেষ্টাকে নিমিষে নস্যাৎ করে দেয়।

ঃ বর্ষীয়ানরা সাধারাণত ভীতুই হয়ে থাকে। তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না। আচ্ছা, তোমার ইয়ার-বন্ধুদের সংখ্যা কি কম?

ঃ না, কম নয়। কারণ, মহল্লার বহু যুবক আমার সাথী। কিন্তু তারা কী করবে? মহল্লার নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের শাসায়।

মহল্লাটি শিয়া অধ্যুষিত। ছোট হলেও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, সৌন্দর্যমণ্ডিত। এ মহল্লায় কয়েকজন আমীর, জমিদার ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী থাকেন। বিশাল বিশাল তাদের নিবাস। উঁচু উচুঁ তাদের প্রাসাদ। প্রাসাদের চারপাশে মনোরম বৃক্ষরাজি ও রং-বেরংয়ের ফল বাগান। ফুলের সুবাসে চারপাশ মোহিত থাকে সর্বক্ষণ।

ঃ তুমি এমন ব্যবস্থা নাও না কেনো, যেনো তারা ঐ নেতাদের কোনো কথা না শোনে ?

ঃ নিজে যা পারছি সবই করছি।

ঃ মনে হয় তুমি খলীফাকে ভয় পাও। ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনি আমার হাতের মুঠোয়। পুলিশ বলো, সেনাবাহিনী বলো সবাই আমার আয়ত্ত্বাধীন। মেজিস্ট্রেট-জজ সবাই আমার ইশারায় চলে। সুতরাং তোমার ভয়ের কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

ঃ না, আমি ভয় পাই না, তবে...।

ঃ তবে আবার কী?

ঃ মাল ছাড়া কোনো কাজ হয় না।

ঃ মাল যতো প্রয়োজন হয় নিয়ে যাও।

ঃ ইয়ার বন্ধুদের নির্ভীক ও দুঃসাহসী বানাতে হলে প্রচুর অর্থ ঢালতে হবে।

ঃ যা ইচ্ছে খরচ করো। আজই আমি তোমার নিকট পাঁচ হাজার দীনার পাঠাচ্ছি।

ঃ পাঁচ নয়– দশ হাজার পাঠাবেন।

ঃ আচ্ছা দশ হাজারই পাঠাবো। দেরহাম-দীনারের কোনো প্রশ্ন নেই। যতো চাও দেবো। আমি শুধু কাজ চাই।

ইবনে আলকামী সত্যই বলেছেন। তার দৌলতের কোনো অভাব নেই। তিনিই তো খেলাফতের আসল মালিক। যেভাবে পারছেন, যতোটুকু পারছেন ধন দৌলত চুষে নিয়ে পুঞ্জিভূত করছেন। খলীফার কোনো খবর নেই, কী করছেন বা কী হতে যাচ্ছে।

শফীক বললো, ধন-দৌলত ও দেরহাম-দীনারে কী না হয়? আজই আমি আমার ইয়ার-বন্ধুদের মাঝে তা বন্টন করে দেবো। দেখবেন কীভাবে তারা আমীর আর নেতৃস্থানীয়দের উপেক্ষা করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে।

ঃ যা করার দ্রুত করো। আর দেরি নয়।

ঃ না, আর দেরি হবে না।

ঃ যদি আগুন লাগিয়েই শুরু করো তবে কেমন হয়?

ঃ যদি আপনি লিখিতভাবে কোনো অনুমতি দেন, তবে আজই তা শুরু করবো।

ইবনে আলকামী লিখে দিলেন– 'যারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করে, যারা শহরের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের ঘর-বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে।'

আদেশক্রমে–

মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী, উজীরে আজম, বাগদাদী

ইবনে আলকামী এই ফরমাননামা লিখে শফীককে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, প্রয়োজন মনে করলে শিয়াদের ঘর দিয়েই শুরু করবে আর সুন্নীদের উপর দোষ চাপাবে। এতেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে।

ঃ আমিও এটাই চিন্তা করছি।

ঃ আমি এমন ব্যবস্থা নিচ্ছি, যেনো সৈন্যরা শহরে নিরাপত্তাহীন অবস্থা সৃষ্টি করে।

ঃ আপনি কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যেনো আমার কর্মীরা কোনো বিপদে না পড়ে।

ঃ কিছুতেই এটা হবে না। আমি এর যিম্মাদার।

ঃ শাহজাদাদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়। বিশেষভাবে যুবরাজ সম্পর্কে। কারণ, তিনি প্রায়ই শহর প্রদক্ষিণ করেন। খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন।

ঃ তোমরা কাউকে ভয় করবে না। ক্ষমতার বাগডোর আমার হাতে।

শফীক ইবনে আলকামী থেকে বিদায় নিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে আসছিলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি ফোয়ারার নিকট বসা হাজেরার উপর নিবদ্ধ হলো। ফুলবাগানে যেনো এক ফুলপরী। যেনো জান্নাতের হূর। বাতাসের তালে তালে মিষ্টিমধুর আবেশ ছড়িয়ে গান গাইছে। সে এক মোহনীয় দৃশ্য। শফীক থমকে দাঁড়ালো। তারপর ধীর পদক্ষেপে পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালো।

হাজেরা গান বন্ধ করতেই শফীক বললো, হে অপ্সরী! তোমার রূপের আগুনে আমার হৃদয় জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। তোমার মধুর কণ্ঠ আমাকে পাগল বানিয়েছে। তুমি... তুমি...।

হাজেরা ডাগর চক্ষু তুলে শফীককে দেখে বললো, বেয়াদব! কে তুই? এ কথা বলতেই শফীক এগিয়ে এসে বললো, প্রিয়া আমার, প্রাণ আমার!

এতোটুকু বলতেই হাজেরার গায়ে আগুন ধরে গেলো। হঠাৎ সে তার গালে কষে এক চপেটাঘাত করলো। শফীক পড়িমরি করে দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে গেলো। হাজেরা ক্ষোভভরা অপলক দৃষ্টিতে তার প্রতি চেয়ে রইলো।

সতেরো.

ফেরদাউস একদিন তার এক সঙ্গীর সাক্ষাতে যাচ্ছিলো। সে গাড়ির পেছনের আসনে বসা। কিছুদূর যেতেই দেখলো, কয়েকজন অশ্বারোহী সিপাই ছুটে আসছে আর রাস্তা থেকে পথচারি ও গাড়িগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। তার গাড়িও রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরই জমকালো পোশাকে সজ্জিত একদল অশ্বারোহী সিপাই ছুটে এলো। তাদের পশ্চাতে একটি চোখ-ধাঁধাঁনো কারুকার্যখচিত গাড়ি। আবুবকর তাতে বসে আছে। ফেরদাউস তাকে হাশেম বলে চেনে। সে দেখলো, তার পশ্চাতে রিসালদার বসে আছে। আবুবকরের গায়ে তখন শাহজাদার পোশাক। ফেরদাউসের দৃষ্টি তার উপর পড়তেই সে চমকে ওঠলো। সহসা আবু বকরের দৃষ্টিও তার উপর পড়লো। কিন্তু আবুবকর সাথে সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলো, যেনো সে তাকে চিনে ফেলতে না পারে। তবে ফেরদাউস তাকে ভালোভাবেই চিনে ফেলেছে।

আবুবকরের দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়া যদিও ফেরদাউসের নিকট ভালো লাগলো না; কিন্তু ঘটনার বিস্ময়তায় সকল চিন্তা হারিয়ে অন্য একটি চিন্তা, অন্য একটি ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। তাহলে কি হাশেম ফৌজে উন্নতি করে বড় কোনো পদমর্যদার অধিকারী হয়েছে? সাথে সাথে মাথায় আরেক প্রশ্নের উদয় তার সকল চিন্তাকে তালগোল পাকিয়ে দিলো। তাহলে তার গায়ে শাহজাদার পোশাক কেনো? এর রহস্য কী?

আবুবকরের গাড়ি চলে যাওয়ার পর পথিক ও থেমে থাকা গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। ফেরদাউসের গাড়িও চলতে লাগলো। যদিও সে এক সঙ্গীর সাক্ষাতে বেরিয়েছিলো; কিন্তু আবুবকরের এই অবস্থা দেখে তার মন অস্থির হয়ে ওঠলো। কোচওয়ানকে শাহজাদী নাজমার প্রাসাদে যাওয়ার হুকুম দিলো। কোচওয়ান শাহজাদীর প্রাসাদ অভিমুখে গাড়ি চালাতে লাগলো।

গাড়ি শাহজাদীর প্রাসাদে গিয়ে থামলো। ফেরদাউস নেমে ভেতরে গেলো। সহসা নাজমা ফেরদাউসকে দেখে বিস্মিত হলো। অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকে খোশ আমদেদ জানালো। তারপর উভয়ে একটি সোফায় বসে পড়লো। নাজমা বললো, তুমি আসলে আমি দারুণ আনন্দিত হই।

ফেরদাউস মৃদু হেসে বললো, বিস্মিতও তো হও, অথচ সে কথাটি বলছো না।

ঃ সত্য হলো, তুমি অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এসেছো। তাই সত্যিই বিস্মিত হয়েছি।

ঃ আমি আজ একটি বিস্ময় দূর করতে এসেছি।

ঃ বিস্ময়? কিসের বিস্ময়?

ফেরদাউস আবুবকরকে শাহজাদার পোশাকে এবং রাজকীয় শান-শওকত দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছিলো। তাই তার বিস্ময় দূর করার জন্য অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবে নাজমার নিকট ছুটে এসেছে। কিন্তু নাজমা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, কিসের বিস্ময়, ঠিক তখন সে তার ভুল অনুভব করলো। তাই নীরব হয়ে গেলো। নাজমা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, বলো কিসের বিস্ময়?

এবার ফেরদাউসের উত্তর দেয়া ছাড়া কোনো উপায় রইলো না। সে আমতা আমতা করে বললো, না তেমন কিছু নয়। অজান্তে মুখ থেকে কথাটি বেরিয়ে গেছে।

ঃ লুকিয়ো না ফেরদাউস! তোমার মুখ থেকে তোমার চোখ অধিক সত্যবাদী। তোমার চোখ বলছে, তুমি একটা কথা লুকাচ্ছো।

ঃ আমি জানতে চাচ্ছি, তোমাদের প্রাসাদের প্রহরীদের ঐ অফিসারটি কোথায়?

ঃ বলবো। তবে আগে আমাকে বলতে হবে, তুমি কেনো তাকে তালাশ করছো?

ঃ এমনিই।

ঃ অকারণে তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। শোনো ফেরদাউস! আমি তোমার বোন। তোমার সহমর্মী। আমার থেকে কোনো কথা গোপন করো না।

ফেরদাউস দ্বিধায় পড়ে গেলো। বললো, যদি সত্য বলি, তাহলে প্রেমের কথাটি বলে দিতে হবে। আর যদি মিথ্যা বলি, তা হলে এমন এক শাহজাদীর আস্থা হারিয়ে ফেলবো, যে আমাকে বোন হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।

ঃ ফেরদাউস! আমার উপর বিশ্বাস রাখো। তোমার অন্তরের গোপন কথাটি লুকিয়ো না। সেদিন যখন প্রহরীদের সেই অফিসার তোমার সাথে কথা বলছিলো, তখনই আমি বুঝেছিলাম, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে কিছু একটা আছে। আচ্ছা, তুমি তাকে কবে থেকে চেনো?

ঃ তুমি আমাকে বোন বানিয়ে নিয়েছো। তাই আমি তোমাকে আমার জীবন-কথা বলবো। ওর সাথে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ঃ চিন্তা করো না। তোমার জীবন যদি তার সাথেই জড়িয়ে থাকে, তবে আমার জীনবও তোমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে।

ঃ আচ্ছা তাহলে শোনো, এক পূর্ণিমার রাতে চারদিকে জ্যোৎস্নার প্লাবন বইছিলো। সে কী চমৎকার রাত। আমার অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো। মন চাচ্ছিলো, দজলার স্বচ্ছ পানিতে হাঁসের ন্যায় ভেসে বেড়াই। তাই বজরায় চড়ে বসলাম। দজলার পানিতে বজরাটি হাঁসের ন্যায় তর্ তর্ করে ছুটে

চললো। স্বচ্ছ পানিতে ছিলো আরেকটি আকাশ। আর সেই আকাশে আরেকটি পূর্ণিমার চাঁদ পরিদৃষ্ট হলো। উপরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ, নীচেও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ। সে এক মোহময়, যাদুময় রাত। তার সাথে আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় এসে সংযোজিত হলো। তা হলো, দজলার তীরে সারি সারি ফানুসের আলো আর পানিতে তার ঝিকিমিকি প্রতিবিম্ব। মন চাচ্ছিলো, সারা রাত পানিতে ভেসে ভেসেই কাটিয়ে দেই। কিন্তু সহসা কী যেনো হলো। মনটা আর ভালো লাগছিলো না। তাই তীরে ফিরে এলাম। বজরা থেকে নেমে যেই না আমি তীরে দাঁড়ালাম, অমনি এক ব্যক্তির দৃষ্টির সাথে আমার দৃষ্টির মিলন হলো। বুকটা ধড়ফড় করে ওঠলো। গোটা শরীরে একটি অজানা শিহরণ ছড়িয়ে পড়লো। সে আমাকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে অবলোকন করছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। দ্রুত গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আরেক দিনের ঘটনা। এক বাগিচায় আমি আমার কয়েকজন সখীর সাথে খেলছিলাম। আমি তাদের থেকে পালিয়ে ছুটে বাগিচার দরজায় পৌঁছলে এক ব্যক্তির সাথে ধাক্কা খেলাম। ফিরে দেখি, লোকটি ঐ ব্যক্তি, যার সাথে দজলার তীরে দেখা হয়েছিলো। আমি দারুণ বিস্মিত হলাম। এভাবে কয়েকবার বিস্ময়করভাবে হঠাৎ হঠাৎ আমাদের সাক্ষাত হলো। একদিন তাকে এ প্রাসাদে পেলাম। বললো, সে এই প্রাসাদের প্রহরীদের অফিসার। সে দিন সে একথাও বললো, আমি চেষ্টা করছি শীঘ্রই একটি বড় পদে উন্নীত হবো।

কিন্তু আজ যখন আমি আমার এক সঙ্গীর বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে শাহজাদাদের পোশাকে দেখতে পেলাম। তাই জানতে এলাম, সে কি সত্যই প্রহরীদের অফিসার। না, আমি আজ ভুল দেখেছি।

ঃ আমি তো আজ তাকে দেখিনি, কী বলবো সে সম্বন্ধে!

ঃ তোমাদের প্রাসাদ প্রহরীদের অফিসার কোথায়?

ঃ শুনেছি, তার পরিবর্তে অন্য এক অফিসার এসেছে আর সে অন্য পদে যোগ দিয়েছে।

ঃ কবে বিদায় নিয়েছে?

ঃ গত পরশু।

ঃ তুমি কি জানো না, সে কোথায় গেছে?

ঃ আমরা শাহজাদীরা এসব বিষয়ের কিছুই জানি না। অনেক লোকেরই চাকরি পরিবর্তন হয়। চলে যায়। অথচ আমরা জানিই না, কে এলো আর কে গেলো।

ফেরদাউস রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলো না। বললো, আমি তোমাকে আমার গোপন কথা বলে দিয়েছি। তবে আমি বিশ্বাস করি, তুমি বিষয়টি গোপনই রাখবে।

ঃ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করো, যেভাবে তোমার অন্তরে এ গোপন বিষয়টি রক্ষিত

ছিলো, ঠিক তেমনিভাবে আমার অন্তরেও তা রক্ষিত থাকবে।

ঃ শুকরিয়া। হাজার শুকরিয়া।

ঃ একটা কথা বলবে কি?

ঃ কী কথা?

ঃ সেই অফিসারের সাথে তুমি শেষ কোথায় সাক্ষাত করেছিলে?

ঃ তোমার বাগিচায়।

ঃ তুমি কি তার নাম জানো?

ঃ তিনি তার নাম হাশেম বলেছিলেন।

নাজমা মৃদু হেসে বললো, আমার ধারণা তোমার ভালোবাসা অর্জনে সে উন্নতি করার প্রচেষ্টায় রয়েছে। বিচিত্র নয়, হয়তো সে একদিন বিরাট কিছু হয়ে উপস্থিত হবে আর দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখে বিস্মিত হবে।

ঃ আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে!

ঃ কী সন্দেহ?

ঃ তুমি তাকে চেনো।

ঃ এ সন্দেহ কীভাবে হলো?

ঃ তিনি যখন বাগিচায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে চলে গিয়েছিলেন আর তুমি এসে জিজ্ঞেস করেছিলে, তখন আমি বলেছিলাম, প্রাসাদের প্রহরীদের অফিসার এসেছিলো। তুমি এ কথা শুনে মৃদু হেসেছিলে।

ঃ আমি তাকে চিনি।

ঃ যখন চেনো, তবে অবশ্যই জানো তিনি কোথায় থাকেন।

ঃ সে কি তোমাকে তার ঠিকানা বলেনি?

ঃ আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি।

ঃ আচ্ছা, তাহলে জিজ্ঞেস করে নেবে।

ঃ কার কাছে জিজ্ঞেস করবো? তিনি কোথায় থাকেন তা তো জানাই নেই।

ঃ তাহলে তুমি কি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও?

নাজমার প্রশ্নে ফেরদাউসের মুখমণ্ডলে লজ্জার রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়লো।

নাজমা বললো, তোমার লজ্জাবনত চোখ বলছে, তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও। তাহলে কি আমি তাকে ডেকে আনবো?

হঠাৎ ফেরদাউসের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, কখন?

নাজমা বললো, আগামীকাল, না এখনই?

ফেরদাউস বিষয়টি বুঝে লজ্জায় এতোটুকু হয়ে গেলো। আর নাজমাও নীরব রইলো। এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা হলো না।

আঠারো.

আগুন! আগুন!

এক ভয়ার্ত আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক থেকে লোকেরা এলো। সবার মুখে একই আওয়াজ, একরই রব– আগুন! আগুন! কার্‌খ মহল্লার এক বাড়িতে আগুন লেগেছে। এ মহল্লাটি শিয়া অধ্যুষিত।

সকাল বেলা। অনেকেই বিছানা ছেড়ে এখনো বাইরে বেরোয়নি। দাউ দাউ করে বাড়ির চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আর বাড়ির মালিক চিৎকার করে বলছে, সুন্নীরা এ কী করলো! আমার বাড়িতে কেনো আগুন দিলো! হায়, হায়! তারা বুঝি আমাকে আর বাগদাদে থাকতে দেবে না!

এক বর্ষীয়ান শিয়া। নাম আবু জাফর। সে বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলো। তারপর বাড়ির মালিক বখতিয়ারকে ডেকে বললো, আরে ভাই! অমন কথা বলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করতে চাচ্ছেন কেনো?

বখতিয়ার তার কথা শুনেই হাউ-মাউ করে ওঠলো। হায়! হায়! সুন্নীরা আমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি কি তা বলতেও পারবো না? কেনো আগুন দিয়েছে, তা তো প্রকাশ পাবেই। কিন্তু কীভাবে দেয়া হয়েছে, তা তো আমি জানি। কয়েকজন শিয়া যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা ক্ষেপে গেলো। তাদের একজন চিৎকার করে ওঠলো। বললো, সুন্নীরা আমাদের ঘরে আগুন দেবে আর দোষ চাপাবে শিয়াদের উপর! আশ্চর্য! এটা আবার কোন্ ইনসাফের কথা।

এক যুবক গর্জে উঠলো। বললো, সুন্নীদের অত্যাচার সীমালংঘন করেছে। তারা এখন আমাদের ঘর-বাড়িতেও আগুন দিচ্ছে। আমরা কি সংখ্যায় কম? শক্তিতে কম? তারা আমাদের মহল্লায় আগুন দিয়েছে। আমরাও তাদের মহল্লা জ্বালিয়ে দেবো।

মধ্য বয়সী এক্ক শিয়া বললো, আরে, তোমরা তো দেখছি দাঙ্গা বাঁধাবে। এতো সাত সকালে এখানে সুন্নীরা এলো কোত্থেকে? আর এলোই বা কীভাবে? এখনো তো আমাদের মহল্লার ফকটই খোলা হয়নি!

বখতিয়ার বললো, আচ্ছা তাহলে কি ফেরেস্তা আগুন লাগালো?

আবু জাফর বললো, আমার কথা শোনো।

কয়েকজন যুবক বললো, তুমি সুন্নীদের পক্ষে কথা বলছো, সুন্নীদের সাথে তোমার সম্পর্ক। তোমার কথা শুনবো না।

এক যুবক বললো, যারা সুন্নীদের পক্ষ নেয়, তাদের উপর লানত।

আবু জাফর বললো, তোমরা দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাচ্ছো। কিন্তু তার পরিণতি ভালো হবে না।

এক যুবক বললো, ভাইয়েরা! আমাদের বর্ষীয়ান লোকটি দারুণ ভীতু। সুন্নীরা আমাদের বাড়িতে আগুন দিলো আর ইনি সুন্নীদের সাফাই গাইছেন!

এর মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে গেলো। চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। সবার কণ্ঠে একই কথা। যারা আমাদের ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়েছে, আমরাও তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন দেবো। সুন্নীদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো।

এক ব্যক্তি বললো, আরে ভাই! আগে আগুন নেভাও। তারপর দেখবো কী করা যায়।

বখতিয়ার বললো, আগুন কি আর এখন কিছু বাকি রেখেছে? যা জ্বালানোর ছিলো সব জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে।

ঠিক তখনই সেখানে শফীক এসে উপস্থিত হলো। বললো, কী হলো? এখানে আগুন এলো কোথা থেকে? কে আগুন লাগালো?

বখতিয়ার বললো, সুন্নীরা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।

শফীক বললো, আমি জানতাম, সুন্নীরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। তারা আমাদের বাগদাদ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি। কিন্তু বর্ষিয়ানরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। এখন যেনো তারা সচক্ষে দেখে, এগুলো কী হচ্ছে? এরপরও কি সুন্নীদের শত্রুতার ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে? শফীক অগ্নিঝরা কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে শুরু করে–

'ভাইয়েরা আমার! যাদের পূর্বসূরীরা চক্রান্ত করে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে, আমীর আলাইহিস সালাম ও তার পরিবারের লোকদের নিমর্মভাবে হত্যা করেছে, তারা কি আহ্লে বাইতের প্রেমিকদের নির্যাতন করবে না? নিপীড়ন করবে না? আসল কথা হলো, তারা আমাদেরও ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু আমাদের নেতৃস্থানীয় বর্ষীয়ানরা স্বপ্নের জগতে বিরাজমান। এখনো তাদের চোখ খুলছে না। এখনো তারা এ সরল কথাটি বোঝে না। সুতরাং তাদের কথা আর শোনা যাবে না। যদি এর প্রতিকার করতে না পারো, তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইটের উত্তর পাথর ছুঁড়ে দিতে হবে। তারা তোমাদের একটি বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তোমরা তাদের একাধিক বাড়ি ধ্বংস করে দাও, মাটির সাথে মিশিয়ে দাও।'

চারদিক থেকে আওয়াজ উঠলো, আগুন দাও, আগুন দাও, সুন্নীদের বাড়িতে আগুন দাও। উপস্থিত জনতার মাঝে তখন টানটান উত্তেজনা। তখন বর্ষীয়ান কিছু লোক অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। আবু জাফরও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে বলছিলো, আমি যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন এ বাড়ির ভেতরে আগুন লাগছিলো। তারপর দেখলাম, মুহূর্তে আগুন ছাদে চলে গেলো।

একজন বললো, বাড়িটি তো চারিদিক থেকেই মজবুতভাবে বেষ্টিত। তাছাড়া কাঠের তৈরি হলে এতো দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হতো। কিন্তু তাতো নয়।

আরেকজন বললো, ঠিক কথা বলেছেন। নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু নওজোয়ানরা তো আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা কিছুই বুঝতে চাচ্ছে না।

আবু জাফর বললো, বরং তাদের উত্তেজিত করা হচ্ছে।

তাদের পাশেই কয়েকটি বালক দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের একজন বললো, রাতে না আব্বু বলেছিলেন, সকালে আমাদের ঘর পুড়ে যাবে। তারপর আমরা একটি সুন্দর ইয়া বড় বাড়িতে থাকবো।

সবাই বালকটির দিকে ফিরে তাকালো। আবু জাফর তাকে জিজ্ঞেস করলো, খোকা তোমার নাম কী?

বালক বললো, মুহাম্মদ কাসেম।

আবু জাফর বললো, তোমার আব্বুর নাম কী?

কাসেম বললো, বখতিয়ার।

আবু জাফর বললো, আচ্ছা খোকা, আগুন কে লাগিয়েছে?

কাসেম বললো, আব্বু প্রথমে ছাদে তেল ছিটিয়ে দিয়েছেন। তারপর আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন।

বর্ষীয়ানরা সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। ইতিমধ্যে ইবনে আলকামী এসে উপস্থিত হলেন। তার সাথে একদল আশ্বারোহী সৈনিক। তাকে দেখেই বখতিয়ার মাথায় ধূলি মাখাতে মাখাতে আর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এসে বললো, হুজুর! হুজুর! ওরা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

ইবনে আলকামী বললেন, থামো; কী হয়েছে আগে বলো।

বখতিয়ার বললো, দেখুন হুজুর, সুন্নীরা আমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে।

ইবনে আলকামী বললেন, এটা কী তোমার বাড়ি?

বখতিয়ার বললো, হ্যাঁ, হুজুর, এই কপাল পোড়ার বাড়ি।

ইবনে আলকামী এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেললেন। দেখলেন অদূরেই কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতৃস্থানীয় শিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে কয়েকজন এমনও ছিলো, যাদের সে প্রাসাদে নিয়ে সুন্নীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছিলো। এবার তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে বললেন, তোমাদের বলিনি যে, সুন্নীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা সবেমাত্র আক্রমণ শুরু করেছে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তারা শিয়াদের বাগদাদে থাকতে দেবে না। এখন তো তাদের দুঃসাহস দেখলে। তারা তোমাদের ঘরে পর্যন্ত আগুন দিয়েছে।

আবু জাফর বললো, যদি তদন্ত করেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন, আগুন কীভাবে লেগেছে, কারা আগুন লাগিয়েছে।

ইবনে আলকামীর কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, এখনো আপনাদের সন্দেহ দূর হলো না?

এক বর্ষীয়ান বললো, এমন সময় আগুন লেগেছে, যখন মহল্লার ফকটও খোলা হয়নি। তাহলে সুন্নীরা এলো কীভাবে? আর আগুন লাগিয়ে তারা গেলো কোথায়?

ইবনে আলকামী বললেন, এটা কোনো কথা নয়। হতে পারে রাতে কোনো সুন্নী লুকিয়ে ছিলো বা কোনো প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে সকালেই প্রবেশ করেছে।

আরেকজন বললো, এসব কিছুই সম্ভব। কিন্তু দেখেছেন তো, কেমন মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটি। বাইরে থেকে আগুন লাগানো একেবারেই অসম্ভব।

ইবনে আলকামী বললেন, হতে পারে তেল ছিটিয়ে তাতে আগুন লাগানো হয়েছে।

অপর একজন বললো, যদি তেল ছিটিয়ে আগুন লাগানো হতো, তাহলে আগে তেল দেয়ালে ছিটে পড়তো এবং প্রথমেই আগুন দেয়ালে লাগতো। কিন্তু দেয়ালে তো কোনো আগুন নেই। শুধুমাত্র ছাদটি জ্বলছে।

ইবনে আলকামী ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তাহলে কি বলতে চাচ্ছো, গৃহকর্তা নিজেই নিজের বাড়িতে আগুন দিয়েছে?

আবু জাফর বললো, ব্যাপারটি এমনই মনে হয়।

ইবনে আলকামী রাগে লাল হয়ে বললেন, মনে হয় তোমরা সুন্নীদের ভয় পাও কিংবা তাদের থেকে ঘুষ খেয়েছো। তাই অন্ধের মত তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো।

আবু জাফর সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এবার সেও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। বললো, আমরা সুন্নীদের নয়– আল্লাহকে ভয় করি। বাগদাদে কিছু দাঙ্গাবাজ লোক শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায়। আমরা তাদের...।

ইবনে আলকামী কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, হ্যাঁ, আমি তো একথাই বলছি যে, সুন্নীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে উঠে-পড়ে লেগেছে।

আবু জাফর বললো, ব্যাপারটি আসলে এমন নয়। সুন্নীদের মাঝেও দাঙ্গাবাজ আছে বটে; কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু যুবকই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এর প্রমাণ আপনার সামনে পেশ করছি। এ বাড়িটি বখতিয়ারের আর এই বালকটি বখতিয়ারের পুত্র। শুনুন সে কী বলে।

উপস্থিত সবাই নীরব হয়ে গেলো। সবার চোখে-মুখে কৌতূহল। বখতিয়ারও কাসেমের দিকে তাকালো। আবু জাফর বললো, খোকা! তোমার আব্বু রাতে কি বলেছিলেন?

কাসেম বললো, আব্বু বলেছিলেন, সকালে আমাদের ঘর পুড়ে যাবে। তারপর আমরা একটি সুন্দর ইয়া বড় বাড়িতে থাকবো।

আবু জাফর বললো, আচ্ছা খোকা! আগুন কে লাগিয়েছে?

কাসেম বললো, আব্বু লাগিয়েছেন। প্রথমে ছাদে তেল ছিটিয়ে দিয়েছেন। তারপর আগুন লাগিয়েছেন।

সমবেত জনতা– যারা উত্তেজনায় টগবগ করছিলো– বালকের কথায় বখতিয়ারের উপর ক্ষেপে গেলো। ইবনে আলকামীও দারুণ লজ্জিত হলেন। কিন্তু ধুরন্ধর শফীক চিৎকার করে বললো, না, এটা মিথ্যা কথা। বালকটিকে একথা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঠিক তখনই হাসান আসাদ এসে উপস্থিত হলো। সে শফীককে বললো, শোনো হে সন্ত্রাসী যুবক! এটা তোমারই কাজ। তুমিই বখতিয়ারকে তার বাড়িতে আগুন দিতে প্ররোচিত করেছো।

শফীক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাসান আসাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। কিন্তু হাসান আসাদ বুজুর্গ মানুষ। শিয়ারা তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, সম্মান করে। তাই শফীকের আচরণে অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে শফীককে ঘিরে ধরলো। মারতে উদ্যত হলো। ইবনে আলকামী বহু কষ্টে লোকদের শান্ত করলেন। এভাবেই একটি গভীর ষড়যন্ত্র সূচনাতেই নস্যাৎ হয়ে গেলো।

ঊনিশ.

নাজমা ফেরদাউসকে সে দিন আর ফিরে যেতে দিলো না। এক দাসির মাধ্যমে বাড়িতে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়, দু-তিন দিন পর ফেরদাউস বাড়িতে আসবে। নাজমা ফেরদাউসকে প্রতিশ্রুতি দিলো, সে আগামী কাল হাশেমকে ডেকে আনবে। আবুবকর ফেরদাউসের নিকট নিজেকে হাশেম নামেই পরিচয় দিয়েছিলো। তাই ফেরদাউস তাকে হাশেম নামেই চিনতো। নাজমার এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফেরদাউসের মনে আনন্দের জোয়ার জেগে ওঠলো। সময় যেনো গতি হারিয়ে স্থির হয়ে আছে। সেই কখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তমিত হবে। কখন রাত অতিক্রান্ত হবে। তারপর আসবে প্রতিশ্রুতির সময়। মনটা তার ভীষণ অস্থির-চঞ্চল হয়ে ওঠলো। ফেরদাউস স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে অবশ্যই হাশেমকে জিজ্ঞেস করবে, সে কি খেলাফতের কোনো উচ্চপদ অলংকৃত করেছে? কেনো সে শাহজাদাদের পোশাক পরেছে? এর রহস্য কী?

দুপুরে হাজেরা এলো। নাজমা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। ফেরদাউস ইতিপূর্বে তাকে দেখেনি। তাই সে ধারণা করছে, হয়তো কোনো শাহজাদী হবে।

কারণ, তার গায়ে শাহজাদীদের মতোই ঝলমলে মূল্যবান পোশাক। তদুপরি তার চাল-চলন, কথা-বার্তা মার্জিত ও হৃদয়গ্রাহী।

নাজমা ফেরদাউসকে বললো, ইনি হলেন উজীরে আজমের কন্যা হাজেরা। আর হাজেরাকে লক্ষ্য করে বললো, ইনি আমার সখী ফেরদাউস।

ফেরদাউস বললো, আমি অনেকের মুখে উজীরে আজমের কন্যার প্রশংসা শুনেছি। তাকে দেখার ও তার সাক্ষাতের তামান্নাও অন্তরে ছিলো। আল্লাহর শুকরিয়া, আজ উভয়টিই বাস্তবায়িত হলো।

নাজমা হেসে বললো, তুমিও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছো!

ফেরদাউস বললো, তার সৌন্দর্য ও কোমল-মার্জিত স্বভাব-চরিত্রের প্রশংসা শুনেছি।

হাজেরা বললো, আমি কেমন তাতো তোমরা দেখছো। কিন্তু বোন ফেরদউস তো সাক্ষাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।

ফেরদাউস বললো, আমি যে কেমন তাতো তোমরাও দেখছো। কিন্তু সুন্দরী বলতে যা বুঝায়, তা তো তুমি এবং বোন নাজমা।

ফেরদাউসের কথায় উভয়ে হেসে ফেললো। নাজমা বললো, আমরা হয়তো সুন্দরী ঠিক, কিন্তু তুমি তো সাক্ষাৎ পরী।

হাজেরা বললো, ভুল বলছো। হূর থাকলে তোমরা দু'জনই আছো।

ফেরদাউস বললো, আরে না, না, বরং হূরের চেয়ে বড়ো কিছু থাকলে বলো।

হাজেরা বললো, কোনো সন্দেহ নেই যে, তুমি হূরের চেয়েও বড়। হূরকে তো কেউ কখনো দেখেনি। শুধু কুরআন ও হাদীসে তাদের আলোচনা শুনেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমরা অনুমান করতে পেরেছি, হূর কেমন হবে। যদিও হূরের সৌন্দর্য-লালিত্য অনুমান করাও অসম্ভব।

কারো আগমন পদধ্বনি শুনতেই তারা চকিতে ফিরে তাকালো। দেখলো, আহমদ আবুল কাসেম আসছে। তাকে দেখেই হাজেরার চেহারায় হাল্কা রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়লো।

নাজমা বললো, ভাইজান আসছেন।

আহমদ এগিয়ে এসে বললো, নাজমা, দেখছি আজ তোমার কয়েকজন সখী এসেছে।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমার আগমনে তোমাদের ক্ষতি হয়নি তো?

ঃ কিসের ক্ষতি হবে?

ঃ হাজেরার অপছন্দ হয়নি তো?

হাজেরা বললো, আমার কেনো অপছন্দ হবে? হৃষ্টচিত্তে আনন্দের সাথে আসুন।

নাজমা মৃদু হেসে বললো, আমি তো এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবো যে, তার অপছন্দের কিছুই নেই। বরং সে আনন্দিত ও গর্বিত।

হাজেরা লজ্জিত হলো। ঠিক তখন আহমার এলো। আহমদ বললো, আরেকজন হতভাগ্য মেহমান এসে উপস্থিত হয়েছে।

হাজেরা হেসে বললো, আরে তোমার জন্য তো অপেক্ষা করা হচ্ছিলো।

আহমার বললো, কে অপেক্ষা করছিলো?

হাজেরা বললো, কেনো, নাজমা ছাড়া আর কে?

নাজমা বললো, মিথ্যা বলছো কেনো?

আহমার বললো, কেউ আমার অপেক্ষা করবে কেনো? তারপর ফেরদাউসের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, হাজেরা, এ কি তোমার সখী?

হাজেরা বললো, হ্যাঁ। আজই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে আর আজই সে আমার সখী হয়ে গেছে। না, না সখী নয়, বোন হয়ে গেছে। সে নাজমার পুরাতন সখী।

নাজমা বললো, হ্যাঁ, তার নাম ফেরদাউস। ইয়াকুব জমিদারের মেয়ে, আমার সখী।

আহমার বললো, আমি জানতাম না, তোমার সখীরা এসেছে। নইলে এখানে আসতাম না।

নাজমা বললো, বেশ, এসেই যখন পড়েছো, বসে পড়ো।

আহমার ও আহমদ আবুল কাসেম একটি সোফায় বসলো। তারপর তিন সখী মিলে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো, যেনো তারা আহমার ও আহমদের কথা ভুলেই গেছে। সে যুগে মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতো। তারা একাকি ঘরে-বাইরে চলাফেরা ও যাতায়াত করতো।

আহমদ আহমারকে বললো, ভাই! আমরা তো এখানে বেকার বসে আছি।

ঃ আমিও তো এই একই কথা ভাবছি।

ঃ তাহলে কী করতে চাও?

ঃ আমি তো এখন কুরআন তিলাওয়াত শুরু করছি।

ঃ কুরআন তিলাওয়াতের উত্তম সময় সকাল বেলা। একথা আল্লাহ তাআলাই কুরআনে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

"সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করো। নিশ্চয় ফজরের সময়কার কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।"

নাজমা বললো, মোল্লাজি কি নারাজ হয়ে গেছে?

আহমার বললো, অসন্তোষের কোনো কথা নয়। আমি ভাবলাম, তোমরা কথাবার্তায় লিপ্ত আছো, সেই সুযোগে আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি।

হাজেরা মুচকি হেসে বললো, আপনার চিন্তা তো বেশ ভালো। কিন্তু তিলাওয়াতের উপযুক্ত স্থান হলো মসজিদ।

হাজেরার কথায় তিনজনই হেসে ফেললো।

আহমার বললো, আমি তো মনে করি, যেখানে সেজদা করা হয়, সেটাই মসজিদ।

আহমদ বললো, না ভাই! এটা হতে পারে না। সেজদা করার জায়গাই যদি মসজিদ হয়, তাহলে তো দুনিয়ার সকল স্থানই মসজিদ হয়ে যাবে।

আহমার বললো, তাহলে চলো বাগিচায় গিয়ে ঘুরে আসি।

হাজেরা বললো, আপনি এখান থেকে পালাতে চাচ্ছেন কেনো?

আহমার বললো, পালাতে তো চাচ্ছি না, বরং তোমাদের স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছি।

নাজমা বললো, আচ্ছা ভাই! কথা বন্ধ করে দাও।

হাজেরা মৃদু হেসে অস্ফুটকণ্ঠে বললো, ভালোবাসা বলছে, আহমার অসন্তুষ্ট হবে এটা মেনে নেয়া যায় না। একথা বলেই সে ফেরদাউসের সাথে হাসতে লাগলো। আহমদ ও আহমার বুঝতে পারলো না, তারা কেনো হাসছে। তাই তারা তাদের ফুলের মতো চেহারার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলো।

আহমদ বললো, নাজমা! গায়িকা-দাসিদের ডেকে আনো। কিছু সময় গান শোনা যাক।

নাজমা আড় নয়নে আহমারকে দেখে বললো, মোল্লাজি থেকে আগে অনুমতি নাও।

আহমদ হেসে বললো, ভাই মোল্লাজি! অনুমতি দিয়ে দাও।

আহমার বললো, আমার অনুমতির কী প্রয়োজন আছে। আনন্দ-বিনোদনের ইচ্ছা যখন করেছো, করো।

আহমদ বললো, অনুমতি মিলেছে, যাও গায়িকাদের নিয়ে এসো।

হাজেরা বললো, এখানেই কী অনুষ্ঠান হবে?

নাজমা বললো, আচ্ছা বাগিচায় চলো।

আহমদ বললো, চিন্তা করে দেখো অনুষ্ঠানটি নহবতখানায় হলে কেমন হয়? সাথে সাথে নাচও হবে।

নাজমা বললো, তোমার ইচ্ছে।

সবাই উঠে বাগিচায় গেলো। কোমল উজ্জ্বল কার্পেটে সবাই বসে পড়লো। দাসিরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। সুরের তালে তালে গান শুরু হলো। এক দাসি জনৈক কবির এক গান শুরু করলো। কবি তাতে তার প্রেয়সীর

আপাদমস্তক বিবরণ তুলে ধরেছে। এরপর অন্য এক দাসি আরেকটি গান শুরু করলো। এভাবে একের পর এক গান হতে লাগলো। সুরের তালে তালে তারা যেনো ভাসতে ভাসতে অন্যলোকে গিয়ে পৌঁছলো। দাসিদের গান শেষ হলে নাজমা বললো, এখন সমবেত কণ্ঠে একটি সঙ্গীত পরিবেশন হোক।

সহসা আহমদ বলে উঠলো, না, না এবার তোমরা তিনজন সমবেত কণ্ঠে গান গাইবে।

নাজমা হাজেরাকে বললো, বলো, তোমার মতামত কী?

হাজেরা বললো, আমি প্রস্তুত। তবে ফেরদাউসকে একটু জিজ্ঞেস করে নাও।

ফেরদাউস বললো, তোমরা দু'জনে যখন প্রস্তুত আছো, তখন আমার আর দ্বি-মতের অবকাশ কই!

আবার বাদ্যযন্ত্রে সুর উঠলো। মোহনীয় সুর। মনকাড়া, পাগলকরা সুর। সুরের তালে তালে কোরাস কণ্ঠে তারা গান গাইতে লাগলো। সে এক যাদুময়, এক মধুময় মুহূর্ত। সুর মুর্ছনায় বাতাস যেনো স্থির হয়ে গেছে। বাগিচার গাছপালা আর পুষ্পলতিকাগুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে। আহমদ ও আহমার মোহাচ্ছন্ন, আত্মহারা। সুরের জগতে হাবুডুবু খেতে খেতে অন্যলোকে যেনো হারিয়ে গেলো তারা।

গান শেষ হলো। কিন্তু এখনো সেই সুরের মূর্ছনার যাদুময় রেশ কর্ণকুহরে লেগেই রইলো। আহমদ 'শাবাশ, শাবাশ, বেশ চমৎকার' বলে চিৎকার করে ওঠলো। নাজমা তাকে সবার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

আহমদ বললো, তাহলে এবার নাচও শুরু হয়ে যাক।

সবার শুরুতে নাজমা এগিয়ে এসে নাচতে শুরু করলো। সুরের তালে তালে নুপূর ঝংকারে, অপূর্ব অঙ্গ-ভঙ্গিতে নেচে চললো। আহমার বিস্ময়ভরা চোখে বিমোহিত হৃদয়ে দেখতে লাগলো।

নাজমার পর হাজেরা এলো। নাচতে শুরু করলো। মোহময় গান আর নাচে সবাইকে মাতিয়ে তুললো। আহমদ বিস্ময়ভরা চোখে, বিস্ফারিত নয়নে তাকে দেখতে লাগলো।

হাজেরার পর সসঙ্কোচে ফেরদাউস উঠে এলো। নাচ শুরু করলো। সুর মূর্ছনায়, নাচের উচ্ছ্বলতায় বেশ কিছুক্ষণ তারা বিমোহিত ও বিমুগ্ধ হয়ে রইলো।

সে ছিলো এক অধঃপতনের যুগ। মুসলিম সমাজ তখন ইসলামী বিধি-বিধান ভুলে ইন্দ্রীয় পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। শরীফ-সম্ভ্রান্ত, আমীর-উজীর আর নেতৃস্থানীয় ঘরের মেয়েরা, নাচ-গানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। ইবাদত-বন্দেগী ভুলে নাচ-গান আর আনন্দ-বিনোদনে তারা বিভোর হয়ে থাকতো। ফেরদাউসের নাচ শেষ হলে তাদের উল্লাস-বিনোদন আজকের মতো শেষ হলো।

বিশ.

ফেরদাউস সে দিনটি বেশ কষ্টেই কাটালো। সন্ধ্যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত সূর্যটি তার আলো গুটিয়ে অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে শাহী প্রাসাদের চারদিকে অসংখ্য ঝাড়-বাতি জ্বলে ওঠলো। আবার আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠলো। রাতের শাহী প্রাসাদ দিনের শাহী প্রাসাদের চেয়ে অনেক চমৎকার। একেবারে ভিন্ন। ফেরদাউসের মনে আনন্দের কোমল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। হঠাৎ একখণ্ড চিন্তার মেঘ এসে জড়ো হলো তার মনের আকাশে। হাশেমকে শাহজাদী নাজমা চেনে। সে তাকে ডেকে আনবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তাহলে নিশ্চয় তিনি বড় কোনো ব্যক্তি হবেন। তাহলে তিনি কে? অবশ্যই তাকে তা জিজ্ঞেস করতে হবে।

ফেরদাউস বসে বসে নানা চিন্তা করছিলো। ঝাঁড়ের আলোয় তার চেহারা ঝলমল করছে। আয়তলোচনে রাশি রাশি বিস্ময় খেলা করছে। ইতিমধ্যে নাজমা এসে বললো, নিরালায় বসে বসে কী চিন্তা করছো ফেরদাউস?

যদিও ফেরদাউস চিন্তায় ডুবে ছিলো; কিন্তু নাজমার সামনে তা প্রকাশ করতে চাইলো না। বললো, কিছু না। আচ্ছা, বলো তো আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় পালিয়েছিলে? আমি কতোক্ষণ যাবত তোমার অপেক্ষা করছি!

নাজমা হেসে বললো, ইয়া আল্লাহ! মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে তোমার নিকট থেকে গেলাম। তুমি বলছো, আমার জন্য অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছো। আচ্ছা ফেরদাউস! সত্যি করে বলো তো তুমি কী চিন্তা করছিলে?

ফেরদাউস বললো, তুমি হাশেম সাহেবকে কতোটুকু চেনো, তা চিন্তা করছিলাম।

নাজমা বললো, এ চিন্তার কী প্রয়োজন আছে?

ফেরদাউস বললো, প্রয়োজন তেমন কিছু না, তবে এমনিই বসে বসে ভাবছিলাম।

নাজমা বললো, চলো, খাবার খেয়ে আসি।

উভয়ে খানা খেতে চলে গেলো। আহারের পর আবার মনমাতানো গান ও নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হলো। অর্ধরাত পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চললো। অনুষ্ঠান শেষে নাজমা ফেরদাউসকে রাতের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো এবং উভয়ে শয়নকক্ষে চলে গেলো। দু'জন দাসি এসে ফেরদাউসের কাপড় বদল করে সাদা ধবধবে নাইটড্রেস পরিয়ে দিলো। সাদা নাইটড্রেসে ফেরদাউসকে ঝলমলে চাঁদির মূর্তির ন্যায় মনে হচ্ছে। তারপর শুয়ে পড়লো।

সকালে পূর্ব আকাশে সূর্যের উদয় হলো। কোমল উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। বেশ বেলা গড়িয়ে গেলো। কামরার বাইরে অপেক্ষমান দাসিরা বিরক্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করলো এবং বিনীত কণ্ঠে বললো, গোসলখানায় গোছলের সকল আয়োজন প্রস্তুত।

হাই নিতে নিতে ফেরদাউস বিছানা ছাড়লো এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে গোসলখানায় প্রবেশ করলো। ফেরদাউস হাত-মুখ ধৌত করে মুখে সুরভিত প্রসাধন ব্যবহার করলো। অপরূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত হলো। দাসিরা কাপড় পাল্টে দিলো। সে যখন গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলো, তখন তাকে পূর্ণিমার ঝলমলে চাঁদ মনে হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে নাজমাও সুসজ্জিত হয়ে এসেছে। উভয়ে নাস্তা করলো। তারপর পায়চারি করতে বাগিচায় চলে গেলো। প্রভাত বিহারের উপযুক্ত সময় সূর্য উঠার পূর্ব ও পর মুহূর্তগুলো। সে সময়ের বাতাস অত্যন্ত প্রাণ-প্রাচুর্যময়, শীতল ও কোমল থাকে। তাছাড়া বিন্দু বিন্দু অজস্র শ্বেত-শুভ্র শিশির কণা তখন পুষ্প-পল্লবে, সবুজ ঘাসের ডগায় ছড়িয়ে থাকে। আর সূর্যের আলো তাতে রঙের বাহার সৃষ্টি করে দর্শককে বিমোহিত-বিস্মিত করে তোলে। অন্তরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়, চোখকে করে তোলে প্রশান্ত-পরিতৃপ্ত।

উভয়ে বাগিচায় মনের আনন্দেই পায়চারি করছে। এদিকে সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় শিশির কণাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। প্রভাতেই সেই কোমর শীতল স্নিগ্ধময় পরিবেশ পাল্টে গেলো। তাছাড়া রাত্রি জাগরণের কারণে শরীরের কোষে কোষে যেনো এক নিস্তেজ, অবসাদ ও নিরানন্দ অবস্থা বিরাজ করছে। আর দেরি না করে তারা শাহী প্রাসাদে ফিরে এলো। ফেরদাউসের মনে বারংবার একটি প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিলো। নাজমা হাশেম সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছে, নাকি এখনো তার কোনো ব্যবস্থা করেনি! কিন্তু এক অদৃশ্য লজ্জার হাত তাকে এ কথা বারংবার জিজ্ঞেস করতে বারণ করছে। কয়েকবার সে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে নাজমার দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই লজ্জায় দৃষ্টি অবনত করে ফেলেছে।

ফেরদাউসের দৃষ্টির হাবভাবে নাজমা সবকিছু বুঝে ফেললো। তবুও না বুঝার ভান ধরে বললো, ফেরদাউস! তুমি আমাকে কী যেনো জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছো!

ফেরদাউসের লজ্জা প্রগাঢ় আকার ধারণ করলো। সে মাথানত করে ফেললো। নাজমা বললো, বোন ফেরদাউস! বলো না কী বলবে?

লজ্জাভরা দৃষ্টি তুলে ফেরদাউস বললো, তোমার কি প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে?

ঃ হ্যাঁ, মনে আছে। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে আসবে। আচ্ছা ফেরদাউস, তুমি কি আমার একটি কথা রাখবে?

ঃ অবশ্যই রাখবো, বলো।

ঃ তোমার হাশেম সাহেব কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষ নয়। অনেক উঁচু বংশের লোক। একদিন অবশ্যই তুমি তা অবহিত হবে। তবে এখনই তার বংশ সম্পর্কে জানার কোনো চেষ্টা করবে না।

ঃ কিন্তু আমি তো এটাই জানতে চাচ্ছি, তিনি কে? কী তার পরিচয়?

ঃ এ জন্যই আমি তোমাকে সতর্ক করে দিলাম।

ঃ তাহলে তো আজকের এই সাক্ষাত অর্থহীন।

ঃ না, তা হবে কেনো? সাক্ষাত করে নাও। তবে তার গোপন বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করো না।

ঃ তাহলে তুমি তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানো।

ঃ আমি তাকে তোমার চে' বেশি জানি। শাহী খান্দানের সবাই তাকে সম্মান করে। কিন্তু তাতে বিস্ময়ের বা পেরেশান হওয়ার কিছুই নেই। তিনি অত্যন্ত সভ্য-ভদ্র এবং উঁচু খান্দানের ছেলে।

ঠিক তখন কয়েকজন দাসি এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। নাজমা জিজ্ঞেস করলো, কী খবর?

এক দাসি বিনীত কণ্ঠে বললো, হাশেম সাহেব এসেছেন।

নাজমা বললো, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

দাসিরা চলে গেলে মিটি মিটি হেসে নাজমা ফেরদাউসকে বললো, আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। তিনি এসে গেছেন। তোমরা কথা বলো, আমি চললাম।

ফেরদাউস হাশেমের সাথে একাকি সাক্ষাতের আকাংখাই পোষণ করছিলো। সে কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে নাজমার দিকে তাকিয়ে রইলো। নাজমা পর্দা তুলে অন্য কামরায় চলে গেলো। নাজমার প্রস্থানের ক্ষণিক পরেই শাহজাদা আবুবকর– নাজমা যাকে হাশেম নামে চেনে– আমীরদের পোশাক পরে কামরায় প্রবেশ করলো।

ফেরদাউস দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে চাইলো। কিন্তু রূপের অহংকার তাকে প্রবলভাবে বাঁধা দিলো। ফেরদাউস আড় নয়নে তার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকে দেখে স্থির হয়ে বসে রইলো।

আবুবকর বললো, সৌন্দর্যের প্রতিমার খেদমতে সালাম নিবেদন করছি।

ফেরদাউসের ওষ্ঠাধরে এক মোহনীয় মৃদু হাসির ঢেউ খেলে গেলো। আনন্দে ভরে ওঠলো তার হৃদয়। বললো, সালাম কবুল হয়েছে।

আবুবকর বললো, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য।

ফেরদাউস বললো, বসুন।

আবুবকর 'শুকরিয়া' বলে ফেরদাউসের সামনের সোফায় বসে পড়লো।

ফেরদাউস বললো, গতকাল আপনি শাহী গাড়িতে চড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

আবুবকর বললো, আমি শহর প্রদক্ষিণ করছিলাম। ফেরদাউস! আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি উন্নতি করতে থাকবো। হ্যাঁ, উন্নতি করতে করতে আমি নগর কোতয়ালের অফিসার হয়েছি। আর এ পদের কারণেই এখন শাহাজাদাদের

পোশাক পরতে হয়। তাই আমি শাহজাদাদের পোশাক পরে শহর প্রদক্ষিণ করতে বের হয়েছিলাম।

ঃ আপনার এই জবাবে আমি প্রবোধ পাচ্ছি না।

ঃ তাহলে কি তুমি অন্য কিছু জানতে চাচ্ছো?

ফেরদাউস অত্যন্ত অসর্তকতার সাথে বলে ফেললো- হ্যাঁ।

ঃ বেশ, জিজ্ঞেস করো।

ঃ আমি জানতে চাই, আপনি কে?

ঃ আমি তোমার প্রশান্তির জন্য শুধু এতোটুকু বলবো, আমি অনেক উঁচু বংশের সন্তান।

ঃ আপনার বাড়ি কোথায়?

ঃ আমি একদিন তোমাকে অবশ্যই আমার বাড়ি দেখাবো।

ঃ আমার সন্দেহ হয়, আপনি শাহী খান্দানের কেউ হবেন।

ঃ এ ধারণাকে শক্তিশালী করো না। তবে এটাই ধারণা করো যে, কোথায় শাহী খান্দান আর কোথায় আমি। তবে আমার বংশ এমন যে, শাহী খান্দানের লোকেরা চেনে। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ঃ বলুন।

ঃ যদি আমি শাহী খান্দানের কেউ হতাম, তাহলে কি তুমি আমাকে অপছন্দ করতে?

ফেরদাউস নীরব রইলো।

ঃ নীরব রইলে কেনো? উত্তর দাও।

ঃ না।

ঃ হে বাগদাদের পরী! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার ভালোবাসার উষ্ণতা আমার শিরায় শিরায় বহমান। তোমাকে একটি কথা বলি, যদি তুমি কোনোদিন আমার থেকে বিমুখ হও, তাহলে সেদিনই হবে আমার জীবনের শেষ দিন।

ঃ না, না, অমন কথা বলবেন না।

ঃ এখন বলবো না। তবে একটি কথা জানার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্ করছে।

ফেরদাউস আড় নয়নে মৃদু হেসে বললো, কী কথা?

ঃ তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো?

ঃ না।

একথা বলেই লজ্জায় ফেরদাউসের গন্ডদেশ লাল হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে কারো আগমনের পদধ্বনি শোনা গেলো। আবুবকর সালাম দিয়ে বের হয়ে গেলো।

একুশ.

শফিক ও তার ইয়ার-বন্ধুরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দৃষ্টি করতে প্রস্তুত। কয়েকবার তার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই কী থেকে যেনো কী হয়ে যায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হতে হতে শেষে কিছুই হয় না। পরিণামে লজ্জিত হতে হয়।

ইবনে আলকামী চাচ্ছেন, সত্বর যেনো কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। কিন্তু শান্তিপ্রিয় লোকদের কারণে তার পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না। অথচ শফিক ও তার ইয়ার-বন্ধুদের প্রচেষ্টার শেষ নেই।

শুধু ইবনে আলকামীর কারণেই শফিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, তা নয়; বরং তাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করছে। সে চাচ্ছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সে ফেরদাউসকে নিয়ে চম্পট দেবে।

শফীক ফেরদাউসকে খুব ভালোবাসে। সে জানতো, সে নিজে একজন সাধারণ মানুষ। তার কোনো সম্মান-মর্যাদা নেই। শিয়া-সুন্নী উভয় শ্রেণীর লোকেরা তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। অথচ ফেরদাউস জমিদারের মেয়ে। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি গোটা বাগদাদে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় বংশীয় লোকেরা তার পাণিপ্রার্থী। তার নিকট পৌঁছা শফীকের মোটেও সম্ভব নয়। তাই সে ভয়াবহ হাঙ্গামা সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তাহলে হয়তো সে হাঙ্গামা চলাকালে তাকে নিয়ে চম্পট দেবে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে শফীক জানপ্রাণ চেষ্টা করছে। একদা সে তার ইয়ার-বন্ধুদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করলো যে, তারা সুন্নীদের বাড়িতে আগুন লাগাবে। তার ধারণা, এতে সুন্নীরা ক্ষেপে ওঠবে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে। ইবনে আলকামীও এর সমর্থন করেছেন, এতে উৎসাহ দিয়েছেন।

কিন্তু তার ইয়ার-বন্ধুরা সুন্নীদের মহল্লায় গিয়ে এ ধরনের দাঙ্গা বাঁধাতে সাহস পাচ্ছে না। তারা ভাবছে, হয়তো বৃহৎ দাঙ্গায় শুরুতেই তারা ধরা পড়ে জনতার রোষে পৃষ্ঠ হবে। এতে মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে তারা দারুণ ভয় পায়।

কিন্তু লোভ এমন এক বিষয়, যার তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই চকচকে দেরহাম-দিনারের লোভে তারা তাতে রাজি হলো।

শফীক ফন্দি আঁটে, যদি ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন লাগালো যায়, তাহলে হয়তো দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাঝে সে ফেরদাউসকে নিয়ে চম্পট দিতে পারবে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিলো, ইয়াকুব জমিদার ও তার পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে আগুন দেয়া হবে। সে তার সাথীদের বললো, আগুন ছড়িয়ে পড়লে, হাঙ্গামা বৃহৎ আকার ধারণ করলে আমি ফেরদাউসকে নিয়ে চম্পট দেবো।

শফীকের বন্ধুরা সবাই ফেরদাউসকে চেনে। তার কোনো বন্ধুই ফেরদাউসের রূপ-লাবণ্যে বিমুখ ছিলো না। তাকে বাগে পাওয়ার জন্য সবার অন্তরই টই টই

করছিলো। কিন্তু শফীকের ভয়ে তারা মনের কথা প্রকাশ করতে পারছিলো না।

তবে আগুন লাগানোর কোনো একটা বাহানা তারা খুঁজছিলো। প্রত্যেকে অভিমত পেশ করলো। কিন্তু তার কোনোটিই পছন্দ হলো না। সবশেষে শফীক মাথা নেড়ে বিজ্ঞের ন্যায় বললো, হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

সঙ্গীরা তার দিকে তাকিয়ে বললো, বলো, কী বুদ্ধি এলো?

শফিক বললো, হাসান মাহমুদ দু'তিনজন সাথী নিয়ে ইয়াকুব জমিদারের নিকট যাবে এবং আমার পক্ষ থেকে ফেরদাউসের বিয়ের প্রস্তাব দেবে। ইয়াকুব জমিদার অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবান ও মেজাজী মানুষ। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। হাসান মাহমুদও এমনভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বলবে, যেনো ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। তারপর মেরে ফেললো, মেরে ফেললো বলে চিৎকার দিয়ে উঠবে। আমি অন্যান্যদের নিয়ে নিকটেই থাকবো। তার চিৎকার শুনেই আমরা দৌড়ে যাবো। গিয়েই ইয়াকুব জমিদার এবং অন্য যে সুন্নীদের সেখানে পাবো মারতে শুরু করবো। হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। আমাদের একজনের হাতে তেল থাকবে। সে বাড়িতে তেল ছিটিয়ে দেবে আর আমি আগুন লাগিয়ে দেবো। হাসান মাহমুদ ঝগড়া করতে থাকবে। যখন আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন নিশ্চয়ই দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে।

শফিকের বুদ্ধিতে সবাই বিমুগ্ধ হলো। হাসান মাহমুদ বললো, এটাই সুন্দর বুদ্ধি। এ পন্থা সবাই মেনে নিলো। দিন-তারিখও ধার্য হলো। এরা যেহেতু ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চাচ্ছিলো, তাই তারা তাদের সঙ্গে আরও বন্ধু-বান্ধবদের একত্রিত করলো। তারাও ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। ডাক-চিৎকার শুনলেই তারা দৌড়ে আসবে এবং হাঙ্গামা শুরু করবে।

নির্ধারিত দিনের ঠিক দুপুর বেলা হাসান মাহমুদ চার-পাঁচজন সাথী নিয়ে ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে পৌঁছলো। ঠিক তখন ফেরদাউস কোথাও থেকে বাড়ি ফিরছিলো। ঝলমলে পোশাকে তাকে দারুণ দেখাচ্ছিলো। সে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাদের দেখলো। হাসান মাহমুদ তাকে বললো, হে রূপের রাণী! আজ আমরা তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ অমর্যাদাকর কথা ফেরদাউসের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হলো। কিন্তু সে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেলো। হাসান মাহমুদ ইয়াকুব জমিদারকে ডেকে পাঠালো। তিনি বাইরে এলেন। তার কপাল কুঞ্চিত। মনে হচ্ছে তিনি ক্ষিপ্ত। হয়তো ফেরদাউস তাকে কিছু বলেছে। তিনি বললেন, কী খবর? এতো ডাক-চিৎকার করছো কেনো?

হাসান মাহমুদ বললো, আমরা আপনার নিকট শফিকের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

কথা শুনে ইয়াকুব জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। কারণ, বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার এ পন্থাটা অপমানজনক। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করে বললেন, কোন্ শফীকের কথা বলছো?

হাসান মাহমুদ হেসে বললো, আপনি শফিককে চেনেন না! ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো! বাগদাদ ও বাগদাদের পার্শ্ববর্তী সবাই তাকে এক নামে চেনে। সে উঁচু বংশের সন্তান। কার্‌খ মহল্লার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের একজন।

হাসান মাহমুদের কথা, হাসি ও বর্ণনাভঙ্গি দেখে ইয়াকুব জমিদার বুঝে ফেললেন, তারা তাকে ক্ষেপাতে চাচ্ছে। তাই তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, ও আচ্ছা ঐ শফিক, যে ফেতনা সৃষ্টিতে পটু, সন্ত্রাসী।

হাসান মাহমুদ বললো, আপনি এসব কী বলছেন?

ইয়াকুব জমিদার তার কথায় বিস্ময়াহত হলেন। তিনি একজন সম্মানিত মানুষ। কখনো কেউ তাকে এমনভাবে অপমান করেনি। তিনি আগন্তুক এই লোকগুলোর দুরভিসন্ধি অনুমান করতে পারলেন। বুঝলেন, তারা ঝগড়া করতে এসেছে। তিনি অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বললেন, মাফ করবেন আমার ভুল হয়ে গেছে।

হাসান মাহমুদ বললো, তাহলে কি আপনি শফিকের প্রস্তাব কবুল করে নিয়েছেন?

ইয়াকুব জমিদার আবার ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরও নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বললেন, না না, আমার ভুল হয়েছে। এ আত্মীয়তা হবার নয়।

হাসান মাহমদু বললো, না কেনো, আপনি তো কবুল করেছেন। এবার দিন-তারিখ ধার্য করুন।

ইয়াকুব জমিদার বললেন, অনর্থক বাজে কথা বলার আমার সময় নেই। একথা বলেই তিনি পশ্চাতে ফিরে বাড়ি চলে গেলেন। তিনি বাড়িতে ঢুকতেই দু'জন বাড়িতে তেল ছিটিয়ে দিলো এবং একজন আগুন লাগিয়ে দিলো। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়লো। হাসান মাহমুদ ও তার সাথীরা দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আগুন দেখে মানুষ ভিড় করলো। আগুন! আগুন!! বলে চিৎকার শুরু করলো।

ইয়াকুব জমিদার দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, তার বাড়িতে আগুন লেগেছে। তিনি ও মহল্লার লোকেরা আগুন নেভাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। পানি ছিটাতে লাগলেন। কিন্তু পানিতে যেনো আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠলো।

মানুষ প্রাণপ্রণে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। এক প্রতিবেশি বললো, ভাই! কে আগুন লাগালো? ইয়াকুব জমিদার বললো, শফিক ও তার দাঙ্গাবাজ সহচররা। দু'ব্যক্তি তাদের আগুন লাগাতেও দেখেছে।

আগুন বেড়েই চলছে। সবাই নেভাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আয়ত্বে আনতে পারছে না। উপস্থিত লোকেরা বললো, জমিদার সাহেব! ঘরের আসবাবপত্র ও নারীদের বাইরে নিয়ে আসুন।

বাড়ির অর্ধেক জ্বলে বাকি অর্ধেকও জ্বলে যাচ্ছিলো। তাই লোকেরা ইয়াকুব জমিদারকে এ পরামর্শ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে কাকতলীয়ভাবে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিয়ে আবুবকর উপস্থিত হলো। ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন দেখে বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে? আগুন কেনো?

ইয়াকুব জমিদার হাসান মাহমুদ ও তার সাথীদের আগমন, শফিকের জন্য বিয়ের প্রস্তাব ও আগুন লাগানোর ঘটনা বিস্তারিত বললেন।

আবুবকর দারুণ ক্ষিপ্ত হলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো, এরা বেশি বেড়ে গেছে। এদের নির্মূল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সে কয়েকজন অশ্বারোহীকে আগুন নেভাতে হুকুম দিলো। কয়েকজনকে আসবাবপত্র বের করার আদেশ দিলো। ইতিমধ্যে আগুন অন্দর মহলে পৌঁছে গেছে। ইয়াকুব জমিদার বললেন, এখন নারীদের কীভাবে বের করবো! তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন।

আবুবকর এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি অন্দর মহল থেকে সবাইকে বের করে আনছি। বলেই আবুবকর আগুনের মধ্যদিয়ে দৌড়ে অন্দর মহলে পৌঁছে গেলো। ফেরদাউস, যোবায়দা, খাদেমা ও সেবিকা আগুন দেখে হতভম্ব, কিংতর্কব্যবিমূঢ়। হঠাৎ আবুবকরকে দেখে ফেরদাউস বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বললো, এ্যা, আপনি!

আবুবকর বললো, এখন কথা বলার সময় নেই। আমার সাথে চলো। আবুবকর সবাইকে নিয়ে আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে আসার সময় তারা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বেরিয়ে এসেই তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। এদিকে সিপাহীরা দ্রুত আসবাবপত্র বের করে নিয়ে এসেছে।

বাইশ.

বাড়ি থেকে আসবাবপত্র বের করা হলে আবুবকর ইয়াকুব জমিদারকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি আর কোনো বাড়ি আছে, যেখানে গিয়ে ওঠবেন?

ইয়াকুর জমিদারের হৃদয় চিরে একটি আক্ষেপের নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললেন, আফসোস! আমার একটিই বাড়ি ছিলো, যা দুরাচার পাষণ্ডরা জ্বালিয়ে দিলো!

ফেরদাউস আবুবকরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। আবুবকর বললো, আমার একটি বাড়ি আছে। যদি আপনি থাকতে চান, তাহলে...।

ইয়াকুব জমিদার বললো, নিশ্চয় আপনার তাতে তকলিফ হবে।

আবুবকর বললো, আমি নিজে সে বাড়িতে থাকি না। আমার কর্মচারিরা থাকে। তাদেরকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।

ইয়াকুব জমিদার বললেন, কোথাও না কোথাও তো থাকতেই হবে। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আবুবকর বললো, এতে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছুই নেই। আমার আফসোস হচ্ছে, ঐ শয়তানগুলো আপনাকে কষ্ট দিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার ঐ বাড়ির চেয়ে সুন্দর সুরম্য বাড়ি তৈরি করে দেয়া হবে। আর ঐ শয়তান পাষণ্ডদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আবুবকর কয়েকটি গাড়ি ডেকে পাঠালো। তাতে মালপত্র তুলে দিলো। একটিতে যোবায়দা, ফেরদাউস ও ইয়াকুব জমিদার চড়ে বসলেন। তারা শাহী মহলের অদূরে একটি শানদার অট্টালিকায় এসে পৌঁছলো। মহলটি আমীরদের আসবাবপত্রে সজ্জিত। সেসবের সামনে ইয়াকুব জমিদারের আসবাবপত্র একেবারে তুচ্ছ মনে হলো।

আবুবকর বললো, এই মহলের সকল আসবাবপত্র আপনাদের জন্য। আপনারা অসংকোচে সেসব ব্যবহার করবেন।

ইয়াকুব জমিদার বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি...।

আমি খলীফার কাছে যাচ্ছি।

আবুবকর চলে গেলো। ইয়াকুব জমিদার জিজ্ঞেস করতে চাইলেন, আপনি কে? আবুবকরও বিষয়টি বুঝলো। কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে চাইলো না।

আবুবকর দারুণ আক্ষেপ করছিলো। ইয়াকুব জমিদারকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট শাস্তি দেয়া হয়েছে। তার বাড়িটা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। না, শফিক ও তার ইয়ার-বন্ধুদের দুঃসাহস অত্যন্ত বেড়ে গেছে। হাসান মাহমুদের কথা স্মরণ হলো। সে তো ফেরদাউসের জন্য শফিকের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো। তা হলে কি সত্যই শফিক ফেরদাউসকে চায়! সে কি তার পাণিপ্রার্থী? চিন্তার গতি তার মনে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করলো। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এলো। দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো। আচ্ছা, বামনকে চাঁদ ধরার সাধ অবশ্যই দেখাতে হবে।

আবুবকর খলীফার প্রাসাদে যাচ্ছিলো। স্বর্ণফটকে পৌঁছুলে কর্তব্যরত মুহাফিজ সিপাইরা তাকে সালাম করলো। স্বর্ণফটক সত্যই স্বর্ণের নির্মিত। সর্বক্ষণ ঝলমল করে। সূর্যের আলোতে তা অপরূপ আকার ধারণ করে। দর্শক মাত্র তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। স্বর্ণফটকে প্রবেশ করার পর দূর থেকে খেলাফত প্রাসাদকে দারুণ দেখায়। ফটকে প্রবেশ করেই সামনে বাগানের পর বাগান। শুধুই

সবুজের সমারোহ। তারপরই মর্মর পাথরে নির্মিত সেই শানদার খেলাফত প্রাসাদ। উজ্জ্বল রেশমি কাপড়ে সজ্জিত প্রত্যেকটি কামরা। সূক্ষ্য স্বর্ণখচিত অপূর্ব কারুকার্যময় পর্দা ঝুলছে প্রত্যেক দরজায়। অত্যন্ত সুন্দর মোলায়েম চিত্তাকর্ষী নানা রকম কার্পেট বিছানো প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে। সুসজ্জিত সেবিকারা এখানে-সেখানে যে যার কাজে ব্যস্ত।

আবুবকর বাগবাগিচা অতিক্রম করে এগিয়ে গেলো। প্রাসাদে পৌঁছে এক সেবিকাকে খলীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। সেবিকা সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারলো না। আসলেই সেবিকা-দাসিরা খলীফা সম্পর্কে কোনো খরবই রাখে না। যন্ত্রের মতো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করাই তাদের কাজ।

খেলাফত প্রাসাদের সেবিকাদের মহাপরিচারক সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী এক সুন্দরী যুবতী। কয়েকটি কামরা নিয়ে তার দফতর। আবুবকর তার নিকট গেলো। আবুবকরকে দেখেই সে অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলো। আবুবকর খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বললো, এখন মহামহিম খলীফা ফোয়ারার পাশে বসে আছেন। মনে হয় এখন তিনি আপনাকে সাক্ষাত দিতে পারবেন। তবুও আমি একটু জেনে নেই। আবুবকর একটি কুরশীতে বসে। মহাপরিচারিকা যুবতীটি এক সেবিকাকে যুবরাজ আবুবকরের আগমনের সংবাদ দিয়ে পাঠালো। তারপর আবুবকরকে বললো, মহামহিম খলীফা আপনার বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

আবুবকর বললো, তিনি মহান, আমার বিয়ে সম্পর্কে তার চিন্তা আছে। তবে আমি এখনো প্রস্তুত নই।

মহাপরিচারিকা বললো, মনে খারাপ কিছু না নিলে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম।

ঃ জিজ্ঞেস করো। মনে কিছু নেয়ার কী আছে?

ঃ আচ্ছা, আপনার পছন্দনীয় কি কেউ আছে?

ঃ তুমি এসব কী বলছো? তুমি কি আমার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কিছুই জানো না?

ঃ না মানে, প্রাসাদে এ বিষয়ে আলোচনা হয় কি না।

ঃ এতে কোনো সত্যতা নেই। তবে একটি কথা বলবে কি?

ঃ বলুন।

ঃ মহামহিম খলীফা কি কাউকে নির্বাচিত করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ সে কে?

ঃ সে আহমাদ আবুল কাসেমের বোন নাজমা।

মহাপরিচারিকা গভীর দৃষ্টিতে আবুবকরের মুখপানে চেয়ে রইলো। আবুবকর

নীরব রইলো। তার চেহারা থেকেও কিছু বুঝা গেলো না। সে বললো, সেই শাহজাদীকে কি আপনার পছন্দ নয়?

আবুবকর বললো, নাজমা ভাল মেয়ে। কিন্তু...।

মহাপরিচারিকা বললো, আপনি তাকে আপনার জীবনসঙ্গিনী বানাতে চাচ্ছেন না!

ঃ আমি এখন এসব চিন্তা করছি না। যে চিন্তা নিয়ে এসেছি, তা-ই আমার মাথায় চেপে আছে।

ঃ আচ্ছা, তাহলে একটি কথা বলছি। নাজমা একেবারে পরী, অপরূপ তার সৌন্দর্য। শাহী মহলের প্রতিটি কক্ষে তাকে নিয়ে আলোচনা হয়। তার মতো রূপসী আর কোনো শাহজাদী নেই।

ঃ আমি তাকে চিনি।

ঃ আপনি এ বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করবেন।

ঃ আচ্ছা করবো।

ঠিক তখনই সেই সেবিকা ফিরে এলো। বললো, খলীফা তার অপেক্ষা করছেন।

আবুবকর ফোয়ারার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলো। ফোয়ারাটি অত্যন্ত সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন এক বাগানের মাঝে বিদ্যমান। সাদা ধবধবে মর্মর পাথরে নির্মিত সেই ফোয়ারার উছলেপড়া পানি দারুণ চমৎকার দেখায়। চারদিক সবুজ গাছপালায় বেষ্টিত ফুল বাগানের মাঝে অবস্থিত ফোয়ারাটি দেখলে অন্য জগতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবুবকর ফোয়ারার দিকে এগিয়ে যায়। খলীফা একটি বৃক্ষের ছায়ায় পেলব-কোমল কারুকার্যখচিত কার্পেটে উপবিষ্ট। আবুবকর অত্যন্ত ভক্তিভরে তাকে সালাম দিলো। খলীফা সালামের উত্তর দিলেন। তার শুভকামনা করলেন। তাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। আবুবকর বসলো।

খলীফা বললেন, এই অসময়ে এলে যে?

আবুবকর বললো, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এবং সে ব্যাপারে যথাযথ হুকুম লাভের জন্য উপস্থিত হয়েছি।

খলীফা বললেন, বলো, কী সে গুরুত্বপূর্ণ কথা।

কিছু দাঙ্গাবাজ শিয়া ফেতনা সৃষ্টি করতে তৎপর রয়েছে। অথচ শান্তিপ্রিয় শিয়ারা তাদের পছন্দ করছে না। এই তো সেদিনের কথা। বখতিয়ার নামের এক শিয়া নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে চিৎকার করতে লাগলো, সুন্নীরা তার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় শিয়ারা তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলে। ফলে একটি দাঙ্গা থেকে বাগদাদ রক্ষা পায়। সেই দুরাচার শিয়া দলটি আজ ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তার বাড়িটি জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। অথচ প্রশাসন নীরব। যেনো দায়িত্বশীল সবাই কানে ছিপি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এতে ধারণা

হচ্ছে, সত্বর এক মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে, যার আগুন থেকে দারুল খেলাফতও রক্ষা পাবে না। সে আগুনে রূপনগরী বাগদাদ জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে।

ঃ কিন্তু এরা কেনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়?

ঃ আমি শুনেছি, ইবনে আলকামী গভীর ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তার ইশারায়ই এসব হচ্ছে।

ঃ এই ভালো মানুষটির তুমি কেনো বদনাম করছো? সে তো খেলাফতের ওফাদার।

ঃ সে দারুণ বাকপটু ও চতুর। কথার জোরে সে মহামহিম খলীফাকে তুষ্ট করে রেখেছে। যদি আমি খেলাফতের গোয়েন্দা হতাম, তাহলে অবশ্যই তার সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতাম। আপনি ইচ্ছা করলে তার আসল রূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারেন।

ঃ তুমি আর যাই বলো, আমি শুনতে প্রস্তুত। কিন্তু ইবনে আলকামীর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।

ঃ আফসোস! আমার নিকট এমন কোনো প্রমাণ নেই, যার মাধ্যমে আমি মহামহিম খলীফাকে বিশ্বাস করাতে পারবো।

ঃ তুমি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

ঃ যদি মহামহিম খলীফা তার মেয়ে হাজেরাকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেন, তাহলে হয় তো সে আপনাকে কিছু বলতে পারে।

ঃ সে মোটেই বলতে পারবে না। আমি জানি, হাজেরা অত্যন্ত সরল ও শান্তিপ্রিয় মেয়ে।

ঃ আচ্ছা, সেই দুরাচারদের সম্পর্কে আপনার কী নির্দেশ, যারা ইয়াকুব জমিদারের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে?

ঃ তাদের ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পেয়েছো?

ঃ যখন বাড়িতে আগুন জ্বলছিলো, তখন আমি সেখানে পৌঁছি। আর তখনই দুরাচাররা পালিয়ে যায়।

ঃ তারা যদি খেলাফতের আইন লংঘন করে, তাহলে আমি অনুমতি দিচ্ছি তাদের গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হোক।

ঃ কিন্তু উজিরে আজম ইবনে আলকামী আপনার নিকট সুপারিশ নিয়ে আসবে আর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করবে।

ঃ আমি অপরাধীদের পক্ষে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করবো না।

ঃ মহামহিম খলীফার ন্যায়পরায়ণতায় আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

ঃ তবে সাবধান! কোনো নিরপরাধ লোক যেনো গ্রেফতার না হয় সেদিকে খুব সতর্ক থাকবে।

ঃ ইনশাআল্লাহ, একজন নিরপরাধ লোককেও শাস্তি দেয়া হবে না।

আবুবকর খলীফাকে সালাম দিয়ে চলে যায়।

তেইশ.

ফেরদাউস এখন যে বাড়িতে অবস্থান করছে, তা প্রশস্ততা ও শানশওকতে শাহী মহলের চেয়ে কম নয়। ইয়াকুব, যোবায়দা ও ফেরদাউস এই ভেবে দারুণ বিস্মিত যে, এ লোকটি কে, যার এমন শানদার বাড়িতে কাজের লোকেরা থাকে। ফেরদাউস যদিও তাকে চেনে; কিন্তু হাশেম নামের এই লোকটির কোনো পরিচয় সে এখনো খুঁজে পায়নি। তার সমস্ত কাণ্ডই যেনো এক রহস্যময় আচ্ছন্নে ঘেরা।

ইয়াকুব জমিদারের গোলাম-দাসিরা আসবাবপত্রের সাথে এ বাড়িতে এসেছিলো। তারা সকল আসবাবপত্র দু'টি কামরায় রেখে তা বন্ধ করে রেখেছে।

দিনের পরিশ্রান্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়তেই দাসিরা কামরায় কামরায় বাতি জ্বালিয়ে দিলো। এক বিস্ময়কর কাণ্ড। গোটা বাড়ি ঝলমল করতে লাগলো। যোবায়দা ইয়াকুব জমিদারকে বললেন, ঐ যুবক ছেলেটি, যে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই কোনো আমীর হবে।

ঃ এই শানদার বাড়ি ও মূল্যবান আসবাবপত্র দেখে তো আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

ঃ ছেলেটি খুব ভদ্র, দয়ালু, মার্জিত।

ঃ যদি তাই না হতো, তাহলে আমাদের প্রতি সে এতটা হৃদ্যতা ও সহমর্মিতা দেখাতো না।

ঃ আচ্ছা, আমার মনে একটি কথা বারবার উঁকি দিচ্ছে। সে যদি ফেরদাউসকে পছন্দ করে...।

ঃ সে আমাদের অপরিসীম ইহসান করেছে। যদি সে এমন কোনো কামনা করে, তাহলে হৃষ্টচিত্তে আমি তা মেনে নেবো।

ঠিক তখন একজন দাসি এসে যুবকের আগমনের সংবাদ দিলো। ইয়াকুব জমিদার যোবায়দার দিকে তাকালেন। যোবায়দা বললেন, তাকে এখানেই ডেকে আনুন।

ইয়াকুব জমিদার দাসিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেনো তাকে সাথে করে এখানে নিয়ে আসে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকর চলে এলো। সে ইয়াকুব জমিদার ও যোবায়দাকে সালাম করলো। যোবায়দা উত্তর দিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন।

ইয়াকুব জমিদার বললেন, তোমার বদৌলতে আমরা আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক উত্তম বাড়িতে আছি। আমি তোমাকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

সবাই এক কামরায় বসে কথা বলছিলো। উজ্জ্বল আলোতে সে কামরাটি দিনের আলোর ন্যায় ফক্‌ফক্ করছে। ফেরদাউস ও যোবায়দা এক সোফায় বসে আছে। দ্বিতীয় সোফায় ইয়াকুব জমিদার বসা। অন্য সোফায় আবুবকর বসেছে। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় ফেরদাউসের চেহারা ঝলমল করছে।

আবুবকর বললো, শুকরিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাদের উপর জুলুম হচ্ছিলো। আপনাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার বাড়িটি এমনিতেই পড়ে ছিলো। আমি তা আপনাদের দিয়েছি মাত্র।

ফেরদাউসের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ঝলক। বললো, আচ্ছা, তাহলে কি চিরদিনের জন্য দিয়ে দিয়েছেন?

ঃ এ বাড়ি আপনাদের যোগ্য নয়। তারপরেও যদি আপনারা পছন্দ করেন, তাহলে দিয়ে দিলাম।

ফেরদাউস লজ্জায় পড়ে গেলো। সুন্দরী মেয়েরা লজ্জিত হলে ভারী চমৎকার দেখায়।

যোবায়দা বললেন, আমাদের বাড়ি এই বাড়ির তুলনায় কিছুই না।

আবুবকর বললো, এ বাড়ি এখন আপনাদেরই।

ইয়াকুব জমিদার শুকরিয়া আদায় করলেন।

যোবায়দা বললেন, তোমার নাম কী বেটা?

আবুবকর বললো, আমি হাশেম নামে পরিচিত। খলীফার নিকট আমি আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছি। তিনি সেই দুরাচার শয়তানদের গ্রেফতারের হুকুম দিয়েছেন।

ইয়াকুব বললেন, আমার একটি কথা আছে।

ঃ কী কথা?

ঃ এই দুরাচার দাঙ্গাবাজদের পেছনে উজীরে আজম ইবনে আলকামীর নেপথ্য সহায়তা রয়েছে। তাই তাদের এতো দুঃসাহস হয়েছে। তারা আমার সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছে। আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ঃ আপনার সন্দেহ সঠিক।

ঃ যদি তা-ই হয়, তাহলে তাদের গ্রেফতারের কারণে যেনো নতুন সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

ঃ যদি হাঙ্গামা বাঁধে, তাহলে ফৌজ রয়েছে। তাদের স্তব্ধ করে দেয়া হবে।

যোবায়দা বললেন, এভাবে তো তাহলে দাঙ্গাকারীদের সাথে নিরপরাধ ব্যক্তিরাও ফেঁসে যাবে।

ঃ না, নিরপরাধদের কোনো কষ্ট দেয়া হবে না, কোনো জুলুম করা হবে না।

ঃ আসল কথা হলো, এই দাঙ্গাবাজরা হাতেগোনা কয়েকজন শিয়া যুবক। তারা ছাড়া আর সবাই শান্তিপ্রিয়।

ঃ আমি সব কিছু জানি। তবে আমি এখন জানতে এসেছি, আপনাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা? থাকলে তার ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

ঃ আচ্ছা, তাহলে আমি প্রস্থানের অনুমতি চাচ্ছি।

ঃ খাবার প্রস্তুত আছে। আমাদের সাথে বসে খেয়ে গেলে খুব খুশি হতাম।

আবুবকর অত্যন্ত আনন্দের সাথে খাবার গ্রহণে রাজি হলো।

যোবায়দা দাসিদের খাবার নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ পরই সবাই খাবার রুমে চলে গেলো। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে শুরু করলো। ফেরদাউস অত্যন্ত জড়সড় হয়ে ছোট ছোট লোকমা দিয়ে খেতে লাগলো। আবুবকর তাকে দেখছিলো। খাবার শেষে হাত-মুখ ধুয়ে অন্য কামরায় চলে এলো এবং বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ফল খেতে লাগলো। ফল খাওয়া শেষ হলে আবুবকর বিদায় নিয়ে চলে এলো। ইয়াকুব-যোবায়দা দীর্ঘক্ষণ আবুবকর সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফেরদাউস তাদের আলোচনা শুনে দারুণ আনন্দিত হলো।

পরদিন সকালে সূর্য একটু উপরে উঠে এলে আবুবকর শহরের কোতয়ালকে ডেকে আনলো এবং কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে কার্‌খ এলাকায় গেলো।

ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, কার্‌খ নামে শিয়াদের একটি মহল্লা ছিলো। অনেক সৈন্য নিয়ে আবুবকর কার্‌খ মহল্লায় পৌঁছুলে শিয়াদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। আমীর-উমরাদের সাথে পরিচিত অনেক শিয়াকেই আবুবকর চেনে। সে তাদের নিকট গেলো। বললো, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, কয়েকজন দুরাচার দাঙ্গাবাজ শহরের শান্তি ও নিরাপত্তাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। তাদের দুঃসাহস-ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললো, আমরা অত্যন্ত লজ্জিত যে, মাত্র কয়েকজন দাঙ্গাবাজ সব নষ্টের মূল। আমরা বুঝেছি, আপনি তাদের গ্রেফতার করতে এসেছেন। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে একটি কথা...।

আবুবকর বললো, বলুন।

লোকটি বললো, নিরপরাধ লোকেরা যেনো শাস্তি না পায়।

আবুবকর বললো, অবশ্যই। আপনারা যাদের ভালো ও নিরীহ বলে সাক্ষ্য দেবেন, তাদের গ্রেফতার করা হবে না। আপনারা বললেই আমি ছেড়ে দেবো। আচ্ছা, হাসান মাহমুদ কেমন লোক?

লোকটি বললো, শফিকের সহচর। ভালো নয়।

আবুবকর বললো, সে কতিপয় দাঙ্গাবাজ নিয়ে ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তার সাথে রূঢ় আচরণ করেছে।

আবুবকর হাসান মাহমুদকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলো। কোতয়াল সিপাইদের সাথে নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে আনলো। এই তো সেই হাসান

মাহমুদ। গতকাল সে ছিলো অত্যন্ত দুঃসাহসী বীর। জমিদার ইয়াকুবের নিকট শফিকের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলো। তার সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তার বাড়িতে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করেছে। অথচ আজ একেবারে ভিজে বেড়াল। আবুবকর ধমক দিয়ে বললো, তোর সাথে আর যারা ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে গিয়েছিলো, তাদের নাম বল্।

আসলে দাঙ্গাবাজ-ফেতনাবাজ ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে বীর হয় না। তাই হাসান মাহমুদ সিপাইদের দেখেই ভয় পেয়ে গেলো। সে সকল দুরাচার-দাঙ্গাবাজদের নাম বলে দিলো। কোতয়াল সিপাইদের নিয়ে তাদের গ্রেফতার করে আনলো। হাসান মাহমুদ বিদ্বেষবশত দু'জন নিরপরাধ ব্যক্তির নাম বলেছিলো। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিয়ার অনুরোধে আবুবকর তাদের ছেড়ে দিলো।

তারপর তাদের বললো, তোদের কে ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলো?

গ্রেফতারের পর এই দাঙ্গাবাজ লোকগুলো দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাদের কয়েকজন বললো, হাসান মাহমুদ ও শফিক নির্দেশ দিয়েছে।

হাসান মাহমুদ বললো, এরা মিথ্যা বলছে। আমি কিছুই বলিনি। শফিকই নির্দেশ দিয়েছে।

দু'যুবক বললো, না না হুজুর, হাসান মাহমুদ মিথ্যা বলছে। সে আমাদের দিনার দিয়েছে। আমরা তার নির্দেশেই আগুন দিয়েছি। তবে শফিক আমাদের নেতা।

আবুবকর শফিককে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলো। একজন নেতৃস্থানীয় শিয়া বললো, সে বড় সন্ত্রাসী। একটি জানবাজ দল তার নির্দেশে চলে। তাকে গ্রেফতার করলে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আবুবকর বললো, আমি আরেক প্লাটুন সিপাই আসার নির্দেশ দিয়েছি। তারা এখনই এসে পড়বে। আজ দাঙ্গাবাজদের নিঃশেষ করে ছাড়বো।

উপস্থিত অন্য একজন বললো, আসলে আমরাও তা-ই চাই। কিন্তু আত্মমর্যাদার ভয়ে আমরা কিছু করি না।

কোতয়াল শফিককে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। কিন্তু তার পিছু পিছু একদল দাঙ্গাবাজ এলো। তারা তাকে জোরপূর্বক মুক্ত করে নিয়ে গেলো। শফিক এসেই বললো, তুমি আমাকে গ্রেফতার করিয়েছো, এর ফলাফল কিন্তু ভালো হবে না।

আবুবকর বললো, তোমাদের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা এক শিয়াকে তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে উৎসাহিত করেছিলে। গতকাল ইয়াকুব জমিদারের বাড়িতে আগুন দিয়েছো। দাঙ্গা-হাঙ্গামার নেশায় বুঁদ হয়ে আছো। আজ থেকে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠ হবে তোমাদের উত্তম নিবাস।

ক্ষিপ্ত হয়ে শফিক বললো, তুমি মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছো।

আবুবকর আর আত্মসংবরণ করতে পারলো না। শফিকের গালে এমন প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলো যে, সে দু'চোখের তারায় হাজারো শর্ষেফুল দেখতে লাগলো।

কয়েকজন হাঙ্গামা করতে চাইলো। সিপাইরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলো। কয়েকজনকে গ্রেফতার করলো। দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসীদের মাঝে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো। তারা হামলা করতে প্রস্তুত হলো। ঠিক তখন সিপাইদের নতুন প্লাটুন এসে পৌঁছলো। আবুবকর বললো, যে কেউ শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করবে, তারই গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

সিপাইদের নতুন প্লাটুন দেখেই দাঙ্গাবাজরা ভয়ে সরে পড়লো। শফিক অত্যন্ত গর্বের সাথে বললো, কোনো পরোয়া নাই। উজীরে আজম ইবনে আলকামী আমাকে এবং আমার সাথীদের অবশ্যই মুক্ত করে দেবেন।

গ্রেফতারকৃত দাঙ্গাবাজ দুরাচারদের নিয়ে আবুবকর চলে এলো এবং তাদের জেলখানায় পাঠিয়ে দিলো।

চব্বিশ.

শফিক, হাসান মাহমুদ ও তার সঙ্গী দাঙ্গাবাজরা গ্রেফতার হওয়ার পর বাগদাদ নগরীতে শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হতে লাগলো। যারা শফিক ও তার সঙ্গীদের সঙ্গদোষে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেছিলো, তারাও ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কিন্তু ইবনে আলকামী তাদের গ্রেফতারের সংবাদ শুনেই আগুন। তিনি কখনো ধারণাও করতে পারেননি, আবুবকর, শফিক ও তার সঙ্গী-সাথীদের গ্রেফতার করে জেলে পুরতে পারে। তার ধারণা ছিলো, তিনিই খেলাফতের ভালো-মন্দের একচ্ছত্র মালিক। কোনো উজীর, কোনো অফিসার, ফৌজের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার হুকুম ছাড়া কিছুই করার সাহস পাবে না। কিন্তু খেলাফতের উত্তরাধিকারী যুবরাজ আবুবকর তার সকল ইচ্ছা, সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। তিনি এখন আবুবকরের উপর দারুণ ক্ষিপ্ত। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, আচ্ছা, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। শফিক ও তার সঙ্গীদের মুক্ত করে তোমাকেই জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবো।

সেদিনই ইবনে আলকামী খলীফার নিকট গেলেন। খলীফা তাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। ফলে তাকে খেলাফতের সকল ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছিলেন এবং তাকে সবাই ভয় পেতো। তাকে সম্মান করতো। শাহীমহলের দাস-দাসিরা তার হুকুমে, তার ইশারায় চলতো।

খেলাফত প্রাসাদে পৌঁছুতেই প্রহরীরা তাকে সালাম করে সরে দাঁড়ালো।

ভেতরে প্রবেশ করতেই দাসিরা ছুটে এসে স্বাগত জানালো। প্রাসাদের নিরাপত্তা প্রহরীদের অফিসার ছুটে এলো। ইবনে আলকামীর কপালে চিন্তার কুঞ্চন রেখা দেখে বললো, আলা হযরত! ভালো আছেন তো...! আপনাকে অস্থির দেখাচ্ছে কেনো?

ইবনে আলকামী বললেন, হ্যাঁ, আজ আমি দারুণ কষ্ট পেয়েছি। আমার হৃদয় চুরমার হয়ে গেছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ কয়েকজন শিয়াকে আজ গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

অফিসার দারুণ বিস্মিত হলেন। কারণ, তিনি ভালভাবেই জানেন, খেলাফতের সকল শক্তির মূলে ইবনে আলকামী। তার নির্দেশ ছাড়া কিছুই হয় না। এমন অবস্থায় শিয়াদের গ্রেফতার করার দুঃসাহস কার হতে পারে? তাই তিনি বললেন, কার এই দুঃসাহস হলো আলা হযরত?

ইবনে আলকামী বললেন, যুবরাজ আবুবকর একাজ করেছে। অথচ আমি তাকে অত্যন্ত সম্মান করি।

অফিসার বললেন, কিন্তু তিনি এমনটি কেনো করলেন?

ইবনে আলকামী বললেন, তার কারণ তো সে জানে, তুমি খলীফাকে আমার আগমনের সংবাদ দাও।

অফিসার বললেন, পূর্বেই আমি সে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঠিক তখনই এক দাসি এসে বললো, মহামহিম খলীফা উজীরে আজমকে স্মরণ করেছেন। ইবনে আলকামী দাসির সাথে খলীফার কক্ষে চলে গেলেন।

খলীফা তার মসনদে সমাসীন। আশে-পাশে ও পেছনে কিছু অনিন্দ্যসুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা দাসি নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে। খলীফা একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করছেন। ইবনে আলকামী অত্যন্ত আদবের সাথে তাকে সালাম করলেন। খলীফা সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বসার জন্য ইশারা করলেন। ইবনে আলকামী বসে পড়েন।

খলীফা আবার অধ্যয়নে মশগুল হয়ে পড়লেন। খলীফার এই আচরণ ইবনে আলকামীর নিকট অপমানজনক মনে হলো। তিনি তার ধারণায় এমন মহান ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাকে খলীফারও সম্মান করা প্রয়োজন। আসার সাথে সাথে তার কথা শোনা আবশ্যক। তার কথা অনুযায়ী সাথে সাথে হুকুম জারি করা প্রয়োজন। কিছুক্ষণ পর খলীফা গ্রন্থটি রেখে দিলেন। ইবনে আলকামীকে সম্বোধন করে বললেন, এবার বলুন কী খবর।

ইবনে আলকামী বললেন, আজ গোটা বাগদাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামার বারুদ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ না করুন কখন যে তার বিস্ফোরণ ঘটে এবং চারদিকে ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে পড়ে আমি এখন তারই ভয় করছি।

খলীফার কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, কে এই বারুদ ছড়িয়েছে?

ঃ আমি এর কী বলবো।

ঃ না, কারো ভয় নেই, স্পষ্টভাবে বলো।

ঃ গোস্তামী মাফ করবেন। যুবরাজ এ-কাজ করেছেন।

খলীফা দারুণ বিস্মিত হয়ে বললেন, আবুবকর!

ঃ জ্বি, হ্যাঁ।

ঃ কীভাবে?

ঃ সে তো ঘুমন্ত সিংহদের জাগ্রত করে দিয়েছে।

ঃ সেই ঘুমন্ত সিংহ কারা?

ঃ কেনো, শিয়ারা।

ঃ স্পষ্ট করে বলো, আবুবকর কী করেছে?

ঃ কোনো কারণ ছাড়াই কতিপয় শিয়া যুবককে গ্রেফতার করে জেলে দিয়েছে। এতে গোটা শিয়া সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

ঃ কিন্তু আবুবকর তা কেনো করলো? সেতো অবুঝ শিশু নয়। নিশ্চয় এর পশ্চাতে কোনো কারণ রয়েছে।

ঃ কারণ তো কিছুই নেই। তবে সে শিয়াদের ক্ষিপ্ত করতে চায়।

ঃ এতে আবুবকরের ফায়দা কী?

ঃ আমার ধারণায় সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

ঃ কেনো?

ঃ আমি যদি বিষয়টি খুলে বলি, তাহলে তা যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ে দাঁড়াবে।

ঃ অভিযোগ হবে কিনা তার ভয় করো না। তুমি আমাদের ও খেলাফতের কল্যাণকামী ও শুভাকাংখী।

ঃ আমি শুনেছি, সে দুশমনদের সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করছে।

ইবনে আলকামী গভীর ষড়যন্ত্রের এক জাল ফেললেন। যে জাল অধিকাংশ সময় খেলাফতের দুশমনরা অথবা মতলববাজরা যুবরাজ ও খলীফার মাঝে দুশমনী সৃষ্টি করার জন্য ফেলে থাকে। এভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা খলীফা বা সুলতানদের ক্ষিপ্ত করে যুবরাজকে গ্রেফতার বা হত্যা করিয়ে থাকে। তাতে তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়। এভাবে যদি খলীফা বা সুলতান তাদের ফাঁদে পা না দেন, তাহলে যুবরাজকে তারা লোভ দেখিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করায়। তখন যার শক্তি ও ক্ষমতা বেশি মনে হয় এবং যার বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়, তার পক্ষ নেয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ভীরু এবং অদূরদর্শী ছিলেন।

কিন্তু এতো নির্বোধ ছিলেন না যে, ইবনে আলকামীর এ ধরনের চাতুর্যপূর্ণ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবেন। কারণ, তিনি আবুবকরকে ভালোভাবে চেনেন। তার উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তাই খলীফা তাকে বললেন, একথা কতোদিন পূর্বে শুনেছো?

ঃ বহুদিন পূর্বেই তো শুনেছি।

ঃ তখন তুমি আমাকে জানালে না কেনো?

ঃ আমি শাহজাদাকে বুঝিয়েছি। আমার ধারণা ছিলো, সে বিষয়টি বুঝবে এবং সিংহাসন দখলের লোভ তার মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। দিনে দিনে তার লোভ় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সে তার অনুচরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এখন সে যথেষ্ঠ পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করেছে। এবার সে তার মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে।

ঃ আমার আফসোস, তুমি এমন একটি ভয়াবহ বিষয় আমার অগোচরে রেখেছো, যা শুধু খেলাফতের জন্য নয় বরং আমার জীবনের জন্যও হুমকি।

ঃ আমি চাইনি, মহামহিম খলীফা ও যুবরাজের মাঝে কোনো অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক।

ঃ যদি তা-ই না চাচ্ছিলে, তাহলে এখনো না বলতে।

ঃ বিষয়টি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই মহামহিম খলীফার নিকট উত্থাপন করেছি।

ঃ আমি এখনই যুবরাজ আবুবকরকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

খলীফার এই কথা ইবনে আলকামীকে দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেললো। তিনি ধারণা করেছিলেন, তার কথা শুনামাত্র খলীফা ক্ষেপে ওঠবেন। শাহজাদা আবুবকরকে গ্রেফতার অথবা হত্যার নির্দেশ দেবেন। ফলে তার পথের কাঁটা সবার অজ্ঞাতে সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু খলীফা তার সকল আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। ইবনে আলকামী জানেন, আবুবকর তার সকল অপকর্মের খবর রাখে। সে যদি তার মুখোমুখি হয়, তাহলে তার সম্পর্কে খলীফার ধারণা পাল্টে যাবে। তাই বললো, আমি এটা ভালো মনে করি না যে, মহামহিম যুবরাজকে আমার সামনে উপস্থিত করবেন।

ঃ কেনো? ভালো মনে করছো না কেনো?

ঃ হতে পারে তরুণ যুবরাজ খলীফার সাথে কোনো বেয়াদবী করে বসবেন।

খলীফা অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, যদি কোনো বেয়াদবী করে, তাহলে আমার এই খঞ্জর বুক চিরে তাকে চিরদিনের তরে স্তব্ধ করে দেবে।

ঃ এ দৃশ্য আমার জন্য দারুণ অসহনীয়। আমিই তো শাহজাদাকে কোলে-কাঁদে নিয়ে বড় করেছি।

ঃ শৈশবকালে সে কতোবার আমার কোলে প্রস্রাব করেছে। আমি কি তাকে এতো আরাম ও ঐশ্বর্য্যের মাঝে এজন্য প্রতিপালিত করেছি যে, সে আমার নাফরমানী করবে!

বালক ছেলে। ইনশাআল্লাহ বয়স হলে সবই বুঝবে।

খলীফার সামনে যাতে আবুবকরের মুখোমুখী হতে না হয়, তাই তিনি এ প্রসঙ্গটি শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। খলীফার নিকটও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তিনি তাঁকে অকারণে আবুবকরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

ইবনে আলকামী বললেন, শিয়াদের মাঝে খুব উত্তেজনা বিরাজ করছে। শাহজাদা যাদের গ্রেফতার করেছে, মহামহিম খলীফা তাদের মুক্তির হুমুক দিয়ে দিন।

খলীফা বললেন, আমি জানি, কিছু দাঙ্গাবাজ শিয়া যুবক বাগদাদ শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তারা ইতিমধ্যে এমন কিছু কান্ড ঘটিয়েছে, যার কারণে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা শুরু হতে হতেও হয়নি। সেই দাঙ্গাবাজ দুরাচারদের শীর্ষে রয়েছে শফিক। সে হাসান মাহমুদ ও আরো কিছু দাঙ্গাবাজ যুবক দ্বারা ইয়াকুব জমিদারের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রবীণ শিয়ারা পর্যন্ত তাদের উপর নারাজ। আবুবকর আমার অনুমতি নিয়েই তাদের গ্রেফতার করেছে।

খলীফার এ কথায় ইবনে আলকামীর পিলে চমকে ওঠলো। তিনি বুঝে ফেললেন, আবুবকর তার সম্পর্কে অনেক কিছুই খলীফার কর্ণগোচর করেছে। সাথে সাথে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলেন। তার বিশ্বাস ছিলো, খলীফা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না। কিন্তু তার সে বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তার হিংসার আগুন এখন খলীফার দিকেই ছুটলো। তিনি খলীফার দুশমন হয়ে গেলেন। কিন্তু পাশ কেটে যাওয়ার জন্য বললেন, আচ্ছা, এই গ্রেফতারি যদি মহামহিম খলীফার নির্দেশে হয়ে থাকে, তাহলে আমার কোনো কথা নেই।

তারপর সালাম দিয়ে চলে এলেন।

পঁচিশ.

দাঙ্গাবাজ দলটি ইবনে আলকামীর উপর ভরসা করতো। তাদের বিশ্বাস, ইবনে আলকামীর কারণে কেউ তাদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস পাবে না। গ্রেফতার হওয়া, সে তো অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু যখন তাদের গ্রেফতার করা হলো, তখন তারা এই চিন্তায় বিভোর ছিলো যে, শীঘ্রই ইবনে আলকামী তাদের মুক্ত করে ফেলবেন।

ইবনে আলকামীরও এই বিশ্বাস ছিলো যে, তার বর্তমানে কোতওয়াল বা অন্য কেউ তাদের গ্রেফতার করার হিম্মত পাবে না। কিন্তু যখন শুনলেন, আবুবকর তাদের গ্রেফতার করেছে, তার শরীরে আগুন ধরে গেলো। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রথমে বন্দিদের মুক্ত করতে হবে। তারপর শাহজাদাকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু খলীফার নিকট পৌঁছার পরই তার সিদ্ধান্ত পাল্টে গেলো। সে শাহজাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলো।

তার বিশ্বাস ছিলো, খলীফা ভীতু মানুষ। যদি তাকে বলা হয়, শিয়াদের মাঝে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে তিনি অবিলম্বে বন্দিদের মুক্ত করে দেবেন। কিন্তু খলীফা যখন শাহজাদার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শুনলেন না, আবার বন্দিদেরও মুক্ত করলেন না, তখন ইবনে আলকামী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন। তার ক্রোধ ও বিদ্বেষ ধ্বংসাত্মক চিন্তায় রূপান্তরিত হলো। ক্রোধে ক্রোধে অধীর হয়ে তিনি বাড়িতে ফিরলেন। পথে কোনো শিয়ার সাথে দেখা হলেই তিনি লাল ডাগর চোখ মেলে তার প্রতি তাকান। ফলে শিয়ারা বুঝে নিয়েছে, ইবনে আলকামী ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। খলীফা তার কথা শোনেননি।

বাড়িতে পৌঁছে তার ক্রোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। ক্ষমতা থাকলে তিনি এক্ষুনি আবুবকর ও খলীফাকে রাজপথের মোড়ে ফাঁসিতে ঝুলাতেন। সিংহাসন ছিনিয়ে নিতেন। দাঙ্গাবাজ শিয়াদের মুক্ত করে ব্যাপক হাঙ্গামা সৃষ্টি করতেন।

কিন্তু নিজের ক্রোধের আগুনে নিজেই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। বাড়িতে পৌঁছে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। কুরসীতে বসতে না বসতেই হাজেরা এসে উপস্থিত হলো। প্রথম দৃষ্টিতেই হাজেরা অনুধাবন করলো, হিংসা ও বিদ্বেষভরা মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়।

হাজেরা ইবনে আলকামীর সামনের সোফাটায় বসলো। বললো, আব্বাজান! আজ আপনার কী হয়েছে? আপনাকে এতো ক্ষিপ্ত দেখা যাচ্ছে কেনো?

ঃ আজ আমি দারুণ ব্যাথা পেয়েছি। যার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত বাজি রেখেছি, যার ক্ষমতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত কঠিন কঠিন কাজ করেছি, যাকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্য আমি সর্বদা চিন্তায় ডুবে থাকি; আজ তিনিই আমাকে অপমান করেছেন।

ঃ আপনাকে কে অপমান করেছে? কীভাবে করেছে?

ঃ বেটি! খলীফা আমার কথা শোনেননি। আমি ধারণা করতাম, ক্ষমতার

বাগডোর আমার হাতে রয়েছে। খেলাফত পরিচালনায় সকল ক্ষমতা আমাকে খলীফা দিয়ে দিয়েছেন। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, আমি কিছুই না। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি ভীষণ লজ্জিত। আজ আমি চরম অপদস্ত।

ঃ একটু খুলে বলুন। তাহলে বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবো।

ঃ ঘটনা হলো, আবুবকর শফিক ও তার সঙ্গী-সাথীদের গ্রেফতার করেছে। আমি খলীফাকে আবুবকরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। ভয় দেখিয়েছি, শাহজাদা আবুবকর বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বন্দিদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আবুবকর আমার নির্দেশেই দাঙ্গাবাজ দুরাচার শিয়াদের গ্রেফতার করেছে।

ঃ হয়তো তিনি শফিক ও তার সাথীদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবহিত হয়েছেন।

ঃ আমার বুঝে আসছে না, কীভাবে লোকেরা এই ভালো ভালো ছেলেদের সম্পর্কে খলীফাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে।

ঃ শফিক ভাল মানুষ নয়– দাঙ্গাবাজ। সুন্নীরা তাকে দুরাচার মনে করে। শিয়ারা তাকে ফেতনাবাজ ভাবে। হয়তো শাহজাদারা তাদের কর্মকাণ্ডের কথা খলীফাকে অবহিত করেছে।

ঃ এটা আবুবকরের কাজ। আমি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করতাম। ছেলের মতো দেখতাম। তাকে আমার রক্তের বাঁধনে জড়াবার চিন্তা করেছিলাম। সে-ই খলীফাকে এ ব্যাপারে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। এখন আমি তাকে এবং খলীফাকে ঘৃণা করি। এ পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব আমার নিকট অসহ্য।

ঃ আব্বাজান! অমন চিন্তা করবেন না। খলীফা আমাদের সৌভাগ্যের উৎস। খলীফার পুত্র সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আপনি উজীরে আজম। খলীফার পর এটাই সবচে' মর্যাদাবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন পদ। সত্য বলতে কি, খলীফা নামমাত্র সিংহাসনে বসে আছেন। আপনিই খেলাফত পরিচালনা করছেন। কার্যত আপনিই খেলাফতের প্রধান কর্ণধার। এর চে' বেশি সম্মান আপনি আর কী চান?

ঃ বেটি! খলীফার আচরণে আমার চোখ খুলে গেছে। তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন না। শফিক ও তার সাথীদের ব্যাপারে বন্দি ছেলেরা আর অন্যান্য শিয়ারা কী ভাববে? আমি কীভাবে তাদের মুখ দেখাবো? আমি শফিককে বলেছিলাম, কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। সে হয়তো জেলখানায় আমার অপেক্ষায় আছে। ভাবছে, আমি গিয়ে তাকে মুক্ত করে আনবো। কিন্তু এখন আমি তাদের আশা পূরণ করতে পারছি না।

ঃ আব্বাজান! শফিক ও তার সাথীদের ছাড়িয়ে আনার একটা ব্যবস্থা করা যায়।

ইবনে আলকামী বিস্ময়ভরা চোখে হাজেরার দিকে তাকান। হাজেরা কথা শেষ না করতেই বললেন, কী ব্যবস্থা?

ঃ যদি শাহজাদা আবুবকরকে এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় যে, শফিক ও তার সঙ্গীরা ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের অপকর্ম করবে না, তাহলে তিনি তাদের মুক্তি দিয়ে দেবেন।

ঃ তাহলে কি এখন থেকে আমার শাহজাদাকে তোষামোদ করতে হবে?

ঃ আপনি কেনো বলতে যাবেন, আমি গিয়ে বলবো।

ঃ তোমার কথা কি সে রাখবে?

ঃ আমার বিশ্বাস, রাখবে।

ঃ তবে কথা তো সেটাই যে, সে আমাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি ফেলবে। অথচ আমি চাই আমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি ফেলবো।

ঃ আব্বাজান, তারা তো প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে চলেছেন। আপনি ক্ষমতার যে শীর্ষে পৌঁছেছেন, তা তো খলীফারই অপার অনুগ্রহের ফল। আর আপনিও তো কম অনুগ্রহ করছেন না– খেলাফতের সমস্ত কাজ আপনিই আঞ্জাম দিচ্ছেন।

হাজেরার কথা শেষ না হতেই ইবনে আলকামী বললেন, আজ পর্যন্ত আমি ভুলে ছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙেছে। এখন আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভবিষ্যতে আমার কী করতে হবে।

ঃ আপনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

ঃ এখন বিশ্বজুড়ে মোঙ্গলদের দাপট। তারা যে দেশ আক্রমণ করে, সে দেশ পদানত করে ছাড়ে। চেঙ্গীস খানের নাতি হালাকু খান এখন তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি তাকে আহ্বান জানাবো। বাগদাদ আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করবো।

হাজেরার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। সে মোঙ্গলদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। সে জানতো, তারা নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতায় হিংস্র হায়েনাকেও হার মানায়। ইবনে আলকামীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো, আব্বাজান, এমন চিন্তা করবেন না। আল্লাহ্ না করুন যদি এই নরপশুরা বাগদাদ আক্রমণ করে, তা হলে গোটা খেলাফত ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামী সভ্যতা ধুলোয় মিশে যাবে। মুসলিম উম্মাহ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

ইবনে আলকামী ক্ষোভে আগুনের মতো জ্বলছেন- 'দেশে ইনকিলাব আসুক, খুনের দরিয়া বয়ে যাক, ইসলাম খতম হয়ে যাক, ইসলামী সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাক তাতে আমার কী? আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। আমার নাম মুয়ায়্যিদুদ্দীন! আমি আলকামীর পুত্র। সব কিছু সহ্য করতে পারবো, কিন্তু

অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবো না।'

ঃ আব্বাজান! একটু চিন্তা করে দেখুন আপনি কী বলছেন। ক্ষোভে-ক্রোধে আপনি এমন কথা বলছেন, যা আপনার বলা উচিত নয়। যদি দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কি আমরা বেঁচে থাকবো?

ঃ আমি মোঙ্গলদের সাথে চুক্তি করবো। আমার বংশ বেঁচে যাবে। আমি গোটা ইরাকের বাদশাহ্ হবো।

ঃ এটা কীভাবে সম্ভব? মোঙ্গলরা তরবারীর জোরে এদেশ জয় করে আপনাকে বাদশাহ বানাবে?

ঃ আমি আগেই তাদের সাথে চুক্তি করে নেবো।

ঃ মোঙ্গল নরপশুদের কাছে ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি আর চুক্তির কী মূল্য আছে? যদি তারা রক্ষা না করে, তাহলে কে তাদের বাধ্য করবে?

ঃ প্রথমত আমার বিশ্বাস আছে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে না। যদি করে, তবে তাদেরও নাস্তানাবুদ করে ছাড়বো।

ঃ আব্বজান, এটা অসম্ভব। আমার ধারণা, তারা খেলাফত ধ্বংস করার পর আপনার সাথে ভালো আচরণ করবে না।

ঃ বেটি! তুমি আমাকে চেনো না। যদি তারা চুল পরিমাণ বেঈমানী করে, তবে আমি ইরাকের ভূমিতে তাদের কবর রচনা করবো।

ঃ না আব্বাজন! এমনটি মনে করবেন না। এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না। এতে আমাদের দেশে ধ্বংসলীলা নেমে আসবে। আর সবচে' বেশি আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঃ আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আমার কথা কানেই তোলে না, তখন তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতা থাকতে পারে না।

ঃ আপনি এতো পাষাণ হলেন কেনো? কেন বলছেন তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াই উচিৎ?

ঃ এজন্য যে, বাগদাদবাসীরা ইনকিলাব দেখেনি। তাদের তা দেখা উচিৎ। তবে তুমি যদি এই ইনকিলাব না চাও, তাহলে আমি তাড়াহুড়া করবো না।

ঃ হ্যাঁ, আব্বাজান! দেশ ও জাতিবিধ্বংসী ইনকিলাব আদৌ আমার কাম্য নয়।

ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি এখনই কিছু করতে যাচ্ছি না।

ইবনে আলকামী হাজেরাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে মুগ্ধ করলেন, যেনো সে তার প্রতিজ্ঞা ফাঁস না করে দেয়। কিন্তু যে দুরভিসন্ধির সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, তাতে তিনি অটল রইলেন। হাজেরা পিতার কক্ষ থেকে নিশ্চিন্তে ও প্রশান্ত মনে ফিরে এলো।

ছাব্বিশ.

আবুবকরের দেয়া মহলটি ফেরদাউসের দারুণ পছন্দ হয়েছে। বিরাট শানদার মহল। তাতে দু'টি পুষ্পোদ্যান, একটি ফল বাগান আর তিনটি ফোয়ারা আছে। ফোয়ারার অদূরে বসার মনোরম আসন। উছলেওঠা ফোয়ারার পানি সর্বদা এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখে।

ফেরদাউস তার পিতামাতার প্রতি এ কারণে দারুণ মুগ্ধ যে, তারাও হাশেমকে পছন্দ করেছে। তাই তার মনের তামান্না, হাশেম যেনো দ্রুত পয়গাম পাঠায়। তার পর সে...। আনন্দের আতিশয্যে ফেরদাউস এরচে' বেশি চিন্তা করতে পারলো না। তবে আনন্দে তার হৃদয় বারবার নেচে ওঠে। কখনো একাকি নিজের অজান্তে হৃদয়ের সাথে তার দেহও নাচতে শুরু করে। হৃদয়ের অনন্ত সুর শব্দের কায়ায় কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে।

ফেরদাউস এখন আগের চে' বেশি অপরূপা, অধিক সুন্দরী। মায়াময় তার দৈহিক সৌন্দর্য। কারণ, মনের আনন্দের জোয়ার তার শিরায় শিরায় রক্তের বান নিয়ে এসেছে। রক্তের লালিমায় তার চেহারা গোলাপী আকার ধারণ করে তাকে বড়ই চিত্তাকর্ষী ও মায়াময়ী করে তুলেছে।

একদিন সে এক বাগিচায় দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে একটি গানের কলিতে সুর দিচ্ছিলো। মাঝে মাঝে নিজের অজ্ঞাতে তার অবয়ব নেচে ওঠছে। তার এই আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ নাজমা এলো। কিন্তু ফেরদাউস তা আঁচ করতে পারলো না। বিড়ালের মতো অতি সন্তর্পণে নাজমা এগিয়ে গেলো। পশ্চাদ্দিক দিয়ে গিয়ে খপ্ করে দু'হাতে তার ডাগর চোখ দুটি চেপে ধরলো। ফেরদাউস বিস্মিত হলো। তারপর নাজমার পেলবকোমল সুপুষ্ট আঙুল স্পর্শ করে বললো, আমি জানি এ হাত কার।

নাজমা হাত সরিয়ে নিলো। ফেরদাউস ফিরে নাজমাকে দেখে দারুণ আনন্দিত হলো। তাকে জড়িয়ে ধরলো। মনে হলো, ডানাকাটা পরিরা এসে বাগিচায় নাচছে, আলিঙ্গন করছে।

নাজমার ঠোঁটের কোণে প্রশ্নের আভাষ। বললো, কী খবর, এতো আনন্দিত মনে হচ্ছে কেনো?

ঃ তেমন কিছু না। শীলত স্নিগ্ধ বাতাসে মনমাতানো বাগিচায় মনটা এমনিতেই ফুরফুরে হয়ে যায়।

নাজমা তার লজ্জাভরা চোখে চোখ রেখে বললো, আচ্ছা, মনের কথা আমার থেকেও লুকানো হচ্ছে বুঝি? আমি কি প্রকৃত কারণ বলে দেবো?

ঃ বলো দেখি।

ঃ হাশেম তোমাদের সাথে যে অভাবনীয় আচরণ করেছে, সে কারণে তোমার পিতা-মাতা তোমাকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। এটাই তোমাকে এতো আনন্দিত করেছে।

শুনে ফেরদাউস যারপরনাই বিস্মিত হয়ে তার প্রতি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

নাজমা বললো, তোমার চোখে এতো বিস্ময় কেনো? এসো ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসি।

উভয়ে ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসলো। নাজমা বললো, আমি যদি বলি, হাশেম তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে, তাহলে তুমি ব্যাথা পাবে না তো?

অজ্ঞাত এক আশংকায় ফেরদাউসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। চোখে-মুখে একটা অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠলো। তারপর হঠাৎ তার কণ্ঠচিরে একটি ভয়ার্ত শব্দ বেরিয়ে এলো, ধোঁকা দিয়েছে!

নাজমা বুঝলো, তার এ কথায় ফেরদাউস দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছে। তাই দ্রুত বললো, তুমি আমার কথার অর্থ কী বুঝেছো? আমার কথার অর্থ এই নয় যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আরে সে তো তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তার শিরায় শিরায় তোমার প্রেমের উষ্ণতা প্রবাহমান। তোমাকে ছাড়া সে বেঁচে থাকতে পারবে না। তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সেদিনই হবে তার জীবনের শেষ দিন।

ফেরদাউস বললো, অমন কথা বলো না নাজমা! আল্লাহ তাকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখুন।

নাজমার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। বললো, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ তোমার হাতে। সে এখনো তোমার পানেই চেয়ে আছে। তবে সে দু'টি বিষয় তোমার কাছে গোপন রেখেছে। বরং সে ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তুমি যদি তা জেনে তার প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি না ফেলো, তাহলে সে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। আর তুমি ক্ষমা করে দিলে সে খলীফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে।

ফেরদাউসের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। বললো, এ জন্য খলীফার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হয়?

ঃ বিয়ের ব্যাপারে খলীফার অনুমতি নিতে হয়।

ঃ আমার জানা নেই।

ঃ হ্যাঁ, হয়। তবে এই দ্বিতীয় বিষয়টির সম্পর্ক তোমার সাথে নয়, কিন্তু প্রথম বিষয়টির সম্পর্ক...।

ফেরদাউস তার কথার মাঝে বলে ওঠলো, আমার সাথে তিনি কি ভনিতা করেছেন?

ঃ তিনি তোমার নিকট তাঁর ব্যক্তিত্ব গোপন রেখেছেন। তার ছদ্মনাম বলেছেন। তুমি কি তাঁকে ক্ষমা করে দেবে?

ফেরদাউস নীরব হয়ে গেলো। তার কণ্ঠে কোনো কথা নেই। নাজমা কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে বললো, কি, কিছু বলছো না যে?

ফেরদাউস দুষ্টুমিতে ভরা ডাগর চোখ মেলে তার দিকে তাকালো। মৃদু হাসির ছোঁয়া তার অধরে। বললো, তুমি কি তার পক্ষ থেকে সুপারিশ করতে এসেছো?

ঃ এমনটি মনে করবে না।

ঃ যদি আমি ক্ষমা না করি, তাহলে...।

ঃ এর উত্তর নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো। মন যা বলে তা-ই করো।

ঃ না, না, কথাটি এমন নয়। কিন্তু তুমি যখন সুপারিশ করার জন্য এসেছো, তখন তো ক্ষমা করতেই হবে।

ঃ ভারী চমৎকার তো, তুমি আমার উপর অনেক অনুগ্রহ করেছো।

ঃ সে যা-ই হোক। তবে আমি তখনই ক্ষমা করবো, যখন তুমি আমার নিকট তার আসল নাম বলবে এবং তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে দেবে।

ঃ আমি তো এর জন্যই এসেছি।

ঃ আচ্ছা! তাহলে বলো।

ঃ তার নাম আবুবকর।

ফেরদাউস দারুণ বিস্মিত হলো। সে যুবরাজ আবুবকরের নাম অনেক শুনেছে। তার অন্তর ধুক্ ধুক্ করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, তবে সে যুবরাজ নয় কি? সে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কী বললে, তার নাম আবুবকর?

ঃ আমি তোমার বিস্ময়ের কারণ বুঝেছি। এ নাম তুমি বহুবার শুনেছো।

ঃ আমি শাহজাদা আবুবকরের নাম শুনেছি।

ঃ হ্যাঁ, তিনিই তো সে জন।

ফেরদাউস অভিভূত হয়ে থ মেরে রইলো।

ঃ তুমি কিন্তু ক্ষমা করার ওয়াদা করে ফেলেছো।

ঃ কিন্তু শাহজাদা এমন ভনিতা কেনো করলেন?

ঃ যদি প্রথম দিনই তোমার নিকট তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে দিতো, তাহলে হয়তো তুমি তার ব্যক্তিত্বের কারণে ভয় পেয়ে যেতে এবং তার সাথে মিশতে অপছন্দ করতে। এখন যখন তোমাদের মাঝে মনের আদান-প্রদান হয়ে গেছে এখন আর সে প্রেমের বাঁধন ফঁসকে যাওয়ার আশংকা নেই।

ঃ তারপরও একটু ভেবে দেখার দরকার আছে। শাহজাদা কোথায় আর আমি কোথায়। এ কথাটি কি তুমি তাকে একটু বলে দেবে?

কথা শেষ করতে না দিয়েই নাজমা বললো, আমি তাকে বলার কে? সে-ই তোমার নিকট আসবে। তুমি তাকে গ্রহণ করে নেবে, না হয় সে তোমার পদতলে তার জীবন উৎসর্গ করে পবিত্র-প্রেমের ইতিহাস গড়ে তুলবে। যদি তুমি ক্ষমা করে দাও, তাহলে আমি খলীফার থেকে অনুমতি নিয়ে আসবো। আমি এখনোই যাচ্ছি।

নাজমা চলে গেলে ফেরদাউস চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। তিনি শাহজাদা, যুবরাজ, আব্বাসী খেলাফতের উত্তরাধিকারী। অথচ আমি অখ্যাত অপরিচিত এক জমিদারের কন্যা!

এতোটুকু ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ আবুবকর এসে উপস্থিত হলো। বললো, ভুল হয়ে গেছে, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি।

ফেরদাউস দেখলো, আজ সে যুবরাজের পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে। বললো, শাহজাদা! আমাকে লজ্জা দেবেন না।

আবুবকর বললো, বরং আমিই লজ্জিত। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি। আমার জীবনের বাগডোর এখন তোমার হাতে।

ঃ আপনি উন্নতি করতে করতে বহু উর্ধ্বে পৌঁছেছেন। প্রথমে শাহীমহলের প্রহরীদের অফিসার ছিলেন। পরে ফৌজী অফিসার হয়েছেন। তারপর এখন শাহজাদা হয়ে গেছেন।

আবুবকর বললো, বহুরূপী হয়ে গেলাম, তাই না?

ফেরদাউস হেসে ফেলে। আবুবকর বললো, ক্ষমা করে দাও ফেরদাউস!

ঃ আমি অন্যান্যদের জন্য শাহজাদা, যুবরাজ; কিন্তু তোমার নিকট নাজমার মহলের সেই প্রহরী হয়েই থাকবো।

ঃ আগামীকাল আবার অন্য কিছু হয়ে যাবেন না তো?

ঃ তোমার সাহচর্য আমাকে যা বানাবে তা-ই হবো।

ফেরদাউস লজ্জিত হলো।

আবুবকর কোমর থেকে একটি চক্‌চকে খঞ্জর বের করে ফেরদাউসের সামনে পেশ করে বললো, নাও, এই খঞ্জরটি নিয়ে এ অপরাধীর শির ছিন্ন করে দাও।

ফেরদাউস খঞ্জরের দিকে তাকালো না। মাটি বরাবর তার দৃষ্টি। আবুবকর বললো, আচ্ছা তাহলে আমিই সব শেষ করে দেই।

একথা বলেই আবুবকর খঞ্জরটি উঁচিয়ে ধরলো। ফেরদাউস খপ্‌ করে খঞ্জরসহ তার হাতটা ঝাপটে ধরে ফেললো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আপনি...আপনি... এ কী করছেন?

আবুবকরের কণ্ঠে শীতলতা। বললো, নিজের জীবনলীলা সাঙ্গ করছিলাম।

ঃ মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করে আমার থেকে ক্ষমা নিতে চাচ্ছেন?

ঃ আল্লাহর শপথ, ব্যাপারটা এমন নয়। তবে তুমি ক্ষমা না করলে আমি বাঁচবো না।

ঃ আপনি সত্যই বলেছেন। আপনি চিরকাল আমার জন্য হাশেম হয়ে থাকবেন। আমি ক্ষমা করে দিলাম।

আবুবকর আনন্দিত হয়ে বললো, লাখ অযুত শুকরিয়া তোমায়। তুমি তোমার লৌকিকতা ছেড়ে দিয়ে আমাকে হাশেম হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছো।

ইতিমধ্যে নাজমা ঘনপল্লবিত ফুল বাগানের মধ্য থেকে বেরিয়ে তাদের নিকট এসে বললো, আর আমার মহলের প্রহরী থাকবে তাই না?

তিনজন এক সাথে হেসে ফেললো। মধুর হাসি। অনাবিল হাসি।

সাতাশ.

উজীরে আজম মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী যেনো উন্মাদ হয়ে গেছেন। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তার এতোটুকু অনুরোধ রাখেননি। তিনি বলেছিলেন, শফীক ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে মুক্ত করে দিয়ে শাহজাদাকে একটু সতর্ক করে দেয়া হোক। কিন্তু খলীফা তাও করেননি।

ইবনে আলকামী অত্যন্ত নিচু প্রকৃতির লোক। এতেই তিনি খলীফার দুশমন হয়ে গেলেন। শুধু এতোটুকুই নয়, তিনি দেশ ও ইসলামের, এমনকি নিজ সম্প্রদায়েরও দুশমন হয়ে গেলেন। তার মাথায় এখন হাজারো চিন্তার প্যাচ। কীভাবে খলীফা, শাহজাদা আবুবকর ও অন্যান্য শাহজাদাদেরকে নির্মূল করা যায় আর শিয়া সম্প্রাদয়ের ঐ নির্বোধ লোকদেরও কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, যারা তার কথামতো ফেতনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ নেয়নি, এই চিন্তায় তিনি অস্থির, বেচাইন।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বাগদাদ আক্রমণে মোঙ্গলদের আমন্ত্রণ জানাবেন। সেকালে মোঙ্গলদেরকে তাতারী বলা হতো। তারা খোরাসান আক্রমণ করে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালায় এবং তা জয় করে নেয়। নির্দয়, নিষ্ঠুর ও পশুস্বভাবের ছিলো এই তাতারীরা। যেখানে আক্রমণ করতো, সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত করতো। মানুষের ছিন্ন মস্তক সাজিয়ে পাহাড় গড়ে তুলতো। হালাকুখান তাদের বাদশাহ ও সরদার। সে এক পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অত্যাচার শিরোপা সে নিজ হস্তে মাথায় ধারণ করে অভিশপ্ত হয়ে আছে। মানুষকে সে মাটির পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু মনে করতো না। ধ্বংসলীলা আর রক্ত প্রবাহে ছিলো তার অসীম উল্লাস।

নির্দয় খুনীরা সর্বদা মানবতাহীন ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হয়। হালাকুখান ও তার জাতির অবস্থাও ঠিক তেমনি ছিলো। জুলুম-খুন, অমানবিকতা, অমানুষিকতা আর

অঙ্গীকার ভঙ্গে তারা তুলনাহীন। সুন্দরী নারী আর ধন সম্পদের আজন্ম পাগল। যেখানেই তা মিলতো, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়তো।

হালাকুখান সংবাদ পেলো, মৃত্যু-কেল্লায় বাতেনী গ্রুপের দুর্দান্ত সরদার হাসান ইবনে সাব্বাহ অসীম ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত সরদার সে সম্পদকে আরো বৃদ্ধি করেছে। দূর-দূরান্ত থেকে উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী নারীদের এনে হাসান ইবনে সাব্বাহর জান্নাতকে আরো উন্নত, আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। সংবাদ শুনে হালাকুখানের জিহ্বায় পানি এসে গেলো। নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলো না। সে সেই মৃত্যু-কেল্লায় আক্রমণ করলো।

ইতিহাসের এই বাতেনী গ্রুপকে কারামিতা বা ইসমাঈলিয়্যাহ বলা হয়। বাতেনী গ্রুপটি ইসমাঈলিয়্যাহ ফেরকারই একটি শাখা। হাসান ইবনে সাব্বাহ এ শাখাটিকে শক্তিশালী করেছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তা ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেলে। হালাকুখান হামলা করার সময় তাদের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

শক্তিমত্তায় তাতারীরা তখন শীর্ষে। খুন, রক্তপাত আর লুটতরাজে তারা অত্যন্ত হিংস্র ও ক্ষিপ্র। মানুষ তাদের ভয়ে কাঁপে। তারা যেদিকেই যায়, সেদিকেই ধ্বংসের রাজ কায়েম করে। কিন্তু তারা আরবদের ভয় করে। এ কারণেই ইরাক আক্রমণ করতে সাহস করে না।

মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাতারীদের নির্বাচন করলেন। চিন্তার তালে তালে তিনি সারা রাত বিছানায় ছট্ফট্ করলেন। এপাশ-ওপাশ করলেন। রাগে-ক্রোধে-ক্ষোভে তার চোখের পাতায় একটুও ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়েই সারারাত কাটিয়ে দিলেন।

খুব ভোরেই তিনি বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যান। তবে নামায আদায়ের জন্য নয়। কারণ, নামাযের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তিনি কেনো, গোটা বাগাদাদের হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া সবাই দিন-রাত খেলা-ধুলা, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে। এখানে সেখানে নাচ-গান ইত্যাদির অনুষ্ঠান চলতেই থাকে জীবন সংগ্রামে নিস্পেষিত কিছু মানুষ ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর যুবতী মেয়েরা একাডেমিকভাবে নাচ-গানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আমীর-উমরা, উজীর-মন্ত্রী ও শাসকদের বেগম, মেয়েরাও নাচ-গানে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। ঘরে ঘরে নাচ-গানের আসর বসে। ভাই বোনকে, পিতা মেয়েকে, স্বামী স্ত্রীকে গান গাইতে, নাচতে উৎসাহিত করে, প্রশংসা করে।

নামাযের প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নই। কোনো গুরুত্ব নেই। হাতেগোনা

কিছু লোক মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করে। গোটা বাগাদদ, বরং গোটা ইরাক আনন্দ-উল্লাস, খেলাধুলা ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত ছিলো।

ইবনে আলকামী উজীরে আজম। তিনি কেনো নামায পড়বেন! তাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে প্রশান্তচিত্তে এসে সোফায় বসলেন। ঠিক তখন হাজেরা এলো। হাজেরা সর্বদাই বেলা এক প্রহর করে ঘুম থেকে ওঠে। কারণ, সাধারণত সবাই অর্ধরাত পর্যন্ত সজাগ থাকে। তারপর শয্যা গ্রহণ করে। তাই বেলা হয়ে গেলে সবাই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। কিন্তু আজ হাজেরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।

সারারাত ইবনে আলকামীর চোখে ঘুম ছিলো না। তাই তার দু'চোখ লাল হয়ে আছে। হাজেরা বললো, আব্বাজান! কী হয়েছে, আপনার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল কেনো?

ইবনে আলকামী বললো, না, তেমন কিছু নয়। রাতে ঘুম হয়নি। তাই চোখ দু'টি লাল হয়ে আছে। কিন্তু আজ তুমি এতো সকালে বিছানা ছেড়ে বাইরে চলে এলে!

হাজেরা বললো, হ্যাঁ, আব্বাজান! আমি সকালে একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগেছি। তারপর বহু চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। শেষে শয্যা ছেড়ে উঠে এলাম।

ইবনে আলকামী বললেন, কী স্বপ্ন দেখেছো?

হাজেরা বললো, আমি দেখলাম, বিশাল বপু ও ভয়ানক চেহারার বহু লোক কেল্লার বাইরে অবস্থান নিয়েছে। সুদূর বিস্তৃত তাদের সেনাশক্তি। তারা শহরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। শহরের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। দেখতে না দেখতে তারা নগরপ্রাচীর টপকে শহরে প্রবেশ করে। তারপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু করে। পুরুষ, নারী, শিশু সবাইকে তারা নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছে। করুণ চিৎকার, আর্তনাদ ভেসে আসছে। রক্ত-দরিয়া প্রবাহিত হচ্ছে। আমি সেই দরিয়ায় পড়ে গেলাম। চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম।

আমি সেই দরিয়ায় আপনাকে ডিঙ্গি চালিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে বললাম, আব্বাজান আমাকে বাঁচান। আপনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু একটি বিশাল তরঙ্গ আপনাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলো। একজন ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। তাকে দেখেই আমার গোটা শরীর কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ কণ্ঠ চিরে এক ভীষণ চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এলো। সাথে সাথে আমার চোখ খুলে গেলো। তখন আমার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছিলো। দীর্ঘ সময় ধরে আমার শরীর কাঁপলো। তারপর ধীরে ধীরে আমি শান্ত হলাম।

ইবনে আলকামী কন্যার স্বপ্ন শুনে হেসে ফেললেন। এক কুৎসিত হাসি তার চেহারায় ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, স্বপ্ন মানেই কিছু দুশ্চিন্তা ও অবাস্তব ভাবনার অলীক রূপ। তুমি আমার নিকট মোঙ্গলদের কথা শুনেছিলে। তাদের চিন্তা করছিলে। সে চিন্তাই স্বপ্নের রূপ ধরে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

হাজেরা বললো, আব্বাজান, মোঙ্গলরা কি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ?

ইবনে আলকামী বললেন, না এমন নয়। তারাও আমাদের মতোই মানুষ। তবে তারা নির্দয়, হিংস্র ও রক্তপিয়াসী।

হাজেরা বললো, আব্বাজান! আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো বাগদাদেও খুনের দরিয়া বয়ে যাবে।

ইবনে আলকামী বললেন, বেটি! এমন হবে না। আমি তো তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, আমি মোঙ্গলদের আহ্বান করবো না। আমার দেশ ধ্বংস হোক এটা আমি চাই না।

হাজেরা বললো, স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমার অন্তরে এক ভয়, এক আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ইবনে আলকামী বললেন, ভয় পেয়ো না বেটি! আমি যতোদিন আছি তোমার কিছু হবে না। আচ্ছা এখন তুমি আমাকে গান শোনাও।

ইবনে আলকামী হাত তালি দিলেন। কয়েকজন দাসি ছুটে এলো। তিনি তাদেরকে বাদ্যযন্ত্র আনার হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এলো। ইবনে আলকামী তা নিয়ে সুর ধরলেন। হাজেরা গান গাইতে লাগলো। তার কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর, বিস্ময়কর। গানের তালে তালে হাজেরার গোটা দেহে আনন্দের বান বয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে আর বসে থাকতে পারলো না। সে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর নাচতে লাগলো।

সকালের স্নিগ্ধ শীতল স্বর্গীয় পরিবেশে হাজেরার মনমাতানো নাচ-গান ইবনে আলকামীকে অন্য জগতে নিয়ে গেলো।

হাজেরার পর এক অপরূপা সুন্দরী দাসি গান শুরু করলো। ইতিমধ্যে ইবনে আলকামীর চোখে ঘুম এসে গেলো। সোফায় বসে বসে তিনি ঝিমুতে লাগলেন এবং সেখানেই শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। হাজেরা ও দাসিরা সন্তপর্ণে সেখান থেকে চলে গেলো।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। এখনো ইবনে আলকামীর ঘুম ভাঙেনি। অনেক পরে তার ঘুম ভাঙলো। হাত-মুখ ধুয়ে খাবার খেলেন। তারপর ভাবতে লাগলেন, তিনি কি হালাকুখানকে চিঠি লিখবেন, নাকি লিখবেন না। হাজেরার স্বপ্ন সত্যই তাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। তিনি জানেন, যদি মোঙ্গলরা বাগদাদ আক্রমণ করে,

তাহলে অবশ্যই বাগদাদে খুনের দরিয়া বইয়ে দেবে। বহু নিষ্পাপ মানুষ নিহত হবে। আর আল্লাহই জানেন, সে জংলী পশুরা তার সাথে ও তার পরিজনের সাথে কী আচরণ করবে।

সেদিন তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। সারা দিন চিন্তা-ফিকির করলেন। কিন্তু রাতে যখনই বাতি নিভিয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন, তখনই তার মাথায় খলীফার দুর্ব্যবহারের চিন্তা এসে তোলপাড় শুরু করে দিলো। ধীরে ধীরে হিংস্রতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে জ্বলতে লেলিহান অগ্নি শিখার রূপ ধারণ করলো। তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করলেন এবং তখনই খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়লেন। ইবনে আলকামী লিখলেন–

'আব্বাসী খেলাফত এখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা করছে। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। জনসাধারণ খলীফা ও তার খেলাফতের ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আমি খলীফার উজীরে আজম। আমার কারণেই বাগদাদ তথা গোটা ইরাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। আমার কারণেই খেলাফত টিকে আছে। এখনই বাগদাদ আক্রমণের উপযুক্ত সময়। খেলাফতের ফৌজ ও ইরাকবাসী আপনার আগমনের অপেক্ষা করছে।'

আপনার একনিষ্ঠ বন্ধু
মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী
উজীরে আজম, ইরাক।

লেখা শেষ হলে ইবনে আলকামী চিঠিখান কয়েকবার পাঠ করলেন। চিঠিটি তার নিকট ভালোই লাগলো। তিনি তার এক বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন অনুচরকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে তিনি তাকে বিষয়টি খুলে বললেন। মোটা অংকের পুরস্কারের লোভ দেখালেন। চিঠিসহ তাকে খোরাসান পাঠিয়ে দিলেন।

অনুচর চলে যাওয়ার পর ইবনে আলকামীর হুঁশ ফিরে এলো। আরে! আমি তো এ ব্যাপারে ইস্তেখারা করিনি!

ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণে তিনি তা ভুলেই গিয়েছেন। ক্ষণিকের তরেও তার তা স্মরণে আসেনি। কিন্তু এখন আর কি তা সম্ভব। তীর তো ধনুক থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। তিনি ইস্তেখারা করলেন। কিন্তু ফলাফল বিপরীত এলো। এখন আবার বলতে লাগলেন, ইস্তেখারা করেই ভুল করেছি। যা হওয়ার তা হতে দেয়াই উচিত।

তিনি তার প্রেরিত অনুচরের ফিরে আসার অধীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আটাশ.

আবুবকর নাজমাকে এই বলে তৈরি করলো যে, সে খলীফার নিকট ফেরদাউসের সাথে তার ভালোবাসার কথা বলে, তাকে বুঝিয়ে অনুমতি আদায় করে দেবে। এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কারণ, আবুবকর যুবরাজ, আব্বাসী খেলাফতের ভাবী খলীফা। আর ফেরদাউস একজন অখ্যাত জমিদারের কন্যা। তাই খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে এ আত্মীয়তায় সম্মত করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার।

যদিও ব্যাপারটা এমন নয় যে, আব্বাসী শাহজাদাদের বিয়ে সাধারণ পরিবারের সাথে হয় না। বরং সচরাচর এমনই হচ্ছে। কিন্তু খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর খেয়াল হলো, শাহজাদাদের বিয়ে শাহজাদীদের সাথেই হওয়া উচিত। তাই খলীফার নিকট এ বিষয়টি উত্থাপন করতে নাজমা দারুণ ভয় পেলো এবং আবুবকরের নিকট গড়িমসি করলো।

আবুবকর বললো, এ-কাজ তুমিই করতে পারবে নাজমা! খলীফা তোমাকে খুব স্নেহ করেন। শাজাদাদের চেয়ে তোমার কথার বেশি গুরুত্ব দেন। তাছাড়া তুমি অত্যন্ত চৌকস ও সতর্ক মেয়ে। কথা বলার কৌশলও তোমার ভালো জানা আছে। আমার ধারণা, তোমার কথা তিনি অবশ্যই রাখবেন।

নাজমা বললো, তিনি যদি কথা শুনে বিগড়ে যান, তাহলে কী হবে?

ঃ না, এমন হবে না। তিনি তোমার কথায় বিগড়ে যাবেন না।

ঃ তুমি আমাকে আবার তিরস্কৃত বানিয়ে ছাড়বে না তো?

ঃ তুমি তিরস্কৃত হবে না। হ্যাঁ, যদি খলীফা তোমার প্রস্তাব মেনে নিতে অসম্মত হন, তাহলে তোমাকে তা বুঝিয়ে দেবেন।

ঃ তোমার জন্য আমি এক অজানা আশঙ্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

ঃ আবুবকর নাজমার লম্বিত কেশরাজিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, তুমি আমার কতো ভালো বোন নাজমা!

নাজমা মিষ্টি হেসে বললো, এখন আবার প্রশংসা শুরু করলে!

ঃ প্রশংসা করেছি তাতে অপরাধ কী করেছি? বরং এটা তো তুমি বিনিময় স্বরূপ করবে। আজ তুমি আমার কাজ করছো। কাল আমি তোমার কাজ করবো।

নাজমার মনে উত্তাপ। বললো, আমার কী কাজ করবে?

ঃ আমার যে কাজ তুমি করছো। আমি খলীফাকে বলে আহমারের সাথে তোমার সম্পর্ক গড়ে দেবো।

লজ্জাভরা আনত দৃষ্টিতে নাজমা আবুবকরের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা বিনিময়ের চিন্তা-ই তুমি করছো!

আবুবকর যেনো অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। বললো, না, না, বিনিময়ের কথা বলছো কেনো। আমার কাজটি হলে তোমার কাজটিও হবে।

নাজমার কণ্ঠে আরো উত্তাপ। বললো, আচ্ছা তাহলে আমি তোমার কাজ করবো না। তুমিও আমার কাজ করো না।

আবুবকর কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, নাজমা! এখন রাগ করো না বোনটি আমার! আমার কাজটি না হলে তো আমার এ জীবন দেহ ছেড়ে চলে যাবে। বলো..., বলো... আমার, আমার কাজটি করবে কি? বলো...।

নাজমা বললো, সোজা কথা বলবে, অন্যথায়...।

ঃ আমি একেবারে সোজা হয়ে যাবো। আহমার বেকুব। আমি আর তার কথা বলবো না।

ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার বদনাম করা ভালো নয়।

ঃ ঠিক আছে, বলো কবে যাবে নাজমা।

নাজমা বললো, আজ সন্ধ্যায় আমি খলীফার নিকট যাবো। যদি সুযোগ পাই, তাহলে আজই বলবো।

ঃ ইন্নালিল্লাহ! সুযোগ পেলে তবে বলবে! তুমি বুঝি আমাকে আরো কষ্ট দিতে চাও?

নাজমার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা। বললো, আমি কি চোখের পলকে সবই করে ফেলবো?

ঃ চোখের পলকে সব করার ক্ষমতা তো তোমারই আছে।

ঃ আচ্ছা ভাই! নিশ্চিন্ত থাকো, শান্ত থাকো, আজই আমি সব ঠিক করে ফেলবো।

ঃ শাবাশ! এখন আমার কাছে মুক্তা থাকলে তা দিয়ে তোমার মুখ পুরে দিতাম। তবে হীরা আছে, এসো তা দিয়ে তোমার মুখে পুরে দেই।

নাজমা বললো, মাফ চাই। মুক্তা খেলেও তো একটা কিছু হলো। হীরা খেলে ইহজীবন থেকেই চির বিদায় নিতে হবে।

ঃ বেশি বাড়াবাড়ি করো না।

ঃ আচ্ছা, রাতে এসো।

আবুবকর চলে গেলো। সারাটা দিন সে আল্লাহ আল্লাহ করে কাটালো। তার কাছে দিনের এক একটি মুহূর্ত এক ঘন্টা মনে হতে লাগলো। দিনের ক্লান্ত সূর্য প্রভা হারিয়ে অস্তমিত হলো। এমন সময় আবুবকর এসে নাজমার নিকট হাজির হলো। বললো, বলো বোন কী হয়েছে?

ঃ আশা করি খলীফা সম্মত হবেন। আমি যখন তার নিকট তোমার ও ফেরদাউসের কথা বললাম, তিনি তখন হেসে ফেললেন। বললেন, অন্য কোনো বিয়েতে অমত থাকার তাহলে এই কারণ। আমি বললাম, জাহাপনা! বিষয়টি এমন

নয়। আবুবকর চিরকুমারই থাকার ইচ্ছে করেছিলো। কিন্তু ফেরদাউস এসে তার জীবনছন্দে মিশে গেছে। তার ইচ্ছে পাল্টে দিয়েছে। খলীফা বললেন, আচ্ছা, তাহলে আগামীকাল সকালে তুমি আবুবকরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়ো।

আবুবকর নীরব হয়ে গেলো। বললো, এটাই তো খারাপ হয়েছে। তাঁর সামনে আমার জিহ্বা কীভাবে কথা বলবে?

ঃ হয়তো এমন কিছুই বলতে হবে না। সম্ভবত তিনি জানতে চান, সত্যই কি তুমি ফেরদাউসকে মনে-প্রাণে ভালোবাসো কিনা!

ঃ এর উত্তর তো সহজ।

নাজমা হেসে বললো, তাহলে কঠিন কী?

ঃ যদি খলীফা জিজ্ঞেস করেন, সত্যই কি তুমি আহমারকে ভালোবাসো? তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে?

ঃ আবার তুমি বাজে কথা বলতে শুরু করেছো।

ঃ তাহলে না বললাম, তুমিও সকালে আমার সাথে খলীফার নিকট যাবে।

ঃ আমার আবার যাওয়ার কী প্রয়োজন। সাহস করে একাই যাও, কাজ হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পর আহমার এলো। নাজমা বললো, আর দেরি নয়, আজই আবুবকর থেকে নিমন্ত্রণটা নিয়ে নাও। তার কাজ হয়ে যাচ্ছে।

আহমার বললো, কিসের নিমন্ত্রণ! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

আবুবকর বললো, না, না, কিছুই হয়নি।

নাজমা সকল কাহিনী বলে দিলো। আহমার বললো, আবুবকর ঠিকই বলেছে খলীফা মঞ্জুর না করা পর্যন্ত বিষয়টা অনিশ্চিত রয়ে যাচ্ছে।

নাজমা বললো, আরে আগামীকাল তো মঞ্জুর হয়ে যাবে।

আবুবকর বললো, তাহলে আগামীকালই নিমন্ত্রণ দেয়া হবে।

খাবারের সময় হয়ে গেছে। তিনজই খাবার খেলো। তারপর আবুবকর ও আহমার বেরিয়ে গেলো।

সারারাত আবুবকর দ্বিধায় কাটালো। তার যখন মনে হতো, খলীফা তার আরজু পূরণ করবেন, তখন তার অন্তরে এক আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো। মন তার বারবার নেচে ওঠতো। আর যখন এ চিন্তা আসতো, যদি তিনি তা মঞ্জুর না করেন, যদি ফিরিয়ে দেন, তখনই তার চেহারায় এক বিষাদ বিষাদ ভাব ছড়িয়ে পড়তো। দুনিয়ার সবকিছু তার নিকট বিস্বাদ মনে হতো।

অর্ধরাতের পর তার চোখের পাতায় ঘুম এলো। ঘুম ভাঙতেই দেখলো, বেশ বেলা হয়ে গেছে। উঠে গোসল করলো, কাপড় পরিবর্তন করলো। নাস্তা করে খলীফার নিকট চলে গেলো। শাহী মহলে পৌঁছুলে মহলের নিরাপত্তা প্রহরীদের

প্রধান তাকে স্বাগত জানালো। ঠোঁটে তার মৃদু হাসি। বললো, বাগদাদের কোনো হূরকে যুবরাজের পছন্দ হলো বুঝি!

আবুবকর বললো, তিনি কি রাগ করেছেন?

প্রহরী প্রধান বললো, রাগ করেননি, তবে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি আপনার অপেক্ষা করছেন।

প্রহরী প্রধান তাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলো। তারা খলীফার নিকট পৌঁছুলে আবুবকর অত্যন্ত আদবের সাথে বিনীতকণ্ঠে তাকে সালাম দিলো। খলীফা তার সালামের উত্তর দিয়ে সহাস্যবদনে বললেন, এসো আমার চোখের পুতুলি, বসো।

আবুবকর নতশিরে বসে পড়লো। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, গতকাল নাজমা ফেরদাউসের ব্যাপারে আলোচনা করেছে। তুমি কি সে মেয়েকে পছন্দ করো?

লজ্জায় আবুবকর উত্তর দিতে পারলো না। খলীফা বললেন, লজ্জা করো না, উত্তর দাও।

ঃ জ্বি।

ঃ তুমি শাহজাদীদের উপর ফেরদাউসকে প্রাধান্য দিলে?

ঃ জাঁহাপনা, মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী।

ঃ আমি তোমার প্রেয়সীকে দেখতে চাই।

ঃ শাহজাদী নাজমা তাকে শাহী মহলে নিয়ে আসতে পারবে।

ঃ আচ্ছা। তাহলে নাজমাকে বলবে, সে যেনো বাগদাদের সেই পরীকে এখানে নিয়ে আসে।

ঃ জ্বি মহামহিম খলীফা, তা-ই হবে।

ঃ আমার খুব ভালো লেগেছে যে, তুমি নিজেই পাত্রী নির্বাচন করে নিয়েছো।

ঃ আমি বিস্মিত যে, সে আমার জীবনের সাথে একই সূত্রে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়েছে।

খলীফা হেসে ফেললেন। আবুবকর বিদায় নিয়ে সালাম করে ফিরে আসে।

ঊনত্রিশ.

আবুবকরের বিশ্বাস, খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ফেরদাউসকে দেখে অবশ্যই পছন্দ করবেন। কিন্তু ফেরদাউসকে শাহী প্রসাদে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আবুবকরের সাথে যখন তার প্রথম পরিচয় হয়েছিলো, তখন সে জানতো না, সে শাহাজাদা। আর নাজমার সাথে সাক্ষাতের সময়ও সে জানতো না, নাজমা শাহজাদী। যদি জানতো, তাহলে কিছুতেই সে মিশতো না। তার চিন্তার জগতে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতো। ভাবতো, কোথায়া শাহজাদা-শাহজাদী আর কোথায় আমি!

অথচ মেয়েটি এমন রূপসী ও মোহনীয় যে, শাহজাদা তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আর শাহজাদীরা তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে গর্ববোধ করে। কিন্তু এদিকে তার একটুও খেয়াল নেই।

আবুবকর ভাবতে লাগলো ফেরদাউসকে কীভাবে খলীফার নিকট নেয়া যায়। যদি তাকে বলা হয়, খলীফা তোমাকে দেখতে চান, তাহলে সে কিছুতেই রাজি হবে না। আর যদি তাকে না জানিয়ে কোনোভাবে নিয়ে যাওয়া হয় আর সে তা জেনে ফেলে, তাহলে তার বেঁকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ চিন্তা করতে করতে সে নাজমার নিকট পৌঁছলো। নাজমা অবশ্যই তার কোনো সমাধান বের করে দেবে। নাজমার প্রাসাদে পৌঁছে দেখলো, ফেরদাউস বাগিচার ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে তখন খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা। চারদিকে মুক্ত বাতাসের ছুটাছুটি। বাতাসের ঝাপটা ফেরদাউসের ওড়নার প্রান্ত নিয়ে খেলা করছে। তার মাথার উষ্ণিশ তাকে অন্তহীন সৌন্দর্য দান করেছে। মনে হচ্ছে, যেনো আকাশ ফুড়ে কোনো হূর নেমে এসেছে বা ককেশাশের কোনো পরী পথ ভুলে এখানে হাজির হয়েছে।

এই অপরূপ ভঙ্গীতে ফেরদাউসকে দেখে আবুবকরের মনে হলো, যদি এখানে এসে খলীফা উপস্থিত হতেন, তাহলে সে সময়ই তার অনামিকায় আংটি পড়িয়ে কাজ সমাধা করে দিতেন। আবুবকরের অন্তর চিরে আনন্দের নহর বইতে লাগলো। সে মৃদুকণ্ঠে কবিতার ছন্দ আবৃত্তি করতে লাগলো।

বাতাসের পিঠে চড়ে আবুবকরের ছন্দ, মৃদুস্বর ফেরদাউসের কণ্ঠে গিয়ে পৌঁছলো। ঘুরে দৃষ্টি ফেলতেই সে আবুবকরকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলো। তবুও মুখ জুড়ে ছড়িয়ে রইলো ভুবনবিজয়ী মুক্ত হাসি। আবুবকর এগিয়ে গেলো। ফেরদাউস বললো, কোথা থেকে এলেন?

ঃ আমি খলীফার নিকট থেকে এসেছি। সেখানে তোমার আলোচনা হয়েছে।

ঃ আমার আলোচনা হয়েছে? রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়লো ফেরদাউসের কণ্ঠে একটা ভয় ভয় ভাব তার চেহারায় ফুটে ওঠলো।

আবুবকর বললো, তোমার রূপ-সৌন্দর্যের প্রশংসা হয়েছে।

ফেরদাউসের মনে একটা প্রশান্তির তরঙ্গ খেলে গেলো। বললো, জ্বি।

ঃ ফেরদাউস! আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ঃ করুন।

ঃ রাগ করবে না তো!

ঃ তাহলে এমন কথা বলবেন কেনো?

ঃ তেমন কোনো কথা নয়।

ঃ তাহলে তো ভয়ের কিছুই নেই।

ঃ খলীফার নিকট তোমার আলোচনা হয়েছে। এখন আমি তোমার নিকট আবেদন নিয়ে এসেছি।

ফেরদাউস দারুণ লজ্জিত হলো। আবুবকর বললো, আরে, তুমি তো দেখছি কথা শেষ করার পূর্বেই লজ্জায় শেষ হয়ে যাচ্ছো। কথাটা শেষ করতে দেবে তো।

লজ্জাভরা দৃষ্টি তুলে ফেরদাউস তার দিকে তাকালো। আবুবকর তার শরীরে এক অভিনব কম্পন অনুভব করলো। বললো, আমি নাজমাকে তোমার মায়ের নিকট পাঠাবো।

এ কথা বলে সে চলে গেলো। আনন্দে ফেরদাউসের অন্তর নাচতে লাগলো। আবুবকর নাজমার নিকট গেলো। সে তখন গুন গুন করে গান গাইছে। আবুবকর বললো, তোমাকে তো বেশ বিমুগ্ধ মনে হচ্ছে। নাজমা তাকে দেখে মৃদু হেসে বললো, আপনার সেজন তো এসে গেছে।

ঃ তার সাথে সাক্ষাৎ করেই এসেছি।

ঃ খলীফার নিকট থেকে এলেন বুঝি।

ঃ হ্যাঁ। তিনি তার হবু পুত্রবধূকে দেখতে চান।

ঃ যান, সাথে করে নিয়ে যান। দেখিয়ে নিয়ে আসুন।

ঃ এটা তোমার কাজ। তোমার দ্বারাই সম্ভব।

ঃ এবারের জন্য মাফ চাচ্ছি।

ঃ না, না, তা হয় না। কাজটি তোমাকেই করতে হবে। তবেই না আমি...।

নাজমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, বহুত শুকরিয়া। কিন্তু কবে নিয়ে যাবো?

ঃ খলীফা আগামীকাল যেতে বলেছেন।

ঃ আচ্ছা, তাহলে কালই নিয়ে যাবো।

আবুবকর চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফেরদাউস এলো। নাজমা প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো বিকশিত ফেরদাউসের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ফেরদাউস দেখেছে, আবুবকর নাজমার নিকট থেকে প্রস্থান করেছে। তাই সে ভাবলো, নিশ্চয় আবুবকর নাজমার বিয়ের পয়গাম সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেছে। তাই সে দারুণ লজ্জিত। নাজমা বললো, ফেরদাউস! তুমি কি জানো, আবুবকর কী বলেছে?

ফেরদাউস না জানার ভান করে বললো, আমি কীভাবে জানবো!

ঃ সে আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

ঃ যাও তা পালন করো।

ঃ তিনি তো তোমার নিকট তা আলোচনা করেছেন।

ঃ হ্যাঁ, আমার নিকট আলোচনা করেছেন। তিনি বহুরূপী। বললেন শাহী প্রহরীদের অফিসার। কখনো ফৌজের অফিসার। কখনো শাহজাদা।

ঃ তোমার প্রেমই তাকে এ সব কিছু বানিয়ে ছাড়লো।

ফেরদাউস বাঁকা চাহনিতে তাকে দেখলো। নাজমা বললো, বেচারা আবু বকরের কী দোষ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে সুন্দরী, রূপবতী, মায়াবীনী করে সৃষ্টি করেছেন। ডাগর পটোলচেরা চোখ দু'টি হৃদয়কে ব্যাকুল, চঞ্চল করে। তাই তো তার এ বহু রূপের ছলনা।

ঃ আর তোমার চোখ দু'টি?

ঃ বলতে হবে না, কেমন তাতো দেখছোই।

ঃ আহ্মার বলে হৃদয়কাড়া আঁখিযুগল।

ঃ সে বলুক কিংবা না বলুক, তুমি তো বলো না।

ঃ আমি সত্য বলছি। তারপর উভয়ে হেসে ফেললো।

রাতে ফেরদাউস ফিরে যেতে চাইলো। নাজমা বললো, আজ তোমাকে যেতে দেবো না। আগামীকাল আমরা শাহী প্রাসাদের নহবতখানায় যাবো। গান শুনবো।

ঃ আমাকে শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবে?

ঃ কার সাধ্য আছে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে? তুমি তো সত্বর যুবরাজের বেগম হতে যাচ্ছো।

ফেরদাউস নীরব হয়ে গেলো। ফিরে যাবার ব্যাপারে আর তাড়া করলো না। রাতে নাজমা ও ফেরদাউস একই বিছানায় শয়ন করলো। ফেরদাউস এতে দারুণ সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করলো।

কিছুটা বেলা হলে তারা গোসল করে নিলো। দাসিরা এসে কাপড় পরিয়ে দিলো। সুসজ্জিত হওয়ার পর তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে গেলো। উজ্জ্বল মুখে তাদের পূর্ণিমার জ্যোতি। বিলম্বিত কেশদামের উপর মুক্তা ও হীরার কাজকরা অপূর্ব উষ্ণীশ তাদের আরো মোহময় করে তোলে। যার দৃষ্টিই তাদের উপর পড়ে, সে-ই বিস্মিত বিমূঢ়তায় থমকে দাঁড়ায়।

শাহী প্রাসাদে তাদের গাড়ি গিয়ে থামলো। প্রহরী প্রধান স্বাগত জানালো। ফেরদাউসকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে সেও ফেরদাউসের নাম শুনেছে। তার রূপের কথা শুনেছে। এবার তাকে সম্মুখে দেখে মনে মনে বললো, সত্যই রূপের অপূর্ব জৌলুসে সে আজ বাগদাদের কন্যা হতে যাচ্ছে।

প্রহরী প্রধান তাদের মহলে নিয়ে গেলো। শাহজাদী ও বেগমরা সেখানে তারকার ন্যায় বিকশিত হয়ে বসে আছেন। তারা সেখানে পৌঁছুলে সবাই তাদের স্বাগত

জানালো। ফেরদাউসকে দেখে সবাই বিমূঢ় হয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো, কল্পনার রং-তুলি দিয়েও তো আমরা কখনো এমন রূপসী কন্যার কথা চিন্তা করতে পারি না।

তারপর গান শুরু হলো। বেগমরা সঙ্গীত পরিবেশন করলো। শাহজাদীরাও সঙ্গীত পরিবেশন করলো। তারপর শাহজাদী ও বেগমরা সমবেত কণ্ঠে গান পরিবেশন করলো। সুরের তালে তালে, বাদ্যের ঝংকারে এক আনন্দ-জগতে সবাই বিমুগ্ধ হয়ে রইলো।

ইতিমধ্যে কয়েকজন দাসি দৌড়ে এসে সংবাদ দিলো, মহামহিম খলীফা তাশরীফ আনছেন। গান বন্ধ হয়ে গেলো। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে খলীফাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই খলীফা এসে পৌঁছলেন। সবাই তাকে সালাম করলো। খলীফা সালামের উত্তর দিলেন। তারপর সিংহাসনে উপবেশ করলেন এবং সবাইকে বসতে ইঙ্গিত দিলেন। সবাই বসে গেলো। নাজমার পাশেই ফেরদাউস উপবিষ্ট। খলীফার দৃষ্টি অতি ধীরে ঘুরে ঘুরে এসে ফেরদাউসের চেহারায় আটকে গেলো। বিমুগ্ধ বিস্ময়ভরা সেই দৃষ্টি। নাজমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাশের মেয়েটি কে?

নাজমা বিনীত কণ্ঠে বললো, মহামহিম খলীফা, এ আমার সখী ফেরদাউস।

খলীফার চেহারায় মৃদু মিষ্টি হাসির ঝলক ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, আবু বকরের নির্বাচন তো দারুণ চমৎকার। ফেরদাউস অত্যন্ত সোহাগী মেয়ে।

লজ্জায় ফেরদাউস শির নত করে ফেললো। নাজমার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠলো।

খলীফা বললেন, আবুবকরকে বলে দেবে আমি সন্তুষ্ট। আমি রাজি।

তারপর আবার সঙ্গীত শুরু হলো। দুপুর পর্যন্ত সঙ্গীত পরিবেশিত হলো। সুরের মূর্ছনায় বিমুগ্ধ রইলো গোটা মহল। দুপুরে সবাই শাহী দস্তরখানে খাবার খেলো। তারপর নাজমা ফেরদাউসকে নিয়ে শাহী প্রাসাদ থেকে চলে এলো।

ত্রিশ.

ঘরে ফিরে নাজমা ফেরদাউসকে বললো, মুবারকবাদ হে বোন!

ফেরদাউস বুঝলো, নাজমা তাকে কিসের মুবারকবাদ দিচ্ছে। কিন্তু না বুঝার ভান করে বললো, কিসের মুবারকবাদ দিচ্ছো?

ঃ আচ্ছা, বুঝেও না বুঝার ভান ধরেছো?

ঃ কিছু বলো; তবে তো বুঝবো।

ঃ মহামহিম খলীফা তোমাকে পছন্দ করেছেন। তিনি তোমাদের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

ঃ অমন কথা বলবে না।

ঃ বেশ তা-ই হবে। কিন্তু অন্তরে তো আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে!

ঃ তোমার অন্তরে!

ঃ প্রথমে তোমার অন্তরে, তারপর আমার অন্তরে। আল্লাহর শুকরিয়া, তুমি আমার ভাবী হতে যাচ্ছো।

ঃ তুকি কি তোমার ভাইয়ার মুখ দেখেছো?

ঃ আমি তো শুধু মুখ দেখেছি। কিন্তু তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো, হৃদয় আরশিতে কার মুখ এঁকে দিনরাত দেখো।

ফেরদাউস হেসে ফেললো। বললো, তোমার।

ঃ একথা সত্য যে, আমার হৃদয়ে তোমার ছবি আছে আর তোমার হৃদয়ে আমার ছবি আছে। তবে তা হৃদয় আরশির প্রান্তদেশে হবে। আর আরশি জুড়ে যার ছবি বিদ্যমান, সে হলো আবুবকর ভাইয়া। খেয়াল রাখবে, ভাইয়া যেনো খলীফার অনুমতি দানের কথা শুনে আনন্দে উন্মাদ হয়ে না যায়। তুমি রূপসী। তাকে যাদুমুগ্ধ করে রেখেছো।

ফেরদাউস বললো, তাহলে তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

নাজমা বললো, আরে, আমাকে তো আগেই যাদু করে বিমুগ্ধ বানিয়ে রেখেছো।

ঃ আর ভাই আহমারকে কে যাদু করে রেখেছে?

নাজমা হেসে বললো, দুষ্টু, এবার দুষ্টুমি শুরু করেছো।

কিছুক্ষণ পর নাজমা বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে গেলো। এরপরই আবুবকর এসে বললো, বলো নাজমা কী হয়েছে?

নাজমা দুষ্টুমী করে বললো, খলীফা ফেরদাউসকে একটুও পছন্দ করেননি।

আবুবকরের মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হলো। অস্থিরতা ও পেরেশানি ভাব ফুটে ওঠলো তার চেহারায়। আক্ষেপভরা তার করুণ কণ্ঠ। বললো, এখন কী হবে নাজমা!

নাজমার খুব দয়া হলো। বেশিক্ষণ আর লুকোচুরি খেলতে পারলো না। বললো, আচ্ছা ভাইয়া! ফেরদাউস কী এমন মেয়ে, যাকে কেউ পছন্দ করবে না? খলীফা তাকে দেখেই বললেন, আবুবকরের নির্বাচন দারুণ চমৎকার। ফেরদাউস অত্যন্ত সোহাগী মেয়ে।

আবুবকর বললো, দুষ্টু কোথাকার। তুমি আমাকে এতো ভয় দেখালে কেনো?

ঃ আপনি যেনো আনন্দে পাগল হয়ে না যান, তাই প্রথমে সত্য গোপন রেখেছি।

ঃ আচ্ছা, তাহলে পয়গাম দিয়ে আসো।

ঃ বাহ, সব কাজ বুঝি আমিই করবো?

ঃ তুমি বুদ্ধিমতি, হুঁশিয়ার। তাছাড়া এর বিনিময় তো তুমি পাবেই। আজ তুমি আমার পয়গাম নিয়ে যাও। কাল আমি তোমার পয়গাম নিয়ে যাবো।

নাজমা রহস্যভরা বাঁকা চাহনীতে তার দিকে তাকালো। বললো, এখন আবার আপনি দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছেন।

ঃ দুষ্টুমি নয়- সত্য বলছি। বলো, কখন যাবে?

ঃ ভাইয়া অন্য কাউকে পাঠান না!

ঃ আবারও ঐ কথা। তাহলে আমিও কিন্তু বেঁকে বসবো। লাখোবার খোশমোদ করলেও আমি আহমারের পয়গাম নিয়ে আসবো না।

ঃ আচ্ছা এসো না।

ঃ আরে না না। শতবার আসবো। বোনটি আমার! আজই যাও।

নাজমা হেসে ফেললো। বললো, এখন দেখছি খোশামোদ করতে শুরু করলেন।

ঃ খোশামোদ তো করতেই হবে। যাও না, আজই যাও।

ঃ এই মাত্র শাহী প্রাসাদ থেকে এসেছি। তোমার সেও এই মাত্র গেছে। এখন আবার দৌড়ে যেতে মন চাচ্ছে না।

ঃ আরে তুমি বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়লে।

ঃ আচ্ছা তাহলে সন্ধ্যায় যাবো।

আবুবকর বিমুগ্ধ চিত্তে ফিরে চলে গেলো। সন্ধ্যায় নাজমা ফেরদাউসের বাড়িতে গেলো। যোবায়দাকে সালাম করলো। বললো, আজ আমি একটি নিবেদন নিয়ে এসেছি।

যোবায়দা বললেন, নিবেদন নয়, হুকুম বলবে। তুমি একজন শাহজাদি।

না, না। আপনি বয়সে আমার মায়ের সমান। সম্মানীয়া। আপনার নিকট নিবেদনই করবো। কিন্তু নিবেদন করার পূর্বে আমাকে কিছু কথা বলতে হবে। জিজ্ঞেস করতে হবে।

যোবায়দা বললেন, জিজ্ঞেস করো।

নাজমা বললো, আপনি কি হাশেমকে চেনেন?

যোবায়দা বললেন, ভালভাবে চিনি না, তবে অত্যন্ত ভদ্র ও শরীফ মানুষ জানি।

ঃ আপনি হয়তো জানেন না উনি কে?

ঃ শুধু এতোটুকু জানি, তিনি কোনো ফৌজি অফিসার।

ঠিক তখন ফেরদাউস বাইরে থেকে এসে দরজার সাথে মিশে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে লাগলো। নাজমা বললো, উনি শাহজাদা।

যোবায়দা দারুণ বিস্মিত হয়ে বললো, উনি শাহজাদা!

নাজমা বললো, শুধু তাই নয়, যুবরাজও।

ঃ যুবরাজ তো আবুবকর।

ঃ হাশেম আবুবকরের ছদ্মনাম।

ঃ আল্লাহর কসম! আমি তো একবারও তাকে যথোপযুক্ত সম্মান করিনি!

ঃ সম্মানীদের সম্মান করার প্রয়োজন হয় না। আমি শাহজাদী। আমি ফেরদাউসকে বোন বানিয়ে নিয়েছি। তাই আপনিও আমার মা হয়ে গেছেন।

ঃ এটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়।

ঃ এখন নিবেদন হলো, আবুবকরকে আপনি ছেলে হিসেবে গ্রহণ করে নিন।

যোবায়দা বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি, ফেরদাউসের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনো শাহজাদী উপস্থিত হবে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন। কী করবেন, কী বলবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না।

নাজমা ভাবলো, হয়তো তিনি প্রস্তুত নন। তাই বললো, মা, আপনি আবুবকরকে চেনেন। তার ভদ্রতা-শিষ্টাচার সবার মুখে মুখে। এই ভেবে সে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেনি যে, আপনারা তাকে ভালোভাবে চিনে নেবেন আর বুঝে নেবেন যে, সে অত্যন্ত শরীফ।

ঃ হ্যাঁ, আমি তো তার ভদ্রতা ও শরাফতের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

ঃ তাহলে আর পিছুটান কেনো?

ঃ কোনো কারণ নেই। তবে তাতে কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত ফেরদাউসের আব্বার সাথে পরামর্শ করতে হবে। তারপর ফেরদাউসকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর এ মোবারক পয়গাম মহামহিম খলীফার পক্ষ থেকে হতে হবে।

ঃ আমি মহামহিম খলীফার অনুমতি নিয়ে এসেছি। তারপরও তার পক্ষ থেকেই চূড়ান্ত পয়গাম আসবে। বোন ফেরদাউসকে আমি রাজি করিয়ে নেবো। এখন আব্বার সাথে আপনি পরামর্শ করে নিন।

ঃ আমি তার সাথে আলোচনা করবো।

ঃ আমি কখন আসবো?

ঃ এটা তোমার ঘর। যখন খুশি আসবে। আজ কোনো এক সময় আমি আলোচনা করে নেবো।

ঃ শুকরিয়া।

কিছুক্ষণ পর নাজমা ফিরে যেতে উদ্যত হলে ফেরদাউস দরজার আড়াল থেকে কেটে পড়তে চাইলো। নাজমা দেখে ফেললো। বললো, চোর, সব কথা শুনে এখন কোথায় পালাচ্ছো। ফেরদাউস তার রাঙ্গা ওষ্ঠাধরে আঙুল রেখে বললো, চুপ, আম্মা কিন্তু সব শুনছেন! উভয়ে হাসতে হাসতে চলে এলো।

পরদিন নাজমা খলীফাকে উদ্বুদ্ধ করলো, যেনো তিনি ইয়াকুব জমিদারের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠান। খলীফা তাতে সম্মত হয়ে তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ইয়াকুব জমিদারের নিকট পাঠালেন। যোবায়দা ইয়াকুব জমিদারের নিকট সবকিছু বলে দিয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সমাদরের সাথে, অত্যন্ত আনন্দের সাথে খলীফার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বলে দিলেন, আমরা খলীফার নগণ্য খাদেম। অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সাথে আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

দিন কয়েক পর এক অনুষ্ঠানে বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো। বিয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। খলীফা ইয়াকুব জমিদারকে আমীরদের মাঝে গণ্য করে নিলেন। তিনি প্রত্যহ দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। বিয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য খলীফা তাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করলেন।

কাল-পরিক্রমায় সেই শুভদিনটি এগিয়ে এলো। ফেরদাউস আজ কনে। তার বাড়ি শাহজাদী আর বেগমদের পদভারে সরগরম হয়ে ওঠলো। অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বরযাত্রা এলো। বরযাত্রার সাথে মহামহিম খলীফাও এলেন। সাথে এলেন আমীর-উমরাও। খেলাফতের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হলো না। সে এক বিশাল আয়োজন। বিকেলে বিয়ে হয়ে গেলো। তারপর শুরু হলো ধুমধাম। সানাইয়ের সুর ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠলো। গোটা বাগদাদে আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগলো। সারারাত নাচ আর গানে মেতে রইলো। খলীফাও দীর্ঘক্ষণ এ আনন্দ মাহফিলে উপস্থিত রইলেন।

দ্বিতীয় দিন বিদায়ের পালা। সকাল থেকেই তৈরি চলছে। ফেরদাউসকে এক অপূর্ব সাজে-সজ্জিত করা হলো। তার দিকে এখন তাকানোই মুশকিল। দৃষ্টিশক্তি খেই হারিয়ে ফেলে। চোখ ঝলসে যায়। যেনো ধূলির ধরায় জান্নাতের হূর। দুপুরের খাবারের পর বিদায় নিয়ে সবাই চলে এলো। ইয়াকুব জমিদার তার কন্যাকে বহু আসবাবপত্র উপঢৌকন দিলেন। যোবায়দার অন্তরে আনন্দের শেষ নেই। তার কন্যা আজ যুবরাজের স্ত্রী। এ বিরাট সৌভাগ্য।

শাহী প্রাসাদে পৌঁছুলে বেগম ও শাহজাদীরা দৌড়ে এলো। ফেরদাউসকে দেখতে যেনো তারা পাগলপারা। প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ অনুযায়ী অলংকার উপহার দিলো।

নাজমা এক বিস্ময়কর মুক্তারমালা ফেরদাউসের গলায় পরিয়ে দিয়ে মিটি মিটি হেসে বললো, আমার পেয়ারী ভাবী। বলেই এক টানে ঘোমটা খুলে ফেললো। মনে হলো যেনো ঝলকানো মেঘমালা ছিন্ন করে পূর্ণিমার উজ্জ্বল ঝলমলে চাঁদ বেরিয়ে এলো। নাজমার ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। বললো, ভাবী, বলুন তো, কে আপনাকে দেখে স্থির থাকতে পারবে!

ফেরদাউসের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হচ্ছে। আবুবকরের মা এগিয়ে এলেন। পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমার ঘরে এক হূর পাঠিয়েছেন। নাজমা হেসে বললো, কিন্তু এই দুষ্টু হূরটি কীভাবে এমন ভদ্র ও অনুগত হলো, তা তো আমি জানি।

সম্রাজ্ঞী বললেন, না, না আমার বধূ অত্যন্ত ভালো।

নাজমা বললো, এটাই তো মায়াবী দৃষ্টি। এক দৃষ্টিতে আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে।

সম্রাজ্ঞী হেসে ফেললেন। বললেন, বেশ হয়েছে। আর বলো না, পাছে কার আবার চোখ লাগে।

সম্রাজ্ঞী স্বহস্তে ফেরদাউসের ঘোমটা টেনে দিলেন। মনে হলো যেনো, জ্বল জ্বল পূর্ণিমার চাঁদটি ঘন মেঘের আড়ালে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তারপর শাহজাদি ও বেগমরা সবাই একে একে চলে গেলো।

একত্রিশ.

ইতিহাসের এক অধ্যায়ে আরবদের দাপটে পৃথিবী কাঁপতো। যেদিকে তদের যাত্রা শুরু হতো, সেদিকেই বিজয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়তো। একের পর এক রাজ্য জয় করে বীরদর্পে সামনে এগিয়ে যেতো। রোম আর পারস্য সাম্রাজ্য তারা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলো। বিশ্বজুড়ে তারা ইসলামী সাম্রাজ্য ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সে অধ্যায়ের আকাশ-বাতাস আর জিন-ইনসান দেখেছিলো শান্তির দুনিয়া, ইনসাফের সাম্রাজ্য।

কিন্তু কালের বিবর্তনে এলো আরবদের মাঝে পরিবর্তন। রোমান খৃষ্টান আর ইরানী অগ্নিপূজারীদের মিশ্রণে তারা ভোগ-উপভোগে লিপ্ত হলো। কিন্তু তখনো আরবদের দাপট একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

হিজরি ৬৫৬ সালের কথা বলছি। রাসূলুল্লাহ'র (সা.) হিজরতের সাড়ে ছ'শ বছর পরের কথা। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের ৬১৫ বছর পরের কথা। কারণ, ৪১ হিজরীতে হযরত হুসাইন (রা.) এক শান্তিচুক্তির অধীনে খেলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে নেন এবং গোটা ইসলামী বিশ্বে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত হুসাইন (রা.) পর্যন্ত খেলাফতে রাশেদা অব্যাহত ছিলো।

ইতিহাস চারজনকেই খোলাফায়ে রাশেদা হিসাবে গণ্য করে। তারা হলেন- হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খলীফা হলেন পাঁচজন।

পঞ্চমজন হযরত হাসান (রা.)। তিনি মাত্র ৬ মাস খলীফা ছিলেন। তারপর একথা বলে খেলাফত থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন যে, নবীর খান্দানে নবুওত ও খেলাফত একত্রিত হতে পারে না।

৪১ হিজরীতে গোটা ইসলামী দুনিয়া হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং তিনি ইসলামী দুনিয়ার একচ্ছত্র খলীফা হন। ঐতিহাসিকরা তার শাসনামলকে সালতানাত ও বাদশাহী হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁর পূর্বে মদীনা ছিলো দারুল খেলাফত। ৪১ হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দামেশ্‌কের গভর্নর ছিলেন।

তিনি তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে যুবরাজ নির্ধারিত করেন।

সে যুগ হিসেবে ইয়াজিদ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতো। ভোগ-বিলাসে তার সময় কাটতো। তবে খেলাফতের যোগ্য ছিলো না। ফলে এতেই দ্বিধাদ্বন্দ সৃষ্টি হয়। বিভেদ শুরু হয়। চারদিকে অসন্তোষ দেখা দেয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন বনু উমাইয়াদের একজন। তিনি উমাইয়া খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই খেলাফত স্থায়ী থাকে। মারওয়ান ছিলেন এই বংশের শেষ শাসক। হিজরী ১৩২ সালে তিনি নিহত হন এবং সে বছরই উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি ঘটে। এ দীর্ঘ সময়ে যারা শাসন ক্ষমতার মালিক হয়েছিলেন, তাদের মাঝে মাত্র পাঁচজন ছিলেন যোগ্য। তারা হলেন- ১. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ২. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ৩. অলীদ ইবনে আবদুল মালেক ৪. হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ৫. উমর ইবনে আবদুল আজীজ।

উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) প্রকৃতপক্ষে খেলাফতে রাশেদার নমুনা ছিলেন। আর অন্যান্যদের অধিকাংশই ছিলো নির্বোধ, অদূরদর্শী, ভীতু, ভীরু, ভোগবিলাসী, জালিম ও অহংকারী। ধীরে ধীরে এই বংশীয় রাজত্বে কপটতা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারপর তা বিরোধ ও অনৈক্যের রূপ ধারণ করলো। রাজ পরিবারে হত্যা, রক্তপাত শুরু হলো। ক্ষমতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ দেখা দিলো। এভাবে এ রাজপরিবারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। আত্মকোন্দলের আগুনে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এদিকে আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র সফল হয়। তারা খেলাফতের দণ্ডমুন্ড আকড়ে ধরে। তাদের প্রথম খলীফা হলেন আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ সাফফাহ। তার হাতে মানুষ বাইয়াত গ্রহণ করলো। আব্বাসী খেলাফতের ধারা শুরু হলো। চলতে চলতে তা ঐ সময়ে এসে পৌছলো, আমরা যার আলোচনা কগরছি। অর্থাৎ হিজরী ৬৫৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলো। মুসতাসিম বিল্লাহ আব্বাসী খলীফা ছিলেন। তিনি ভীরু, ভীতু, নির্বোধ ও কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করতে

পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু ব্যয় করতে অভ্যস্থ ছিলেন না। তার নির্বুদ্ধিতা তাকে ও মুসলিম উম্মাহকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইবনে আলকামী অত্যন্ত চালাক স্বার্থপর, ধূর্ত, লোভী ও হিংসুক ছিলেন। খেলাফতের সকল ক্ষমতা তার হাতে থাকা স্বত্ত্বেও তিনি তাতে তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি এই চিন্তায় বিভোর ছিলেন যে, খেলাফত তার বংশে চলে আসবে। তার সন্তান-সন্ততি বিশ্ব শাসন করবে। তাই তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

প্রথমে তিনি শিয়াদের উত্তেজিত করে শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে দাঙ্গা সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। কিন্তু শিয়ারা তার কথায় কর্ণপাত করলো না। তদুপরি তার অনুগত দাঙ্গাবাজ গ্রুপটি বন্দি হয়ে যাওয়ার পর তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন।

একটিবারের জন্যও তিনি ভেবে দেখেননি, এই হিংস্র জাতি মোঙ্গলরা যেদিকে ধাবিত হয়, ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হয়। তাদের আক্রমণ আগুনের চেয়ে ভয়াবহ। আগুন যেমন শুষ্ক ও আদ্র বিবেচনা করে না, ঠিক তেমনি মোঙ্গলরা দোস্ত-দুশমনের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। রক্তের হোলি খেলাতেই তাদের আনন্দ। রক্তের নদী বইয়ে দেয়াতেই তাদের শান্তি। তদের এই গাদ্দারী, নিমকহারামী ও নির্মমতার কথা কেয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের অর্ধিকাংশ শাসনক্ষমতা হিংসা-বিদ্বেষ, নিমকহারামীদের গাদ্দারী ও ধোঁকাবাজির কারণে ধ্বংস হয়েছে। এতে শুধু ক্ষমতাসীনরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং হাজার হাজার নিষ্পাপ নিরপরাধ মুসলমান নির্মমভাবে শহীদ হয়েছে এবং ইসলামের জয়যাত্রা ব্যহত হয়েছে।

মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবনে আলকামী যে ব্যক্তিকে হালাকুখানের নিকট পাঠিয়েছিলেন, তিনি তার অপেক্ষায় রইলেন। এই ফাঁকে তিনি খলীফাকে মদপানে অভ্যস্ত করে তুললেন।

আব্বাসী খেলাফত যুগে আলেমরা নবীযকে (এক প্রকার পানীয়, যাতে খেজুর ভিজিয়ে রাখা হয় এবং তাতে নেশা ভাব হওয়ার পূর্বেই পান করা হয়) বৈধ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাই আহারের পর তা পানের প্রচলন শুরু হয়েছিলো। কিছু লোক মদপানেও অভ্যস্ত হয়েছিলো। তারা আঙ্গুরের খাঁটি মদ পান করতো। কিন্তু খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ মদপান করতেন না।

ইবনে আলকামী তাকে মদপানে উৎসাহিত করলেন। বললেন, মদ তো আঙ্গুরের রস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এ রসটুকু তাজা নয়- বাসি। তাজা আর বাসিতে আবার পার্থক্য কী? দুষ্টমতি ইবনে আলকামী খলীফাকে মদপানে প্রস্তুত

করার জন্য বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদকে সিরকা বানিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং এটা বৈধ। আঙ্গুরের রস মনে অপূর্ব আনন্দ আনয়ন করে। সুতরাং তা বাসি ব্যবহার করাতে ক্ষতি নেই।

ইবনে আলকামীর মাথায় শয়তানের হাজার প্যাঁচ। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ সেই প্যাঁচে জড়িয়ে গেলেন। আলেমদের জিজ্ঞেস না করেই তিনি মদপান শুরু করে দিলেন। নির্বোধ খলীফা মদপান করে দিকদিশা হারিয়ে ফেললেন। ইবনে আলকামী চাইছিলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও পথের কাঁটা যেনো কেউ না থাকে।

এতোকিছু পেয়েও ইবনে আলকামীর সাধ মেটেনি। তিনি মোঙ্গলদের আহ্বান করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি তার প্রেরিত দূতের অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দূত এলো। কিন্তু ইবনে আলকামীর আশা নিরাশায় পরিণত হলো। হালাকুখান তার আহ্বানে সাড়া দেননি। বরং তিনি লিখে পাঠালেন যে, আরব ফৌজের যুদ্ধের কথা সর্বজনবিদিত। বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর আরব ফৌজ বিদ্যমান। তাদের উপস্থিতিতে বাগদাদ আক্রমণের অর্থ আত্মহত্যা বৈ কিছুই নয়।

হালাকুখানের উত্তর পেয়ে ইবনে আলকামীর মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়লো। বিড় বিড় করে বললেন, ভীরু কোথাকার! আচ্ছা, আমি তারও ব্যবস্থা করছি।

ইবনে আলকামী নতুন চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

বত্রিশ.

হালাকুখানের নিকট প্রেরিত ইবনে আলকামীর সেই দূতের নাম সুলাইমান। ইবনে আলকামীর তার উপর পূর্ণ আস্থা আছে। একদা ইবনে আলকামী তাকে নির্জনে ডেকে বললেন, সাবধান! কাউকে কিন্তু একথা বলবে না যে, তুমি তাতারীদের নিকট গিয়েছিলে।

সুলাইমান বললো, হুজুর! বলতে হবে না। আমি বুঝি। আমার নাম সুলাইমান। ওষ্ঠে প্রাণ থাকতেও কেউ কখনো জানতে পারবে না, আমি কাদের নিকট গিয়েছিলাম, কেনো গিয়েছিলাম।

ইবনে আলকামী আহ্লাদে আটখানা। বললেন, শাবাশ, তুমি দারুণ বুদ্ধিমান। তুমি মনে হয় জানো না, আমি কী মহৎ চিন্তা করছি।

সুলাইমান বিনীত কণ্ঠে বললো, হুজুর! আপনার সেই মহৎ চিন্তাটি জানলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।

ইবনে আলকামী বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো, আলাবীরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে আব্বাসীয়রা গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়।

সুলাইমান বললো, হুজুর! এ কাহিনী তো জানি। এটা সেই সময়কার ঘটনা, যখন উমাইয়ারা খেলাফতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলো।

ইবনে আলকামী বললেন, হ্যাঁ, তখন মারওয়ান ছিলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা। সেটা ১৩২ সালের ঘটনা। সে সময় আব্বাসী এবং আলাবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। উমাইয়া খলীফারা সরল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তারা আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্র ও কৌশল বুঝতে পারেননি। ফলে মারওয়ান নিহত হন। বনী উমাইয়াদের খেলাফতের অবসান ঘটে। আর কূটকৌশলের বলে আব্বাসীয়রা খেলাফতের আসন দখল করে নেয়। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ সাফফাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু খেলাফতের প্রকৃত হকদার আলাবীরা তাদের হক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো।

ইবনে আলকামী প্রাচীন ইতিহাসের একটি ঝলক সুলাইমানের সামনে তুলে ধরলেন। তার মন-মস্তিষ্ককে নিজের চিন্তা-চেতনায় গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, বনু হাশেম তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো।

হাশেমীদের মাঝে দু'টি দল শক্তিশালী ছিলো। একদল হযরত আলী (রা.)-এর সন্তানরা। তাদের আলাবী বলা হয়। দ্বিতীয় দল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তানরা। তাদের আব্বাসী বলা হয়। এ উভয় দল আহলে বাইতের মাঝে পরিগণিত।

আলাবীদের মাঝেও দু'দল। একদল হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সন্তানরা। তাদের যায়দী বলা হয়। অন্যদের ফাতেমী বলা হয়। এই আলাবীদের এক গ্রুপকে ইসমাঈলীও বলা হয়। এই দলটি হযরত ইসমাইল ইবনে জাফর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলো। তাই তাদের ইসমাঈলী বলা হয়।

মোটকথা, বনু হাশেম ছাড়া সকল দল এ বিষয়ে একমত হলো যে, বনী উমাইয়াদের শাসনক্ষমতা শেষ করে কোনো আলাবীকে খলীফা বানানো হবে। আন্দোলন চলতে লাগলো। ফলে আব্বাসীয়দের শক্তি বেড়ে গেলো। সবশেষে উমাইয়া খলীফা নিহত হলেন এবং বনী উমাইয়াদের শাসনের অবসান ঘটলো।

কিন্তু ঘাপটি মেরে থাকা ধুরন্ধর আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ সাফফাহ খেলাফতের দণ্ডমুণ্ড আকড়ে ধরলো। আলাবীদের স্থলে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো। আলাবীদের ধারণা ছিলো, আব্বসীয়রা খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে। আসলে প্রকৃত ঘটনা হলো, সবাই আলাবীদের ব্যবহার করতো। কারণ, তাদের নামে সবাই নত হয়। সবাই সহমর্মী হয়। ইবনে আলকামীও এই একই চিন্তা করলেন। আলাবীদের নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ জনগণের সহমর্মিতা হাসিলের ফন্দি আঁটলেন।

সুলাইমান বললো, তাই তো, এ জন্যই তো আমার খান্দানের লোকেরা আব্বাসীয়দের বিরোধিতা করে আসছে।

ইবনে আলকামী বললেন, আমিও তো আব্বাসীয়দের বিরোধী। তাদের ধ্বংসই আমার চিন্তা-আমার সাধনা। তাদের বিলুপ্তিই আমার মনের বাসনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি আলাবীদের হুকুমত কায়েম করতে পারলাম না। আজও আলাবীরা তাদের হক ফিরে পেলো না। শোনো সুলাইমান! যতোদিন পর্যন্ত আব্বাসীয় খলীফা থাকবে, আব্বাসীয় খেলাফত থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত আলাবীরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে না। তারা বঞ্চিতই থেকে যাবে। তাই আমি তাতারীদের বাগদাদ আক্রমণে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা এলে আব্বাসীয়দের শক্তি ভেঙে পড়বে। আলাবীদের রাজত্ব কায়েম হবে। কিন্তু তাতারীরা দারুণ ভীরু। আরবদের তারা যমের মতো ভয় করে। আচ্ছা, তুমি কি তাদের সিপাইদের দেখেছো? তারা দেখতে কেমন?

সুলাইমান বললো, হুজুর! তাদের কথা বলবেন না। দেখতে তারা কী ভীষণ, ভয়ানক। একেবারে হিংস্র পশু। শিক্ষা-সভ্যতা, মানবতা বলতে কিছুই বোঝে না। খুনী, রক্তপিপাসু, দয়া-মায়া-হৃদ্যতা বলতে তাদের মাঝে কিছুই নেই। হত্যা-ধ্বংসই তাদের নেশা ও পেশা। হুজুর! এসব হিংস্র পশুদের বাগদাদ আক্রমণে আমন্ত্রণ করবেন না। তারা বাগদাদ আক্রমণ করলে বাগদাদে রক্তের নদী প্রবাহিত করবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ইবনে আলকামী বললেন, নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তাদের এমন করতে দেবো না। আমি তাদের শুধু আব্বাসীয়দের শক্তি চূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারা ধন-দৌলতের পূজারী আর খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ হাড়ে হাড়ে কিপটে। এক নম্বর কঞ্জুস। সে বহু সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে। তার থেকে সে সম্পদ ছিনিয়ে তাতারীদের দিয়ে দেবো, তারা ফিরে যাবে। তারপর আমরা আলাবী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবো।

সুলাইমান বললো, কিন্তু আমার মনে হয়, তারা একবার বাগদাদ পদানত করতে পারলে আর ফিরে যাবে না। বিজয় হাতের মুঠোয় আসার পর কি কেউ তা ফেলে চলে যায়?

ইবনে আলকামী বললেন, আমি তাদের সাথে আগেই সব ফয়সালা চূড়ান্ত করে নেবো। আচ্ছা বলো তো, তাতারীদর উজীরে আজম কে?

সুলাইমান বললো, তাদের উজীরে আজমের নাম নাসীরুদ্দীন তুসী।

ইবনে আলকামী বললেন, তিনি কি সেই নাসিরুদ্দীন তুসি, যিনি আলাবীদের ঘোর সমর্থক ছিলেন?

সুলাইমান বললো, হ্যাঁ।

ইবনে আলকামী বললেন, আচ্ছা... এতোক্ষণে বুঝেছি কেনো হালাকু খান এমন কাপুরুষের মতো উত্তর দিয়েছেন। এখন সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আমি নাসিরুদ্দীন তুসিকে ভালোভাবে চিনি। আর তিনিও আমাকে চেনেন। এক সময় সে আমাকে আলাবীদের সমর্থন করার জন্য খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। এখন আমি তার নিকট পত্র লিখবো। আমি আব্বাসীদের খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে আলাবীদের খেলাফত কায়েম করতে চাই। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। হালাকুখানকে বাগদাদ আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর তিনি যখন হালাকুখানের সাথে বাগদাদ আসবেন, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের নিরাশ না হওয়াই উচিত।

অত্যন্ত নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে ইবনে আলকামী সুলাইমানকে কথাগুলো বলতে লাগলেন। নাসীরুদ্দীন তুসীর নাম শুনে যেনো ইবনে আলকামী আশার ঝলক দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, সুলাইমান!

ঃ আজ্ঞে হুজুর।

ঃ তোমাকে আরেকবার খোরাসান যেতে হবে।

ঃ হুজুর! আমি ঐ বন্য তাতারীদের দারুণ ভয় করি। তারা মরুর হিংস্র মানুষ। নিজেদের ভাষা ছাড়া কারো কথা বোঝে না। আর না বুঝলেই ক্ষেপে আগুন হয়ে তরবারীর এক আঘাতে কেচ্ছা খতম করে দেয়। মাফ চাই হুজুর! আমাকে আর ওখানে পাঠাবেন না।

ইবনে আলকামীর কণ্ঠচিরে বিদ্রূপের হাসি ঝরে পড়লো। বললেন, তোমার আবার ভয় কিসের? তুমি দূত। দূতদের কোনো কষ্ট দেয়া হয় না।

ঃ কিন্তু আপনি তো সভ্য মানুষের কথা বলছেন। তারা তো অসভ্য, অশিক্ষিত, হিংস্র জাতি। তারা যাকে চেনে না, তাকেই গুপ্তচর মনে করে। আমি দারুণ ভয় করি, পাছে তারা আমাকে গুপ্তচর মনে করে কিনা। কারণ, গুপ্তচরদের তারা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারে। আমাকেও যদি তারা তা-ই করে!

ঃ তুমি কোনো ভয় করবে না। নাসীরুদ্দীন তুসী সেখানে আছে। সোজা তার কাছে চলে যাবে। সে-ই তোমাকে রক্ষা করবে।

ঃ উজীরে আজম পর্যন্ত পৌঁছা চাট্টিখানি কথা নয়। আমি যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম, তখন সেই বন্যপশুরা আমাকে গ্রেফতার করলো। ভাগ্যক্রমে তাদের মাঝে তখন এক ব্যক্তি ছিলো, সে আমার কথা বুঝলো। সে তাদের বুঝালো, আমি একজন দূত। হালাকুখানের নিকট এসেছি। সে বহু কষ্টে সেই পশুদের বিষয়টি বুঝালো এবং আমাকে হালাকুখানের নিকট পৌঁছে দিলো।

হালাকুখান দোভাষীর মাধ্যমে আমার সাথে কথা বললেন এবং আপনার পত্র পাঠ করে শোনালেন। সেদিন ভাগ্যক্রমে আমি রক্ষা পেয়েছি। তা না হলে সেদিনই আমার জীবনের ইতি টানা হতো।

ঃ প্রথমবার গিয়েছিলে বলে কেউ তোমাকে চেনেনি। তাই কিছুটা সমস্যা হয়েছিলো। এখন লোকেরা তোমাকে চিনে ফেলেছে। এখন আর কিছু হবে না। ভয় পেয়ো না। বীর পুরুষ কখনো ভয় পায় না।

সুলাইমান নীরব হয়ে গেলো। ইবনে আলকামী বললেন, যাও তৈরি হয়ে এসো। আমি এখনই চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি রাতেই রওনা হয়ে যাও।

ঃ কিন্তু হুজুর! আমার উট অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ঃ সে চিন্তা করো না। তোমাকে একটি অত্যন্ত তেজী ও হৃষ্টপুষ্ট উট দেয়া হবে। আর পাথেয় হিসেবে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে যাবে।

ইবনে আলকামী স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে সুলাইমানের হাতে তুলে দিলেন। স্বর্ণমুদ্রার থলে দেখে সুলাইমানের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেলো। সে সফরের জন্য তৈরি হতে চলে গেলো।

ইবনে আলকামী হালাকুখানের নিকট লিখেন–

'আপনি কোনো সন্দেহে নিপতিত হবেন না। আরবরা ভোগবিলাসে আকণ্ঠ ডুবে আছে। তারা তাদের সেই বীরত্ব ও সাহসিকতা হারিয়ে একেবারে ভেড়া হয়ে গেছে। আপনার প্রেরিত অল্পকিছু সৈন্যই ইরাক ও বাগদাদ জয় করতে পারবে। এটাই মোক্ষম সময়। সুতরাং দেরি করবেন না, এখনই আক্রমণ করুন।'

ইবনে আলকামী আরেকটি চিঠি উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট লিখলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর লিখলেন–

'আমি আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করে আলাবী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আপনি হালাকুখানকে উদ্বুদ্ধ করুন। ধন-সম্পদ ও বিজয় আপনার অপেক্ষা করছে।'

অত্যন্ত গোপনভাবে বেশ সতর্কতার সাথে ইবনে আলকামী চিঠি দু'টি লিখে সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়ে কিছু জরুরি কথা বললেন। তারপর রাতের অন্ধকারে সুইলায়মানকে বিদায় জানালেন।

ইবনে আলকামীর দিন-রাত অধীর অপেক্ষায় কাটছে। সুলাইমানের অপেক্ষায় তিনি অস্থির সময় কাটাচ্ছেন। তার বিশ্বাস, নাসীরুদ্দীন তুসী হালাকুখানকে অবশ্যই রাজি করিয়ে নেবে।

এদিকে শাহজাদা আবুবকর ফেরদাউসকে বিয়ে করার কারণে ইবনে আলকামীর অন্তরের ক্ষোভ আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। কারণ, তিনি

আন্তরিকভাবে কামনা করছিলেন, শাহজাদার সাথে হাজেরার বিয়ে হবে। যদিও তার এই সিদ্ধান্তে ছেদ পড়েছিলো; কিন্তু যখন আবুবকর শফীক ও তার ইয়ার-বন্ধুদের গ্রেফতার করেছিলো, তখন থেকে তিনি তার একেবারে দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আবুবকরের এই বিয়ে ইবনে আলকামীর নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হলো। মুখ ফুটে তিনি কাউকে কিছু বললেন না বটে; কিন্তু প্রতিশোধের আগুন তার মাথায় চড়ে বসলো।

হাজেরা আগের মতোই শাহী মহলে যাতায়াত করছে। ফেরদাউসের সাথে তার দারুণ আন্তরিকতা ও সখ্য সৃষ্টি হলো।

আহমদ আবুল কাসেম হাজেরাকে ভালোবাসতো। হাজেরাও তাকে পছন্দ করতো। নাজমার সাথে হাজেরার গভীর সখ্য ছিলো। তাই সে প্রায়ই নাজমার মহলে আসতো এবং সেখানে আহমদের সাথে তার কথাবার্তা ও রহস্যময় দৃষ্টি বিনিময় হতো।

হাজেরার রূপ ও গঠন-প্রকৃতি তো মনোমুদ্ধকর বটেই, তার কণ্ঠও অত্যন্ত মধুর। সবাই তার সঙ্গীতে বিমুগ্ধ-বিমোহিত হতো। নাচে ছিলো সে দারুণ পটিয়সী। একদিন সে নাজমার প্রাসাদে গেলো। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ডুবি ডুবি করছে। আকাশজুড়ে ছড়িয়ে আছে রক্তিম লালিমা। ঝিরঝিরে বাতাসও বইছিলো। নাজমা ফেরদাউস এবং আরো কয়েকজন শাহজাদীর সঙ্গে বসে গল্প করছিলো। হাজেরাকে পেয়েই তারা আনন্দিত হয়ে ওঠলো। একজন বললো, এখন একটি শূন্যতা পূর্ণ হলো।

হাজেরা হাসতে হাসতে এসে বসে বললো, কীভাবে পূরণ হলো?

শাহজাদী বললো, আজ নাচ হবে। সবাই নাচে অংশগ্রহণ করবে; কিন্তু একজনের অভাব ছিলো। এখন তা পূরণ হলো।

হাজেরা বললো, আচ্ছা, তাহলে শুরু করা যাক। সবাই পায়ে নুপূর-ঘুঙুর পরে নিলো। দাসিরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এলো। সুরের ঝংকার উত্থিত হলো। সুরের তালে তালে নাচ শুরু হলো। নাচের সাথে গান। সবাই নাচে-গানে পারদর্শী। তাই এক ভিন্ন জগত, এক ভিন্ন ভূষণ যেনো ধূলির ধরায় নেমে এলো। সুরের তালে তালে নাচের রং-রসে সবাই বিমুগ্ধ আত্মহারা।

হঠাৎ আহমদ আবুল কাসেম এসে উপস্থিত। সে আশংকা বোধ করলো, হয়তো তার উপস্থিতির কারণে নাচ-গান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সে সম্মুখস্ত কামরায় গিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। তার চোখে হাজেরা আজ অন্য হাজেরা হয়ে ধরা দিলো। তাকে একেবারে ডানাকাটা পরী মনে হতে

লাগলো। সে অত্যন্ত আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গিতে নাচছিলো। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। নাচ বন্ধ করে বললো, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম করে আসছি।

নাজমা বললো, তোমার নাচ আজ দারুণ আকর্ষণীয় ও মনোহারী হয়েছে। তাই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। যাও সামনের কামরায় গিয়ে বিশ্রাম করে নাও।

হাজেরা সে কামরায় গিয়ে ঘটনাক্রমে ঐ সোফায় গিয়ে বসলো, যার পশ্চাতে আহমদ লুকিয়ে ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ হাজেরা দীর্ঘশ্বাস নিলো। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে সে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তার দৃষ্টি কামরার ছাদে আটকে আছে।

আহমদ আবুল কাসেম একটি ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিলো। সেই তোড়া থেকে একটি ফুল নিয়ে হাজেরার কোমল কপোলে স্পর্শ করলো। হাজেরা শুয়েই রইলো। হাত দিয়ে যেনো মাছি তাড়ালো।

এবার আহমদ তার কপোলে ফুলটি রেখে দ্রুত হাত টেনে নিলো। হাজেরা ফিরে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। হাজেরা আবার শুয়ে পড়লো। আহমদ আবার তার কপোলে ফুলের স্পর্শ করলো। এবার হাজেরা ফুলের সুগন্ধি অনুভব করলো। চোখের পলকে সে হাত মেরে ফুলটি নিয়ে নিলো।

হাজেরা দারুণ বিস্মিত হলো যে, সোফার পশ্চাতে আহমদ লুকিয়ে আছে। বললো, আচ্ছা তুমি! আহমদ উঠে সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, হ্যাঁ আমি। হাজেরা আজ তুমি নেচে-গেয়ে পরীদেরও পরাজিত করে দিয়েছো।

হাজেরা মৃদু হেসে বললো, শুকরিয়া। কিন্তু তুমি চোরের মতো লুকিয়েছিলে কেনো?

আহমদ বললো, আমি আশংকা করছিলাম, হয়তো তোমরা আমাকে দেখে নাচ-গান বন্ধ করে দেবে। তবে শোন হাজেরা! আজকে তোমাকে একটা কিছু বলতেই হবে।

ঃ বলো কী বলতে হবে?

ঃ বলতে চাই; কিন্তু পারছি না। তোমার অনুপম সৌন্দর্য ও মোহময় রূপলাবণ্য আমার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয়।

ঃ ভনিতা ছাড়ো। বসো, যা বলবে বলো।

আমহদ তার পরীদেহ ঘেঁষে বসলো। হাজেরা চেপে এলো। আহমদ বললো, এই তো তুমি দূরে সরে যাচ্ছো।

ঃ কই, কোথায় দূরে সরে যাচ্ছি! যা বলতে চাও, বলে ফেলো।

ঃ হাজেরা! তোমার ভালোবাসা আমার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এখন আর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী হয়ে যাও।

হাজেরা লজ্জায় মাথানত করে অস্ফুটকণ্ঠে বললো, আব্বুকে গিয়ে বলো। লজ্জায় তার মাথা অবনমিত হয়ে গেলো। দৃষ্টি স্থির হয়ে মাটিতে লেগে রইলো। হঠাৎ তার মনে হলো, কে যেনো আসছে। বললো, এই কে যেনো আসছে!

আহমদ ঘাবড়ে গেলো। এক লাফে অন্য কামরায় গিয়ে লুকালো। হাজেরা তার অবস্থা দেখে হাসতে লাগলো। অল্পক্ষণ পরই নাজমা এলো। বললো, বিশ্রাম হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বেশ। কিন্তু তুমি নববধূর মতো লজ্জায় জড়সড় হয়ে বসে আছো কেনো?

ঃ আবার তুমি দুষ্টুমি শুরু করলে।

নাজমা তার পাশে এসে বসলো। বললো, একটি কথা বলবে হাজেরা?

ঃ জিজ্ঞেস করো।

ঃ ভাইজান তো তোমার প্রেমে মজে আছে...।

হাজেরার চোখে রহস্যময় দৃষ্টি। নাজমা বললো, আমি শুধু এতোটুকু জানতে চাই যে, তুমি আহমদকে পছন্দ করো কিনা?

হাজেরা দুষ্টুমি করে বললো, না।

ঃ তোমার এই 'না' শব্দটির মাঝেই স্বীকারোক্তি বিদ্যমান। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তুমি তাকে মহব্বত করো।

ঃ জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে বুঝি?

ঃ নারীর চোখের দৃষ্টি আমি খুব ভালোভাবে চিনি। আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই তোমার প্রেমের মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছি। এখন তোমাদের বিয়ের পয়গাম দেয়া হবে।

হঠাৎ ফেরদাউস সেখানে এসে উপস্থিত হলো। বললো, কার বিয়ের পয়গাম দেয়া হবে?

নাজমা ফিরে ফেরদাউসের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাই আহমদের।

ফেরদাউস বললো, প্রথমে আহমদকে জিজ্ঞেস করো, সে তাকে পছন্দ করে কিনা?

হাজেরা বললো, আবুবকর তো তাকে পছন্দ করে না।

ফেরদাউস খিল খিল করে হেসে ওঠলো। বললো, হয়ত আহমদ তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। এ জন্য তার দেমাগ আরশে ওঠে আছে।

হাজেরা লজ্জায় নীরব হয়ে রইলো। অন্যান্য শাহজাদীরাও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারপর অন্য কথা শুরু হলো। হাজেরা বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। এসে দেখলো, তার পিতা ক্রুদ্ধ। বললো, আব্বাজান! কী হয়েছে? আপনি কার উপর ক্ষুব্ধ হলেন?

ইবনে আলকামী বললেন, না, তেমন কিছু নয়।

হাজেরা সেখান থেকে চলে গেলো।

ইবনে আলকামীর ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ, সুলাইমান খোরাসান থেকে ফিরে এসেছে। সে বলেছে, তাতারীদের উপর আরবদের ভীতি এতো প্রচণ্ড যে, তারা ইরাক আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না। তিনি হালাকুখান ও নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট পত্র দিয়েছিলেন। উত্তরে হালাকুখান লিখেছেন–

'ইরাকের মুসলিম জনগণ আব্বাসী খলীফাকে শ্রদ্ধা করে। খলীফার নিকট অনেক সৈন্য রয়েছে। এ অবস্থায় আক্রমণ করা মানে নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করা। যদি তুমি ইরাককে সৈন্যমুক্ত করতে পারো, তাহলে ভেবে দেখবো।'

আর নাসীরুদ্দীন তুসী লিখেছেন–

'হালাকুখান অত্যন্ত সতর্ক মানুষ। আরবদের খুব ভয় পান। যদি তুমি সত্যিই আলাবী হুকুমত কায়েম করতে চাও, তাহলে সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দাও আর এমন কোনো কৌশল আবিষ্কার করো, যার কারণে জনগণ খেলাফতের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে আমি হালাকুখানকে হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করবো। আর তখন তিনি অবশ্যই আক্রমণ করবেন।'

ইবনে আলকামীর বিস্ময়ের সীমা রইলো না যে, হালাকুখান আরব যোদ্ধাদের এতো ভয় করেন কেনো! তিনি ইরাক আক্রমণ করতে মোটেই সাহস পাচ্ছেন না। অত্যন্ত ভীতু তো লোকটি। কিন্তু সবকিছুর পরও খেলাফতকে ধ্বংস করতেই হবে। হ্যাঁ, সব পথই পরিষ্কার করে দেবো। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ এবং অবাধ্য শিয়া ও সুন্নীদের থেকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। তার চোখ দিয়ে হিংসাত্মক বিদ্বেষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগলো। কিছুক্ষণের জন্য তার চেহারা পিশাচের আকার ধারণ করলো।

তেত্রিশ.

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ। নির্বোধ, আদূরদর্শী, ইন্দ্রীয়পূজারী এক শাসক। ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থাকাই তার কাজ। তার এই চরিত্রের সাথে আরেকটি ধ্বংসাত্মক নেশা যোগ করলো উজীরে আজম ইবনে আলকামী। তাহলো, মদ্যপান। ফলে ছিটেফোটা যে বুদ্ধিটুকু তার মাথায় ছিলো, তাও নিঃশেষ হয়ে গেলো। এখন তিনি মদপান করে দিন-রাত নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এখন মদের আসরে রূপায়িত হলো। তার সাথে চলে উদ্ভিন্ন-যৌবনা রূপসী দাসিদের উন্মাতাল নাচ আর গান।

আগেও রাজ্য পরিচালনার সাথে তার তেমন সম্পর্ক ছিলো না। এখনো নেই।

এখন দিন-রাত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার কারণে মাথায় এই চিন্তাটুকুও উদয় হয় না যে, তিনি কে? কী করছেন? কী তার করা উচিত?

তাই এখন ইবনে আলকামী শুধু উজীরে আজমই নন; বরং কার্যত তিনি-ই এখন খলীফা। তাকে জিজ্ঞেস করার বা বাধাদানের এখন আর কেউ নেই। আবুবকর ও অন্যান্য শাহজাদাদের প্রভাবের কথা তার মনে আছে। তবে তিনি এ কথা ভালোভাবেই জানেন, যতোদিন পর্যন্ত খলীফা আছেন, তারা তার কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর খলীফা তো এখন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকেন।

ইবনে আলকামীর এখন সময় এসেছে, ইচ্ছে করলেই মুহূর্তে শফিক ও তার সাথীদের মুক্ত করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাদের উপর এই কারণে ক্ষুব্ধ যে, লাখ লাখ দেরহাম-দিনার ব্যয় করা সত্ত্বেও তারা কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তিনি তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারেননি। তাই তিনি তাদের মুক্ত করে আনলেন না। এখন তার দৃষ্টি হালাকুখানের দিকে। তিনি চান, দেশে এমন ধ্বংসলীলা নেমে আসুক, যার কারণে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। ইরাকের সুন্নী-শিয়া সবাই চরম শিক্ষা পাবে।

ইবনে আলকামী জানেন, খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ হাড়কিপটে। ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করতে তিনি বেশ পারদর্শী। তাই তার এই প্রবণতাকে পুঁজি করেই আগ্রসর হতে হবে এবং সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে।

একদিন তিনি খলীফার নিকট গেলেন। খলীফা তখন মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু। তবে কথা বলার মতো জ্ঞান তার আছে। ইবনে আলকামী এদিক-সেদিকের কিছু আলোচনা করে বললেন, মহামহিম খলীফা মহোদয়কে আল্লাহ এতো প্রভাব দিয়েছেন যে, নিকট ও দূরবর্তী সকল শাসক আপনার ভয়ে কম্পমান। আনুগত্য প্রকাশ করে সর্বদা তারা আপনার নিকট মহামূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করছে।

ঃ হ্যাঁ, আমিও জানি, আমার প্রভাব সুদূর বিস্তৃত।

ঃ ইতিহাসে আপনার মতো খুব কম খলীফাই বিগত হয়েছেন, যার প্রভাব-প্রতিপত্তি দূরদিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও আমি জানি।

ঃ কিন্তু কিছু রাষ্ট্রীয় খরচ এমন আছে, যদি তা কমিয়ে দেয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ তাতে খেলাফতের কোনো ক্ষতি হবে না।

খলীফা এবার ইবনে আলকামীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মুগ্ধতায় ভরা সে দৃষ্টি। দেখলেন, ইবনে আলকামী অতি আদবের সাথে শির নত করে বসে আছেন।

বললেন, আচ্ছা, তুমি তো একটা চমৎকার কথা বললে! আগে কেনো এমন কথা বলোনি?

ঃ আমি চিন্তা করছিলাম। দীর্ঘদিন চিন্তার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রাষ্ট্রীয় খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব। তাহলে কোষাগার দৌলতে ভরপুর হয়ে যাবে।

ঃ বলো, সেটা রাষ্ট্রের কোন্ খরচ।

ইবনে আলকামী আমতা আমতা করে বললেন, ফৌজের এই যে বিশাল খরচ হচ্ছে। হাজার হাজার সিপাই আর অফিসাররা কোনো কাজ-কর্ম ছাড়াই মাসে মাসে বিপুল সম্পদ ব্যয় করছে। অথচ বছরের পর বছর কোনোই যুদ্ধ হচ্ছে না। আর তা হওয়ার সম্ভাবনাও অতি ক্ষীণ। তাহলে কেনো হাজার হাজার ফৌজ ও অফিসারদের পেছনে এই লাখ লাখ দিনার ব্যয় করবো আমার বুঝে আসে না।

খলীফার মাথা বিজ্ঞ দার্শনিকের ন্যায় নড়ে ওঠলো। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি সত্যই বলেছো। এই বিপুল সম্পদ আমরা অযথা ব্যয় করছি। এর তো কোনোই যৌক্তিকতা নেই!

ঃ শুধু এতো পরিমাণ ফৌজের প্রয়োজন, যারা মহামহিম খলীফা, শাহজাদা ও শাহজাদীদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। আর শহরকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্যও কিছু ফৌজ আবশ্যক। বাকি যারা সেনা ছাউনীতে পড়ে পড়ে মেদবহুল হয়ে গেছে, যারা বসে বসে শুধু খেলাফতের সম্পদ নষ্ট করছে, তাদের চাকুরিচ্যুত করা দরকার।

ঃ আচ্ছা, ঐসব সিপাই ও অফিসারদের চাকরিচ্যুত করলে কী পরিমাণ সম্পদ সাশ্রয় হবে?

ইবনে আলকামীর চেহারায় চিন্তার ভাব ফুটে ওঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, বছরে কমপক্ষে এক কোটি দিনার।

বিস্ময়বিমূঢ় খলীফার চোখ বিস্ফারিত হলো। বললেন, তাহলে তো এই বিপুল সম্পদ একেবারেই অনর্থক খরচ হচ্ছে!

ঃ আমারও তো এমনই মনে হচ্ছে।

ঃ আহ্ কি ভুলই না করে আসছিলাম! আর দেরি নয়– আজই তুমি ফৌজের সংখ্যা কমিয়ে দাও।

ঃ তবে...।

ঃ তবে কী?

ঃ হয়তো যুবরাজ ও অন্যান্য শাহজাদারা এটা পছন্দ করবে না।

ঃ তারা কি এতোই নির্বোধ যে, এই মহৎ কাজেও বিরোধিতা করবে?

ঃ তারা এখনো অবুঝ। না বুঝে বিরোধিতা করেও বসতে পারে এবং অবশেষ

মহামহিম খলীফার নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও পেশ করতে পারে।

ঃ আমি তাদের কোনো কথা শুনবো না। তুমি আমাদের কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্খী। তুমি নিশ্চিন্তে ফৌজের সংখ্যা কমিয়ে দাও।

ঃ তাহলে মহামহিম খলীফা একটি ফরমান লিখে দিন। আমি তা শাহজাদাদের দেখাতে পারবো।

ঃ আচ্ছা দিচ্ছি। খলীফা তার সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন, উজীরে আজমের নামে এখনই একটি ফরমান লিখে দাও; সে যেনো ফৌজের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

সেক্রেটারী ফরমান লিখে শাহী মহর লাগিয়ে দিলো। খলীফা তাতে স্বাক্ষর করে উজীরে আজমের হাতে অপর্ণ করলেন।

ইবনে আলকামীর মাথায় হঠাৎ এক আজব চিন্তা এলো। বললেন, মহামহিম খলীফা! আরেকটি কথা বলতে চাই।

ঃ বলো।

ইবনে আলকামী চার পাশে চোখ বুলিয়ে একান্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন, যেসব ফৌজ থেকে যাবে, তাদের বেতনও শাহী কোষাগার থেকে না দেয়া সম্ভব। তাতেও পঁচিশ লাখ দিনার বেঁচে যাবে।

বিমোহিত খলীফা বললেন, আচ্ছা, তাহলে কারা তাদের বেতন দেবে?

ঃ বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর কোনো কর ধার্য নেই। ফৌজদের কমান্ডারকে এ নির্দেশ দেয়া হোক, সে যেনো ব্যবসায়ীদের থেকে কর তুলে তা দ্বারা ফৌজের বেতনের ব্যবস্থা করে।

একথা শুনে খলীফা যারপরনাই আনন্দিত হলেন। বললেন, আজ আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে, তুমি খেলাফতের জন্য কতো নিবেদিতপ্রাণ। তুমি কতো মূল্যবান চিন্তা করেছো যে, আমাদের এখন আর ফৌজের কোনো খরচই বহন করতে হবে না।

ঃ না না মহামহিম খলীফা! আমি তেমন আর কী খেদমত করতে পারলাম। তবে আমর বিশ্বাস, বাজারে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে কর পরিশোধ করবে।

ঃ ঠিক বলেছো। তাছাড়া ফৌজের বেতন পরিশোধ করে কিছু বেঁচেও যেতে পারে।

ঃ আমারও সেই একই ধারণা। যদি সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কর তোলা হয়, তাহলে তা দিয়ে ফৌজের বেতন দিয়ে শাহী প্রাসাদের খরচও চলে যাবে।

ঃ তা হলে তো বেশ ভালোই হবে। আফসোস, এতোদিন এদিকে আমার খেয়ালই যায়নি।

ঃ আমি দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনা করে এ বিষয়টি আবিষ্কার করেছি। আমি আজ গর্বিত যে, মহামহিম খলীফা আমার প্রস্তাবটি পছন্দ করেছেন।

ঃ আমারও আনন্দের বিষয় যে আমার উজীরে আজম অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী।

ঃ মহামহিম খলীফাকে সাহস প্রদানের জন্য শত শুকরিয়া। কিন্তু একটি বিষয় কেমন জানি লাগছে।

ঃ সেটা আবার কী?

ঃ বাজারের ব্যবসায়ীরা খুব আয় করছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরাও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। কিন্তু তারা যেহেতু কখনো এমন কর দেয়নি আর এতে তাদের লভ্যাংশ কিছুটা কমে যাবে, তাই কিছু হট্টগোলও হতে পারে, প্রতিবাদও উঠতে পারে।

ঃ তাদের কথা কে শুনবে?

ঃ হয়তো তারা মহামহিম খলীফার নিকটই আবেদন নিয়ে আসবে।

ঃ আমি কেনো তাদের কথা শুনতে যাবো?

ঃ তখন হয়তো তারা শাহজাদাদের নিকট ফরিয়াদ নিয়ে যাবে?

ঃ শাহজাদারা কী করবে?

ঃ তারা মহামহিম খলীফা নিকট ব্যবসায়ীদের আবেদন পেশ করবে। হতে পারে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও উত্থাপন করবে।

ঃ আচ্ছা করতে দাও। এ ব্যাপারে আমি তাদের কোনো কথায় কর্ণপাত করবো না।

ঃ মহামহিম খলীফা! বিষয়টি একটু চিন্তা করুন।

খলীফা বললেন, আমি তো ভেবে-চিন্তেই বলছি। তোমার দু'টো প্রস্তাবই চমৎকার। দেশের জন্য কল্যাণকর।

ঃ আমার ধারণা, ফৌজের সংখ্যা হ্রাসের কারণে বাজারের থেকে কর দ্বারাই তাদের বেতন হয়ে যাবে। অধিকন্তু বছরে প্রায় দেড় কোটি দিনার উদ্বৃত্ত থাকবে।

ঃ তাহলে তো বহু দিনার বেঁচে যাবে।

ঃ তাহলে মহামহিম খলীফার নিকট আবেদন, আপনি এ ফরমানটিও লিখে দিন।

খলীফার নির্দেশে তার সেক্রেটারী ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায়ের ফরমান লিখে দিলো। এভাবেই দুরাচার ইবনে আলকামী নির্বোধ খলীফা থেকে দু'টি বিষয়ের ফরমান লিখে নিলেন, যার কারণে খেলাফতের মূল শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে আর জনগণের রোষ গিয়ে পড়বে খলীফার উপর। নেমে আসবে আল্লাহর গজব।

চৌত্রিশ.

খলীফার আদেশনামা হাতে পেয়ে ইবনে আলকামী তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করলেন। যে সব সিপাই ও অফিসার দেশ-জাতি, খলীফা ও শাহজাদাদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে, ইবনে আলকামী বেছে বেছে তাদের বরখাস্ত করলেন।

এই ব্যাপক সেনা ছাটাইয়ের কারণে চারদিকে হাহাকার ছড়িয়ে পড়লো। যাদের চাকরি গেলো, তারা খলীফার দরবারে গিয়ে মিনতি করলো। কিন্তু খলীফার বোধোদয় হলো না। তিনি সিদ্ধান্তে অটল, অবিচল রইলেন। অগত্যা অনেকে বাধ্য হয়ে প্রিয় দেশ বাগদাদ ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে মিসর বা অন্য কোনো দেশ চলে গেলো।

অবশিষ্ট সৈন্যদের বেতন শাহী কোষাগার থেকে বন্ধ হয়ে গেলো। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেনো বাজারের ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায় করে নিজেদের বেতনের ব্যবস্থা করে। আর অবশিষ্ট দিনার শাহী প্রাসাদের প্রহরী প্রধানের নিকট জমা দেয়।

সৈনিকরা সাধারণত উগ্র মেজাজের হয়ে থাকে। তারা কর নির্ধারণ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করলো। বাজারের ব্যবসায়ী ও ফৌজের মাঝে তিক্ত ঘটনা ঘটতে লাগলো। উচ্চবাচ্য ও ঝগড়া-বিবাদ হতে লাগলো। ফলে ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে উজীরে আজম ইবনে আলকামীর সাথে সাক্ষাত করলো। ইবনে আলকামী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি সৈনিকদের বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু ইবনে আলকামী তার বিপরীত করলেন। ফৌজী অফিসারদের ডেকে বললেন, ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। কর আদায়ে বেশ গড়িমসি করে। তাদের সাথে কোনো নরম আচরণ চলবে না। যতো প্রয়োজন কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। তাহলে তাদের অন্তরে ফৌজ ও খেলাফতের প্রভাব দৃঢ় হবে।

উজীরে আজমের এই উস্কানীমূলক কথায় ফৌজের সদস্যরা নেকড়ের ন্যায় হিংস্র হয়ে গেলো। তারা আরো কঠোরতা অবলম্বন শুরু করলো। কারণে অকারণে ব্যবসায়ীদের নির্মম প্রহার ও নির্যাতন করতে লাগলো। ব্যবসায়ীরা আবার ইবনে আলকামীর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। ফৌজী সদস্যদের নিষ্ঠুরতার কথা বর্ণনা করলো। ইবনে আলকামী আফসোস করলেন। বললেন, আমি তো তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। আমি তাদেরকে শেষবারের মতো আরেকবার বলবো। আসল কথা হলো, ফৌজের লোকদের মেজাজ গরম। তাদের মাঝে ভদ্রতা কমই থাকে। তারা নিজেদেরকে যে কী ভাবে, তা তারা নিজেরাই জানে না। যদি তাদের কঠোরতার উত্তর কঠোরতা দ্বারা দেয়া হয়, তাহলে ঠিকই বুঝবে।

ইবনে আলকামী যেনো কৌশলে ব্যবসায়ীদেরকে ফৌজের লোকদের মোকাবেলা করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী বললো, আমরা কঠোরতার উত্তর কঠোরতা দ্বারা দিতে পারি। কিন্তু আমাদের ভয় হচ্ছে, পাছে প্রশাসন আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় কিনা।

ইবনে আলকামী বললেন, এর সাথে প্রশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মহামান্য খলীফাকে পরামর্শ দিয়েছি তিনি যেনো কর সংগ্রহে ফৌজের লোকদের নিয়োগ না করেন। কিন্তু তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। আমি জানতাম, ফৌজ গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। তারা ব্যবসায়ীদের অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। আর হচ্ছেও তাই।

ইবনে আলকামী এক তীরে দু'টি শিকার করতে চাইলেন। এক দিকে তিনি জনতাকে ফৌজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে উৎসাহিত করলেন, অন্য দিকে খলীফার সম্পর্কে মানুষের ধারণা খারাপ করে ফেললেন। এক ব্যবসায়ী নেতা বললো, খলীফার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ রয়েছে। তিনি তো কখনো এ ধরনের কর আরোপ করেননি। তাছাড়া যখন তিনি কর আরোপ করলেনই, ফৌজের লোকদের কেনো তা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন?

ইবনে আলকামী বললেন, আসল কথা হলো, এ কর আরোপ করাই অবৈধ। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জিভূত করার এক ভূত খলীফার মাথায় চেপেছে। তিনি এ কর থেকে ফৌজের বেতন প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। শুকরিয়া আদায় করো যে, তিনি ইতিমধ্যে ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছেন। যদি সকল ফৌজ থাকতো, তাহলে তো তোমাদের থেকে এতো বেশি কর নেয়া হতো যে, শেষ পর্যন্ত দোকান-পাট বিক্রি করতে হতো।

ব্যবসায়ীরা বললো, তাহলে আমরা একদিনের করও আদায় করতাম না। কিন্তু এই ফৌজদের থেকে আমরা এখন কীভাবে পরিত্রাণ পাবো?

ইবনে আলকামী বললেন, তোমরা জানো, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। কঠোরতা অবলম্বন করো। তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ীরা চলে গেলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, যদি ফৌজের লোকেরা কঠোরতা করে, তবে তারাও বসে থাকবে না। কঠোরতার উত্তর কঠোরতা দিয়েই দেবে। তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

প্রত্যেক দিনই কর সংগ্রহ করা হয়। আজও ফৌজের লোকেরা এলো। নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করলো। ফলে ব্যবসায়ীরা মোকাবেলা করতে এগিয়ে এলো। তারা কয়েকজন ফৌজকে ধরে প্রহার করলো। এতে সিপাইরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণ করলো। তালোয়ার সবার সাথেই ছিলো। ব্যবসায়ীরাও তালোয়ারের উত্তর তলোয়ার দিয়েই দিলো। বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হলো। কয়েকজন সিপাই আহত হলো। কয়েকজন ব্যবসায়ীও আহত হলো।

ঘটনাক্রমে আবুবকর সেখানে এসে উপস্থিত হলো। হাঙ্গামা দেখে সে বিচলিত হলো। তাকে দেখেই সিপাইরা তলোয়ার কোষবদ্ধ করে নিলো। ব্যবসায়ীরাও

থমকে দাঁড়ালো। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, সাধারণ জনগণ যুবরাজের উপর সন্তুষ্ট। যদিও খলীফা কিছু কাজের কারণে তার প্রতি রুষ্ট-ক্রোধান্বিত।

যুবরাজ আবুবকরের কণ্ঠে বিস্ময়। বললো, আমি এসব কী দেখছি? সৈনিক-জনতা লড়াই করছে! অথচ ফৌজের কাজ হলো জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা!

সেনা অফিসার এগিয়ে এলো। বললো, মাহমান্য যুবরাজ! আমরা কর আদায় করতে এসেছি। কিন্তু এরা কর না দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। আমাদের উপর আক্রমণ করেছে।

ব্যবসায়ী নেতা এগিয়ে এসে বললো, ফৌজী অফিসার ও ফৌজী লোকেরা যেনো হিংস্র পশু। কর আদায়ে এতো কঠোরতা, এতো রূঢ় ব্যবহার করে যে, ব্যবসায়ীরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।

আবুবকর বিস্মিত হয়ে বললো, ফৌজী অফিসার কর আদায় করে এ কেমন কথা?

এক ব্যবসায়ী বললো, তাই তো মাহমান্য যুবরাজ! আজ পর্যন্ত তো আমরা এমন দেখিনি।

আবুবকর ফৌজী অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কার নির্দেশে কর আদায় করছো?

অফিসার বললো, উজীরে আজমের নির্দেশে।

উজীরে আজমের নাম শুনেই বাজারের লোকেরা সচকিত হয়ে ওঠলো। আবুবকর বললো, তিনি তোমাদের কী নির্দেশ দিয়েছেন?

অফিসার বললো, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা প্রত্যহ কর আদায় করবো এবং তা ফৌজের বেতন খাতে খরচ করবো আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা শাহী প্রাসাদের প্রহরী প্রধানের হাতে অপর্ণ করবো।

আবুবকর বললো, দরুণ আশ্চর্যজনক কথা। কিন্তু তোমরা কর আদায়ের ব্যাপারে এতো কঠোরতা করছো কেনো?

অফিসার বললো, ব্যবসায়ীরা সহজে কর দিতে চায় না। গড়িমসি করে। আমাদেরকে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করে।

আবুবকর বললো, কঠোরতা করতে কে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছে?

অফিসার বললো, উজীরে আজম।

আবুবকর ব্যবসায়ীদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা কেনো কর আদায়ে গড়িমসি করো?

ব্যবসায়ী নেতা বললো, প্রথম কথা, এই কর অবৈধ। কখনো এমন কর ছিলো না। দ্বিতীয়ত, আমরা খেলাফতের নির্দেশ মানতে বাধ্য। কর দিতে প্রস্তুত। কিন্তু করের কোনো পরিমাণ নেই। যখন যা চায় তা-ই দিতে হবে। বিক্রি হোক বা না হোক প্রদান করতেই হবে। তাই ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেছে।

আবুবকর বললো, এই কর কি আগে আদায় হতো?

ব্যবসায়ী বললো, আদায় হওয়া তো দূরের কথা, এ ধরনের কর আগে ছিলোই না।

আবুবকরের কণ্ঠচিরে বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললো, কে এই কর আরোপ করেছে?

ব্যবসায়ী বললো, উজীরে আজম বলেছেন, খলীফা মহোদয় এই কর আরোপ করেছেন।

আবুবকর বললো, না খলীফা এধরনের কর আরোপ করতে পারেন না। আপনারা কি খলীফা মহোদয়ের নিকট কোনো ফরিয়াদ নিয়ে গিয়েছিলেন?

ব্যবসায়ী বললো, আমরা উজীরে আজমের নিকট গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, খলীফাকে তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও খলীফা এই কর আরোপ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, যদি ফৌজের লোকেরা কঠোরতা করে, তাহলে কঠোরতার উত্তর কঠোরতা দিয়েই দেবে।

অফিসার বললো, না এটা কখনো হতে পারে না। উজীরে আজম আমাদের বলেছেন, বাজারের ব্যবসায়ীরা খুব দুষ্ট। যদি তারা কর প্রদানে টাল-বাহানা করে, তাহলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে।

ব্যবসায়ী বললো, অথচ আমাদের বলেছেন, ফৌজের লোকেরা গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ। যদি তারা কঠোরতা করে, তা হলে কঠোরতার উত্তর কঠোরতা দ্বারা দেবে।

আবুবকর বললো, তা হলে নিশ্চয় এখানে ষড়যন্ত্র আছে। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাতে চায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তোমরা তার কথায় হাঙ্গামা শুরু করলে। শুনে রাখো! তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে হবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শহরের নিরাপত্তা শেষ হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ীরা বললো, আমরা কর প্রদানে প্রস্তুত। কিন্তু করের পরিমাণ নির্ধারিত হতে হবে এবং ফৌজ ছাড়া অন্য কাউকে এ কাজে নিয়োগ করতে হবে। আমরা তার নিকট কর আদায় করবো।

আবুবকর বললো, তোমাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত। আমি তা খলীফার নিকট উপস্থাপন করবো। তারপর সে ফৌজের লোকদের বুঝিয়ে দিলো, তারা সেখান থেকে চলে গেলো। বাজারে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে এলো।

পঁয়ত্রিশ.

ব্যবসায়ী ও ফৌজী লোকদের এই দাঙ্গা দেখে আবুবকরের দৃঢ় বিশ্বস হলো, ইবনে আলকামী অন্য কৌশলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। প্রথমে সে শিয়া-সুন্নীদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগানোর চেষ্ট করেছিলো। কিন্তু তাতে সফল হয়নি। এখন ফৌজ ও ব্যবসায়ীদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সে অনেক চিন্তা করলো, এর পাশ্চাতে ইবনে আলকামীর আসল উদ্দেশ্য কী? কিন্তু কিছুই বুঝলো না। সে শুনেছে সিপাইদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু কী পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে, তা তার জানা ছিলো না। তাই স্থির করলো, সেনা ক্যাম্পে গিয়ে বিষয়টি জানতে হবে।

বাজার থেকেই সে সোজা ক্যাম্পে চলে গেলো। দেখলো, সমগ্র ছাউনী খা খা করছে। অথচ ছাউনীতে সেপাইদের গমনাগমনের কারণে রাস্তায় হাঁটা দুষ্কর ছিলো। এখন সেখানে মাঝে-মাঝে দু'একজন সিপাই দেখা যায়। কদাচিৎ দু'একজন অফিসারও আসা যাওয়া করে। মনে হলো, যেনো সৈন্যদের কোথাও যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।

এক অফিসারের দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি জানেন, কী পরিমাণ সিপাই ছাটাই করা হয়েছে?

অফিসার বললো, হ্যাঁ, জানি। চার ভাগের তিন ভাগ সিপাই ছাটাই করা হয়েছে। অবশিষ্ট এক ভাগ সিপাই বহাল আছে।

আবুবকর দারুণ বিস্মিত হলো। বললো, আচ্ছা, মাত্র এক চতুর্থাংশ সিপাই বাকি আছে?

অফিসার বললো, হ্যাঁ। এদেরও চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। কোনো সিপাই বা কোনো অফিসার বলতে পারবে না কখন তার চাকরি চলে যাবে।

আবুবকর বললো, এইসব তো উজীরে আজমের কাজ। আল্লাহ জানেন, তার কী উদ্দেশ্য। কী লক্ষ্যে সে এগুলো করছে। দেশ ও জাতির উপর সে কী ধ্বংসই না ডেকে আনছে।

অফিসার বললো, যখন থেকে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সিপাইদের বিশ্বস্ততায়ও ভাটা পড়েছে।

আবুবকর বললো, নিশ্চয় তাতো হবেই।

আবুবকর ফিরে এলো। শাহী প্রাসাদের নিকট পৌঁছুলে আহমারের সাথে তার সাক্ষাত হলো। আহমার বললো, আপনাকে এতো বিমর্ষ দেখাচ্ছে কোনো? কোথা থেকে এলেন?

ঃ সেনা ছাউনীতে গিয়েছিলাম। উজীরে আজম প্রায় সব সিপাইকে চাকরিচ্যুত করেছে। মাত্র এক চতুর্থাংশ সিপাই বাকি আছে। তাদের মাঝেও চাকরিচ্যুতি অব্যাহত রয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর এক নতুন কর আরোপ করেছে। ফৌজ দ্বারাই তা আদায় করা হচ্ছে। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হতে যাচ্ছিলো। কয়েকজন সিপাই ও ব্যবসায়ী আহত হয়েছে। ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। ফলে তা আর হতে পারেনি। তারপর সে আহমারকে সৈনিক এবং

বাজারের ব্যবসায়ীদের ঘটনা বিস্তারিত শোনালো

ঃ মনে হচ্ছে, উজীরে আজম কোনো বিপ্লব চায়। বিপ্লব ঘটিয়ে সে মসনদ দখল করতে পথ সুগম করছে।

ঃ আমারও একই ধারণা। আমি এখন খলীফার নিকট যাচ্ছি। তুমি কি আমার সাথে যাবে?

ঃ হ্যা, অবশ্যই যাবো।

কথা বলতে বলতে তারা খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করলো। প্রথমেই দেখলো, যে প্রাসাদে সর্বদা পাঁচশ সিপাই নিযুক্ত থাকতো, এখন সেখানে মাত্র একশ সিপাই আছে।

ঃ আরে সব জায়গায়-ই তো সিপাই কমিয়ে দেয়া হয়েছে!

ঃ হ্যাঁ, তা-ই তো। আমার প্রাসাদ-প্রহরী কমে গেলে আমি ধারণা করেছিলাম হয়তো তাদের খলীফার প্রাসাদে বদলি করা হয়েছে।

ঃ আমিও তো এমনই ধারণা করেছিলাম।

ঃ একদিকে ইবনে আলকামী খলীফাকে মদ্যপানে ডুবিয়ে রেখেছে, অন্য দিকে ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করে ফেলেছে। নিশ্চয় কোনো ধ্বংস যেনো বাগদাদ নগরীর দিকে এগিয়ে আসছে।

ঃ তুমি ঠিকই বলছো।

উভয়ে খলীফার প্রাসাদে পৌঁছুলে দাসিরা দৌড়ে এসে তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরলো। তারা খলীফার প্রাসাদের প্রহরী প্রধানের কক্ষে গেলো। প্রহরী প্রধান তাদের অভ্যর্থনা জানালো। তারপর বললো, খলীফা ঘুম থেকে ওঠেছেন। আপনারা তার সাক্ষাতে যেতে পারেন। তারা উভয়ে খলীফার নিকট গেলো। অত্যন্ত আদবের সাথে তাকে সালাম দিলো। খলীফা সালামের উত্তর দিয়ে তাদের বসতে বললেন। তারা বসলে খলীফা বললেন, ফেরদাউস আমাকে বলেছে, আহমার শাহজাদী নাজমার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।

লজ্জায় আহমার মাথা নিচু করে ফেললো। আবুবকর বললো, মহামহিম খলীফা, ঘটনা তা-ই।

খলীফা মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, আহমার তো নাজমার চেয়ে উত্তম কোনো জীবনসঙ্গীনী খুঁজে পাবে না। আকৃতি-প্রকৃতি ও শোভা-সৌন্দর্যে সে একেবারে অনন্যা। তার জুড়ি পাওয়াই মুশকিল।

আবুবকর বললো, নাজমার মাঝেও তো মোল্লা মোল্লা ভাব আছে।

খলীফা এবার আর না হেসে পারলেন না। বললেন, তাহলে তো জুড়ি ভালোই মিলেছে। আহমারও রূপ-সৌন্দর্যে কম নয়। তারপর খলীফা বললেন, আহমার সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছো?

আবুববকর বললো, না। আমি বলতে এসেছি, দেশের প্রায় সকল সৈন্যই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট এক অংশেরও সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে।

খলীফা বললেন, এমনই হবে। অকারণে কোটি কোটি দিনার এই ফৌজের পেছনে খরচ করা হচ্ছিলো। আল্লাহ ইবনে আলকামীর হায়াত বৃদ্ধি করুন। সে আমাকে বলেছে, এ খরচ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তার বলার পর আমার চোখ খুলে গেছে। আমিও চিন্তা করে দেখেছি, বাস্তবিক অকারণে কোটি কোটি দিনার ব্যয় হচ্ছে। যদি এই বিপুল সম্পদ জমা করা হতো, তাহলে রাজ কোষাগার দিনারে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।

আবুবকর বললো, কিন্তু মহামহিম খলীফা! ফৌজের কারণে রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় আর বাইরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা পায়। ফৌজ না থাকলে দেশে শান্তি-নিরাপত্ত কীভাবে থাকবে? আল্লাহ্ না করুন, যদি বাইরের শত্রু দ্বারা দেশ আক্রান্ত হয়, তাহলে তাদের মোকাবেলা কীভাবে করা হবে?

খলীফ বললেন, চৌদ্দ বছর যাবৎ আমি খেলাফতের এই মসনদে সমাসীন। এই সুদীর্ঘ সময়ে না রাজ্যের কোথাও বিশৃঙ্খলা হয়েছে, না বাইরের কোনো শত্রু আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

আবুবকর বললো, সবাই জানতো, আব্বাসী খেলাফতের অসংখ্য সৈন্য রয়েছে। সৈন্যরা সর্বদা এক ছাউনী থেকে অন্য ছাউনীতে যাতায়াত করতো। ফলে ফেতনাবাজ দুষ্ট লোকেরা ভীত থাকতে. আর বাইরের শত্রুদের উপরও তার বিরাট প্রভাব ছিলো। কিন্তু যখন তারা জানতে পারবে, সৈন্যদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, সেনাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন তারা মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসবে। স্পর্ধা দেখাতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবে না।

খলীফা হেসে বললেন, বেটা! তোমার এখনো বয়স কম। তুমি জানো না, প্রত্যেক শাসকের একটা ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে। সে প্রভাবে ফেতনাবাজ ও দুষ্ট লোকেরা এবং বাইরের শত্রুরা মাথা নত করে থাকে।

শোনো, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতো প্রবল যে, আমার দিকে মাথা তুলে তাকাতে তারা সাহস পায় না।

আবুবকর বললো, আমি জানি, মহামহিম খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি। কিন্তু এই প্রভাব-প্রতিপত্তি ততোক্ষণই থাকবে, যতোক্ষণ সেনাশক্তি থাকবে। সেনাশক্তি না থাকলে খেলাফতের কোনো শক্তি থাকবে না। আর খেলাফতের শক্তি না থাকলে খলীফারও কোনো প্রভাব থাকবে না।

খলীফা বললেন, যদি সেনাশক্তির কারণেই খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়ে থাকে, তবে তো এখনো ফৌজ অবশিষ্ট আছে। আর যাদের চাকরিচ্যুত করা

হয়েছে, প্রয়োজনের সময় আবার তাদের ভর্তি করে নেয়া হবে।

আবুবকর বললো, মহামহিম খলীফা হয়তো জানেন না, এই সেনাশক্তি হ্রাসের কারণে ফৌজের মাঝে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

খলীফা বললেন, এটা তোমার ধারণা। তুমি জানো না, এই ফৌজের সংখ্যা হ্রাসের কারণে কোটি কোটি দিনার বেঁচে যাবে।

আবুবকর বললো, বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর এক নতুন কর আরোপ করা হয়েছে আর ফৌজের লোকেরা তা আদায় করছে।

খলীফা বললেন, এটাও ইবনে আলকামীর চিন্তার ফসল। চাকরিচ্যুত করার পর যে পরিমাণ ফৌজ বাকি আছে, এর দ্বারা তাদের বেতনের খরচ হয়ে যাবে। এভাবে ফৌজের সকল খরচ বাইরে থেকেই হয়ে যাবে। কোষাগার থেকে কিছুই দিতে হবে না।

আবুবকর বললো, কিন্তু এই অনাকাঙ্খিত ও অযৌক্তিক করের কারণে ফৌজ ও ব্যবসায়ীদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ইবনে আলকামী গোপনে কোনো বিপ্লব ঘটাতে চাচ্ছে।

খলীফা হাসতে হাসতে বললেন, এই বেচারার পূর্ব থেকেই ধারণা ছিলো, তুমি তার ভালো পদক্ষেপগুলোর বিরোধিতা করবে। তাই সে এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তাবায়ন করতে দ্বিধাদ্বন্ধে ছিলো। আমি তাকে আশ্বস্ত করেছি, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই শুনবো না।

তুমি বলছো, সে কোনো বিপ্লব ঘটাতে চায়। অথচ আমি বলছি, সে খেলাফতের ওফাদার ও বিশ্বস্ত খাদেম। এ ধরনের উজীর খুব কমই পাওয়া যায়। এ বৎসরই সে রাষ্ট্রীয় কোষাগার দিনারে পরিপূর্ণ করে দেখাবে।

আবুবকরের কণ্ঠচিরে হতাশার সুর বেরিয়ে এলো। বললো, আল্লাহ যেনো দেশের মঙ্গল করেন।

খলীফা বললেন, ধন-দৌলতের দ্বারা সবকিছুই হয়। মানুষ বলে, আল্লাহ-ই সব কিছু করেন। কিন্তু আমি বলি, যে কাজ করা অসম্ভব, তা ধন-দৌলতের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে যায়।

আবুবকর বললো, আচ্ছা! তাহলে এতোটুকু করে দিন, যেনো ব্যবসায়ীদের থেকে ফৌজের লোকেরা কর আদায় না করে, বরং অন্য কোনো অফিসার নিয়োগ করুন। সে-ই ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায় করবে।

খলীফা বললেন, আচ্ছা, আমি তা করে দিচ্ছি।

আবুবকর ও আহমার সালাম জানিয়ে খলীফার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

ছত্রিশ.

উজীরে আজম ইবনে আলকামী ইতিমধ্যে দু'টি বিষয়ে সফলতা অর্জন করেছেন। ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করে ফেলেছেন। বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর নতুন কর আরোপ করে ব্যবসায়ী ও ফৌজের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি এখন তৃতীয়বার হালাকুখানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখলেন-

'আমি আপনার জন্য পথ পরিষ্কার করে ফেলেছি। ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করে সিপাইদের বাগদাদ থেকে বের করে দিয়েছি। আর এখন এক কৌশল অবলম্বন করেছি, যার ফলে শহরের সাধারণ জনগণ ও ফৌজের সদস্যদের সাথে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। আমি আপনার জন্য যা কিছু করার করে দিয়েছি। এখন ইরাক সাম্রাজ্য ও তার বিপুল বিস্ময়কর ধন-সম্পদ আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। আক্রমণের এর চে' উপযুক্ত সময় হয়তো আর নাও আসতে পারে।'

আর নাসীরুদ্দীন তুসীকে লিখলেন–

'আপনার নির্দেশ মতো আমি ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছি। আর এমন কৌশল অবলম্বন করেছি, যার ফলে বাগদাদ শহরে সর্বদা ঝগড়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ভেঙে পড়েছে। জনগণ খলীফা ও খেলাফতের ব্যাপারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বাগদাদ আক্রমণের এখনই সময়। আপনি হালাকুখানকে উৎসাহ দিন। আলাবী হুকুমত কায়েমের এর চে' সুবর্ণ সুযোগ হয়তো আর কখনো নাও আসতে পারে।

চিঠি দু'টি সুলাইমানের হাতে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। সুলাইমান যখন হালাকুখানের নিকট পৌঁছলো, তখন হালাকুখানের সাহস ও স্পর্ধা খুব বেড়ে গিয়েছিলো। কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি বাতেনী ফেরকা কারামাতিয়াদের উপর বিজয় লাভ করে তাদের দুর্দম, ভয়ঙ্কর অপরাজেয় দুর্গ 'মৃত্যুকেল্লা'কে পদানত করে এসেছেন। তাই তার অহংকারের শেষ ছিলো না।

হালাকুখান মোঙ্গলদেরই একজন। তাদেরকে তাতারীও বলা হতো। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে মোঙ্গল বা তাতারী বলে কোনো কিছুকে পৃথিবীর মানুষ চিনতো না। কারণ, এ জাতিটি পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে উদভ্রান্তের ন্যায় জীবন-যাপন করতো। গরু, ছাগল লালন-পালন করতো। পানি আর ঘাসের সন্ধানে মরুর পর মরু ঘুরে ফিরতো। শিকার আর পশু পালনই ছিলো তাদের পেশা। দুধ আর গোশতের উপর তাদের জীবন নির্ভর করতো। তুর্কীদের নিকট পশু ও চামড়া বিক্রয় করতো।

জীবনযুদ্ধে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে চীনের তমফাচ এলাকায় গিয়ে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পাহাড়ি অঞ্চল তমফাচের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবুজ-শ্যামল ঘাস আর ঝরনার ছল্ ছল্ স্বচ্ছ পানি তাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তমফাচ তুর্কিস্তান থেকে ছ'মাস পথের দূরত্বে হলেও তারা নিজেদেরকে তাতারী বা তুর্কী হিসেবে পরিচয় দিতো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তারা নূহ (আ.)-এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধর ছিলো।

তারা তুর্কিস্তান থেকে এতো দূরে এসে পড়েছিলো যে, চীনাদের দাস হয়ে থাকতে হতো। অবশেষে একবার সত্যই চীনারা আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করলো এবং সকল পালিত পশু তাদের দখলে নিয়ে নিলো।

তখন চীনাদের সম্রাট সুগী চিংচুং। তার প্রধান সেনাপতি ইয়াসুগায়ে। সে ছিলো অত্যন্ত বীর যোদ্ধা। সম্রাট সুগী চিংচুং সেনাপতিকে এই তাতারীদের পরাজিত ও পদানত করতে প্রেরণ করলেন। বীর যোদ্ধা ইয়াসুগায়ে তাতারীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তদের পরাজিত করে। এতে তাতারীদের শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সম্রাট সুগী চিংচুং মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে। সেনাপতি ইয়াসুগায়ে তার শিক্ষক নিযুক্ত হয়। এক বছর যেতেই তাতারীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে। অবশেষে বহু চেষ্টা-সাধনার পর তারা চীনাদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে।

বীর যোদ্ধা ইয়াসুগায়ে যদিও সম্রাট ছিলো না, কিন্তু চল্লিশ হাজার গোত্র তাকে নেতা মানতো। একবার জনৈক গণক তাকে বললো, তার ছেলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের স্থপতি হবে। গণকের কথা শুনে সেনাপতি ইয়াসুগায়ে বিস্ময়ে হেসে খুন! কারণ তার কোনো ছেলেই নেই। কিন্তু পরে স্ত্রী উতুল গর্ভবতী হলে সে দারুণ আনন্দিত হলো। এক স্বপ্নীল আশার দোলায় সে দুলতে থাকে। কামনা করতে থাকে হয়তো তার ছেলে হবে। আর এই ছেলেই একটি সাম্রাজ্যের স্থপতি হবে। তার এ আশাও পূর্ণ হলো। তার এক ফুটফুটে ছেলে জন্মলাভ করলো। সে এতে ভীষণ আনন্দিত হলো। বিরাট আপ্যায়নের আয়োজন করলো। সকল কবীলার নেতৃস্থানীয়দের আমন্ত্রণ করলো। বহু ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠান করলো এবং ছেলের নাম রাখল তমুচীন। অত্যন্ত আদর-সোহাগে তাকে প্রতিপালন করতে লাগলো।

তমুচীন বিয়ের বয়সে উপনীত হলে তার পিতা ইয়াসুগায়ে ৫৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে। ফলে তমুচীন তার পিতার অনুগত বত্রিশ হাজার কবীলার শাসনকার্য হাতে নেয়। ইতিমধ্যে তার অনুসৃত এক গোত্র নীরু তার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করে তালজুত কবীলার সাথে মিলিত হয়। তমুচীন নীরু ও তালজুত কবীলার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তমুচীন বিজয় লাভ করে এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। তখন তার বয়স ছিলো ত্রিশ বৎসর।

কিন্তু এরপর তুর্কিস্তানের শাসক তার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। এক যুদ্ধে সে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং কিরীত গোত্রের বাদশাহ উংখানের নিকট আশ্রয় নেয়। উংখান তার পিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে গ্রহণ করলেন। তমুচীন সেখানে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিলে মোঙ্গলরা তাকে তাদের সর্দার মেনে নেয়।

হিজরী ৫৫৯ সালে সে তদঞ্চলের বাদশাহ হয়ে যায়। এর কিছু দিন পর সে মোঙ্গলদের সকল গোত্রের সর্দারদের আমন্ত্রণ করে বিশাল এক ভোজের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানে মোঙ্গল সরদাররা তাকে চেঙ্গীস কা-আন (শাহানশাহ) উপাধিতে ভূষিত করে। তারপর সে চেঙ্গীসখান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এবার সে তমফাচ থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করলো। খুতা পদানত করে আরো সামনে অগ্রসর হলো। থাতান, মাচীন, দস্তকীচাক, শাফীন এবং রাশিয়ার কিয়দাংশ পদানত করলো। এরপর মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হলো। খারেজম রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সে দারুণ অহংকারী হয়ে গেলো। সে ছিলো অতিশয় জালিম, রক্তপিয়াসী, দুর্দান্ত ও হিংস্র। যে শহরই আক্রমণ করতো, তাকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করতো। এমন রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো যে, খুব কম মানুষই প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারতো। কথিত আছে, বিজয়ের পর সে মানুষের মাথা দিয়ে বিজয়সৌধ নির্মাণ করতো। সে খোরাসান এবং জিন রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তাতে যে ধ্বংসলীলা চালায়, তা আজো স্মরণ করে মানুষ শিউরে ওঠে। ভয়ে থর থর কাঁপতে থাকে। হিজরী ৫৬৪ সালে সে বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যায়, যার মুখোমুখি দাঁড়ানোর দুনিয়ার কোনো শক্তির সাহস ছিলো না।

তার চার ছেলে। জুজী, চুগতায়ী, উকতারী এবং তুলী। এদের কারণে তার সাম্রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তুলীর বড় ছেলে নাম মাঙ্গো খান। অপর ছেলের নাম হালাকুখান। তুলীর মৃত্যুর পর তার সালতানাত তার ছেলেদের মাঝে বিভক্ত হয় পড়ে। ইরান হালাকুখানের ভাগে পড়ে। সে ইরানে এসে তার সালতানাত দৃঢ় করে। মধ্য এশিয়া, খোরাসান এবং আরো কিছু প্রদেশ তার শাসনাধীন ছিলো।

কিন্তু সবচে' বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, হালাকুখান এবং তার গোটা সম্প্রদায় সূর্যপূজা করতো। অথচ তার উজীরে আজম ছিলো শিয়া নাসীরুদ্দীন তুসী।

সুলাইমান নাসীরুদ্দীনের নিকট গেলো। চিঠি দু'টি তাকে দিলো। নাসীরুদ্দীন

তুসী চিঠি দু'টি পড়ে সুলাইমানকে জিজ্ঞেস করলো, সত্যই কি বাগদাদ থেকে ফৌজের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয়েছে?

সুলাইমান বললো, হ্যাঁ। উজীরে আজম মহোদয় চার ভাগের তিন ভাগ সৈন্যই চাকরিচ্যুত করেছেন। শুধু এক ভাগ বাকি আছে।

নাসীরুদ্দীন তুসী জিজ্ঞেস করলো, শহরের কী অবস্থা?

সুলাইমান বললো, শহরে নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। চারদিকে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। বাজারের ব্যবসায়ী ও ফৌজের সদস্যদের মাঝে প্রায়ই হাঙ্গামা হচ্ছে। জনসাধারণ খলীফার প্রতি দারুণ ক্ষুব্ধ।

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, এখন তাহলে মনে হয় সে সুযোগ এসেছে, আমরা যার অপেক্ষায় আছি। সে সুলাইমানকে বসিয়ে রেখে হালাকুখানের নিকট গেলো। হালাকুখানের চেহারায় এক হিংস্রতা ও নির্মমতার ছায়া বিরাজমান। ছোট চোখে যেনো শেয়ালের চাহনী। নাসীরুদ্দীন তুসী তার সামনে ইবনে আলকামীর পত্র পেশ করলো। সে আরবী জানতো না। নাসীরুদ্দীন তাকে পত্রখানা পাঠ করে শোনালো। হালাকুখান বললো, তুমি কি বার্তা বাহকের নিকট প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করেছো?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, হ্যাঁ, করেছি। সে সুলাইমান থেকে যা শুনেছিলো, সব হালাকুখানকে শোনালো।

হালাকুখান বললো, তোমার মতামত কী?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, আমার মতামত হচ্ছে, আমরা যে সময়টার অপেক্ষা করছিলাম, তা এসে গেছে। এখন আমরা অত্যন্ত সহজে বাগদাদ পদানত করতে পারবো।

হালাকুখান বললো, আমাদের হামলার পথ কি পরিষ্কার হয়ে গেছে?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, হ্যাঁ।

মৃত্যুকেল্লা পদানত করার পর হালাকুখানের স্পর্ধা ও সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিলো। সে নাসীরুদ্দীনকে বললো, আচ্ছা, ফৌজের মাঝে ঘোষণা করে দাও, তারা যেনো ইরাক আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে যায়।

নাসীরুদ্দীন তুসী তার নিকট থেকে চলে এলো। সে সুলাইমানকে সুসংবাদ শোনালো। তারপর ইবনে আলকামীর নামে একটি চিঠি লিখলো–

'তোমার তামান্না পূর্ণ হয়ে গেছে। হালাকুখান ইরাক আক্রমণের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। শীঘ্রই মোঙ্গল ফৌজ ঝড়ের বেগে বাগদাদে আপতিত হবে।'

সুলাইমান চিঠিখানা নিয়ে এলো। নাসীরুদ্দীন মোঙ্গল অফিসারদের প্রস্তুতির হুকুম দিয়ে দিলো। কয়েক দিনের মধ্যে সব প্রস্তুত হয়ে গেলো। হালাকুখানের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী ঝড়ের বেগে ইরাকের দিকে এগিয়ে এলো।

সাঁইত্রিশ.

মোঙ্গলরা যখন ইরান ও খোরাসান পদানত করে নিয়েছিলো, তখনই তাদের হিংস্রতা, নির্মমতা ও দস্যুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। মুসলমানরা জানতো, মোঙ্গলরা অসভ্য, বর্বর, হিংস্র, রক্তপিপাসু। তাদের উপমা তারাই।

মোঙ্গলরা ইরাক আক্রমণ করছে, একথা শোনামাত্রই মুসলমানরা ভয়ে কেঁপে ওঠে। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেলো। যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। এর কারণ, মোঙ্গলরা যে শহর, নগর বা গ্রাম আক্রমণ করেছে, তাতে অভাবনীয় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। কোনো মানুষকে জীবিত ছেড়ে দেয়নি। যাকে পেয়েছে তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করেছে। লুটপাট করে সব ছিনিয়ে নিয়েছে। অবশেষে তাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

পলায়নরত সেই লোকদের কেউ কেউ বাগদাদে এসে পৌঁছলো। তারা মোঙ্গলদের আক্রমণের কথা শহরবাসীদের জানিয়ে দিলো। কিন্তু শহরের লোকেরা আনন্দ-উল্লাসে নিমজ্জিত। তারা তাদের কথা বিদ্রূপ ভরে উড়িয়ে দিলো। বললো, আরে তোমরা তো দেখি দারুণ ভীরু। কোথায় তোমাদের পৌরুষ! কোথায় তোমাদের সাহসিকতা! কেনো মোকাবেলা করে তাদের তাড়িয়ে দিলে না। কিছু লোক বললো, না ভাই, মোঙ্গলদের সৈন্যবাহিনী আসছে না, বরং আল্লাহর গজব আসছে। আল্লাহর গজবের মোকাবেলা করবে?

তারা সত্যই বলেছিলো, মোঙ্গল ফৌজ আসছিলো না, বরং আল্লাহর গজবই এগিয়ে আসছিলো। তখনো সময় ছিলো, যদি তারা তাওবা-ইসতেগফার করে আল্লাহর দরবারে মিনতি করতো, আল্লাহর নাফরমানী ছেড়ে ইবাদতে নিমগ্ন হতো, তাহলে সম্ভবত আল্লাহ দয়াপরবশ হতেন, তাদের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকাতেন। আর তারা আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পেয়ে যেতো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তারা তা করেনি। তারা আল্লাহর সামনে নতশির হয়নি। তখনো তারা নাফরমানিতেই ডুবে রইলো। খেলা-ধুলা, গান-বাদ্য আর নৃত্য চলতেই থাকলো। মোঙ্গল আক্রমণের তারা কোনোই পরোয়া করলো না।

ইবনে আলকামী যখন শুনলেন, মোঙ্গলরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে, তখন তার আর আনন্দের সীমা রইলো না। তিনি চাইলেন, যেনো এ সংবাদ খলীফার কানে না পৌঁছে। কিন্তু এটা কি অজানা থাকবার বিষয়? শাহজাদারা সংবাদ পেলো। তারা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো।

সর্বপ্রথম আহমার মসজিদে মুসল্লীদের থেকে এ সংবাদ শুনলো। সে জানলো কিছু লোক সীমান্ত এলাকা থেকে পালিয়ে বাগদাদ এসেছে। তারাই আক্রমণের কথা বলেছে। কিন্তু বাগদাদ এমন শহর নয় যে, নতুন কোনো আগন্তুকের সন্ধান

পাওয়া সহজে সম্ভব। তবুও সে চেষ্টা করতে লাগলো। অবশেষে সে আগন্তুকের সন্ধান পেলো। তার মুখে শুনে সে নিশ্চিত হলো, সত্যই মোঙ্গলরা আক্রমণ করছে।

সে সোজা আবুবকরের নিকট গেলো। সেখানে আহমদ আবুল কাসেমও বসা ছিলো। আহমার বললো, সর্বনাশ! সর্বনাশ!! এবার উপায়? মোঙ্গলরা আক্রমণ শুরু করেছে!

আবুবকরের দু'চোখে দারুণ বিস্ময়। বললো, মোঙ্গলরা আক্রমণ করেছে তুমি এ কথা কার থেকে শুনলে?

আহমার বললো, কয়েকদিন হলো আমি মসজিদে এ কথা শুনেছি। কিছু লোক সীমান্ত অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে সংবাদ দিয়েছে। আজ তাদের সন্ধান করে বের করে নিশ্চিত হয়েছি।

আবুবকর বললো, এখন সেই ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইবনে আলকামীই তার হোতা। সে-ই মোঙ্গলদের আক্রমণে অনুপ্রাণিত করেছে। আর এদিকে বাগদাদে ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এখন দেশ ও জনগণের অবস্থা কী হবে?

আহমার বললো, আমি মনে করি, খলীফাকে এ সংবাদ দ্রুত জানানো দরকার।

আবুবকরের কণ্ঠে চরম নৈরাশ্য। বললো, জানালেও তো কোনো লাভ হবে না। তিনি তো কেবল ইবনে আলকামী যা বলেন তা-ই বিশ্বাস করেন। হতে পারে সেই হারামীই ইতিমধ্যে কোনো কথা তাঁর অন্তরে দৃঢ় করে দিয়েছে।

আহমদ বললো, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকেও তো জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আবুবকর বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আহমার বললো, তাহলে এক্ষুনি চলো খলীফার নিকট যাই।

আবুবকর বললো, চলো।

তিনজনই রওনা হলো। তারা যখন খলীফার প্রাসাদে পৌছলো, তখনো সেখানে মদ ও গানের অনুষ্ঠান চলছিলো। উদ্ভিন্নযৌবনা দাসিরা গ্লাসের পর গ্লাস শরাব ঢেলে দিচ্ছে। খলীফা ঢক্ ঢক্ করে গলাধঃকরণ করছেন আর সুকণ্ঠী সুডৌল সুধাময়ী দাসির সঙ্গীতে বিভোর হয়ে আছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আহমারকে সবাই কেমন যেনো ভয় করতো। তার সামনে প্রকাশ্যে এসব করতে কেউই সাহস পেতো না। তার আগমন সংবাদ পেয়েই খলীফা মদপান ও গান বন্ধ করে দিলেন।

তিনজনই খলীফাকে সালাম দিয়ে সামনে গিয়ে বসলো। আবুবকর দাসিদের ইশারা করলে তারা চলে গেলো। সে খলীফাকে বললো, মহামহিম খলীফা! আপনি কি কিছু শুনেছেন?

খলীফার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললেন, কী?

ঃ মোঙ্গলরা ইরাক আক্রমণ করেছে?

খলীফা হেসে বললেন, তুমি এ কী বললে! মোঙ্গলদের কি এতোই স্পর্ধা যে, ইরাক আক্রমণ করবে?

ঃ সৈনিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সেনানিবাস শূন্য পড়ে আছে। এরপর আক্রমণ করতে তাদের বাধা কোথায়?

ঃ আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি, আমার ভয়!

ঃ আমি তো আগেই বলেছিলাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আর শক্তি-ক্ষমতা নির্ভর করে সামরিক শক্তির উপর।

ঃ কোনো ভয় করো না। যথেষ্ট ফৌজ এখনো মওজুদ আছে।

ঃ তারপরও কি কিছু সৈনিক ভর্তি করে নিলে ভালো হয় না?

খলীফার গম্ভীর কণ্ঠ, তাতে কী উপকার হবে?

ঃ শুনতে পেলাম, মোঙ্গলরা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করছে।

ঃ তুমি কি সৈন্যদের বেতনের কথা একবারও চিন্তা করেছো?

ঃ ধন-দৌলত মানুষ মান-ইজ্জত ও জীবন রক্ষার্থে ব্যয় করে। এখন মোঙ্গল বাহিনী মান-ইজ্জত ও জীবনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঃ অবস্থা এমন ভয়াবহ নয়। আমি এখনই ইবনে আলকামীকে ডেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

ঃ আল্লাহ মালুম, আপনি ইবনে আলকামীকে কী ভাবেন। আমাদের বিশ্বাস, তার ইশারায়-ই মোঙ্গলরা ইরাক আক্রমণ করেছে। এটা তারই ষড়যন্ত্রের ফল।

ঃ ইবনে আলকামী সম্পর্কে তোমার খারাপ ধারণা আছে। তাই তার প্রত্যেক কাজ খারাপ মনে হয়। বরং যে কাজ সে করে না, তাও তোমরা তার বলে সমালোচনায় মুখর হও। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মোঙ্গলদের আক্রমণের সাথে তার কী সম্পর্ক?

ঃ ঘটনা পরম্পরায় তো তা-ই প্রতীয়মান হচ্ছে। এদিকে যখন ফৌজে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা হলো, ঠিক তখনই মোঙ্গলরা আক্রমণ শুরু করেছে। এর আগে তো মোঙ্গলরা এমন স্পর্ধা দেখায়নি!

ঃ এটা তো কাকতালীয় ব্যাপার। ইবনে আলকামী গাদ্দার নয়, নিমকহারাম নয়।

ঃ আল্লাহই জানেন, সে কেমন চরিত্রের মানুষ।

ঃ আমিও জানি।

ঃ তবুও ফৌজে সৈন্য ভর্তি করে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোঙ্গলদের প্রতিহত করা হোক।

ঃ হ্যাঁ, পূর্ণ শক্তি দিয়েই তাদের প্রতিহত করা হবে।

ঃ আমি মহামহিম খলীফার নিকট আরেকটি কথা বলতে বাধ্য, যা গোটা

বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছে। উজীরে আজম কি এখনো মোঙ্গলদের আক্রমণের কথা শোনেননি? যদি শুনে থাকেন, তাহলে কি তার দায়িত্ব ছিলো না যে, তিনি তা খলীফাকে অবহিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন? এতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে, তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

ঃ তোমার এ ধারণা সত্য নয়। হতে পারে সে এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ঠিক তখনই উজীরে আজম ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। উজীরে আজম ইবনে আলকামী দারুণ সতর্ক। তিনি শাহজাদাকে খলীফার নিকট দেখেই বুঝে ফেললেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তিনি খলীফা ও শাহজাদের সালাম দিলেন এবং আদবের সাথে এক পার্শ্বে বসে পড়লেন।

খলীফা বললেন, নতুন কোনো সংবাদ আছে কি?

ইবনে আলকামী একথা জানবার জন্যই এসেছিলেন যে, মোঙ্গলদের আক্রমণের সংবাদ খলীফা জেনেছেন কিনা। খলীফার কথায় তিনি বুঝে ফেললেন, খলীফা জেনে ফেলেছেন। তাই বললেন, নতুন সংবাদ তো এটাই যে, মোঙ্গলরা ইরাক আক্রমণ করেছে।

খলীফার কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর। বললেন, তুমি এর কী ব্যবস্থা নিয়েছো?

ঃ আমি ফৌজদের তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছি। এখন মহামহিম খলীফার নিকট সেনাবাহিনী প্রেরণের অনুমতি নিতে এসেছি।

খলীফা শাহজাদাদের দিকে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেনো তিনি দৃষ্টির ভাষায় ভর্ৎসনা করে বললেন, আমি কি বলেছিলাম না, হয়তো সে প্রতিরোধের ব্যবস্থায় ব্যস্ত রয়েছে?

ঃ বর্তমান ফৌজ কি মোঙ্গলদের মোকাবেলায় যথেষ্ট?

ঃ কেনো যথেষ্ট হবে না? মহামহিম খলীফার শুভদৃষ্টিতে বর্তমান ফৌজই যথেষ্ট যে, তারা মোঙ্গলদের পরাজিত করে তাদেরকে ইরান থেকেও তাড়িয়ে দেবে।

খলীফা আবার শাহজাদাদের দিকে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেনো তিনি দৃষ্টির ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলছেন, আমি কি বলিনি যে, এখনো যথেষ্ট ফৌজ বাকি আছে।

খলীফা বললেন, রণাঙ্গনে যেতে এখন কী পরিমাণ সৈন্য প্রস্তুত আছে?

ঃ দশ হাজার। দু'জন বীর যোদ্ধা অফিসার ফাতহুদ্দীন দাউদ ও মুজাহিদুদ্দীন আইবেক-এর নেতৃত্বে এই বাহিনী প্রেরণ করা হবে।

ঃ বেশ ভালো, অত্যন্ত সতর্ক থাকবে।

ইবনে আলকামী উঠে চলে এলেন। এখন ইবনে আলকামীর সৈন্য প্রেরণ ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। তাই খলীফার নিকট থেকে এসেই তিনি মোঙ্গলদের মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদপত্রেরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফাতহুদ্দীন দাউদ ও মুজাহিদুদ্দীন আইবেক দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মোঙ্গলদের মোকাবেলা করতে রওনা হয়ে গেলো।

আটত্রিশ.

ফাতহুদ্দীন দাউদ অত্যন্ত সতর্ক ও বীর সিপাহসালার। ইতিপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছে। ইবনে আলকামী তাকে ভয় করতেন। তাকেও চাকরিচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দু'টি কারণে তা করতে সাহস পাননি। এক. গোটা ফৌজে তার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও অসাধারণ প্রভাব রয়েছে। দুই. শাহজাদারা এমনকি স্বয়ং খলীফাও তার প্রতি শুভদৃষ্টি রাখেন। ইবনে আলকামীর তার নেতৃত্বে এই বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য, সে মোঙ্গলদের মোকাবেলায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ইবনে আলকামীর নিশ্চিত বিশ্বাস, রাজ বাহিনীর যারা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের একজনও ফিরে আসবে না, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ফাতহুদ্দীন দাউদ এবং মুজাহিদুদ্দীন আইবেক মনযিলের পর মনযিল পথ অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ফাতহুদ্দীন পূর্বেই কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছিলো যে, তারা মোঙ্গল বাহিনীর সংবাদ নিয়ে আসবে। একদিন কয়েকজন গুপ্তচর এসে বললো, তাতারী বাহিনী নিকটে পৌঁছে গেছে। ষাট হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। তবে আরব বাহিনীর ভয় তাদের অন্তরে বিরাজমান। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে।

ফাতহুদ্দীন চিন্তায় নিমজ্জিত হলো। কারণ, তার আছে মাত্র দশ হাজার যোদ্ধা। পশ্চাতে সৈন্য সাহায্যেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। সৈন্য আসবেই বা কোথা থেকে। সবাইকে তো চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তবুও সে বীর যোদ্ধা। আরবীয় খুনের উত্তাল তরঙ্গ তার শিরায় শিরায় প্রবাহমান। এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই সে সম্মুখে অগ্রসর হলো।

একদিন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। সেদিন মোঙ্গলরা আক্রমণ করতে সাহস পেলো না। তারা এক বিস্তৃত প্রান্তরে অবস্থান নিলো। মুসলিম বাহিনীও এক পার্শ্বে তাঁবু ফেললো।

ফাতহুদ্দীনের ধারণা, মোঙ্গল বাহিনী রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করতে পারে।

তাই বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দিলো, সবাই সতর্ক থেকো, আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনামাত্রই যেনো সবাই অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসতে পারো। চারদিকে রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সে আড়াইশ সৈন্যকে প্রহরায় নিযুক্ত করলো। তারা সারা রাত বাহিনীর চতুর্পাশ্বে টহল দেবে। শত্রুদের অবস্থানের প্রতি কড়া নজর রাখবে।

মুসলমানদের মতো মোঙ্গলদেরও রাতের অন্ধকারে আক্রমণের আশংকা হলো। তারাও একটি দলকে প্রহরায় নিযুক্ত করলো। তারা সারারাত নিজ বাহিনীর চতুর্পার্শ্বে টহল দিলো।

জ্যোৎস্না রাত। রূপসী চাঁদ তার সকল সৌন্দর্যশুষমা নিয়ে আকাশে বিরাজমান। আকাশ থেকে যেনো গলে গলে তার রূপের জ্যোতি ধরায় নেমে আসছে। উভয় বাহিনী বেশ দূরত্বে অবস্থান করলেও জ্যোৎস্নার আলোকে পরস্পর পরস্পরকে দেখছিলো।

রাতে কেউ কারো উপর আক্রমণ করলো না। তবে উভয় বাহিনী অত্যন্ত সতর্ক অবস্থানে রইলো। সোবহে সাদেকের আলোয় পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলে চারদিকে পাখির কলকাকলি শোনা যেতে লাগলো। প্রহরী বাহিনী তখন ঘুমে কাতর। তারা বিশ্রামের জন্য চলে গেলো।

উভয় বাহিনীর সৈন্যরা জাগ্রত হলো। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সবাই তৎপর হয়ে ওঠলো। এইতো কিছুক্ষণ পূর্বে উভয় বাহিনী এক অখণ্ড নীরবতায় নিমজ্জিত ছিলো। আর এখন চারদিক থেকে নানা ধ্বনি ভেসে আসছে।

চারদিক এখন সকালের বিমল আলোয় আলোকিত। হালাকুখান তার বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলো। মুসলিম বাহিনী নামাযে মশগুল। ইতিপূর্বে যদিও এ বাহিনীর সৈন্যরা নামাযের পাবন্দ ছিলো না; কিন্তু এখন সামনে যুদ্ধ, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে নতশিরে সিজদায় লুটিয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কারণ, আল্লাহর হাতেই জয়-পরাজয়। তাঁর হাতেই ইজ্জত-লাঞ্চনা। তারা নামাযে আল্লাহর অদৃশ্য পায়ে লুটিয়ে পড়ে তওবা-ইস্তেগফার করলো। গুনাহ থেকে মাফ চেয়ে যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করলো।

ফাতহুদ্দীন দাউদ মুসলিম বাহিনীকে সুসজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলো। মোঙ্গল বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে। এর মাঝে সূর্য উদিত হয়ে তার সোলালী আভা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে তুললো। মোঙ্গল বাহিনী চিৎকার করে সূর্যকে সেজদা করার লক্ষ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারা সূর্যপূজারী। সূর্যকে উপাস্য মনে করে সকাল-সন্ধা দু'বেলা সূর্যপূজা করে।

সেজদার পর মোঙ্গল বাহিনী রণক্ষেত্রে এগিয়ে এলো। বিরাট বাহিনী দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ডান পার্শ্ব, বাম পার্শ্ব প্রস্তুত। মাঝে হালাকুখান। তার পাশেই নাসীরুদ্দীন তুসী। মুসলিম বাহিনীও রণক্ষেত্রে নেমে এলো। সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হলেও ফাতহুদ্দীন দাউদ তাদের এমনভাবে বিন্যস্ত করলো যে, তাদের দ্বিগুণ দেখা যেতে লাগলো। তুর্কীদের মতো তাতারীদেরও এই নিয়ম ছিলো যে, প্রথমে একজন উভয় দলের মাঝে এসে দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতো। সুতরাং বিশাল বপুর অধিকারী এক মোঙ্গল যোদ্ধা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে এলো এবং অত্যন্ত অহংকারের সাথে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানালো। বিশাল বপুর ঐ যোদ্ধাকে দেখামাত্র ফাতহুদ্দীনের শিরায় আগুনের তরঙ্গ বয়ে গেলো। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না।

নিজেই তার মোকাবেলায় অগ্রসর হলো। হাল্কা ছিমছাম তার দেহ। মোঙ্গল যোদ্ধা প্রথমে তার উপর আক্রমণ করলো। সে ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলো। তারপর মোঙ্গল যোদ্ধার উপর আক্রমণ করলো। মোঙ্গল যোদ্ধা ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করেই দ্রুত তার উপর আক্রমণ করলো।

ফাতহুদ্দীন চকিতে তা প্রতিহত করেই তার কাঁধের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানলো। কিন্তু আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মোঙ্গল যোদ্ধার অধরে বিদ্রূপের হাসি। সে এবার দৈত্যের ন্যায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফাতহুদ্দীন ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করতে না পেরে তলোয়ার দ্বারা প্রতিহত করলো। উভয় তলোয়ারের আঘাতে বিদ্যুৎঝলক ছিটকে পড়লো। উভয়ের দৃষ্টি তখন তলোয়ারের প্রতি। কিন্তু ফাতহুদ্দীন দ্রুত তলোয়ার চালিয়ে মোঙ্গল যোদ্ধার ঘোড়ার পার্শ্বদেশে হাল্কা আঘাত করলো। ঘোড়া লাফিয়ে ওঠলো।

মোঙ্গল যোদ্ধা ঘোড়াকে আয়ত্তে আনতে একটু অন্যমনস্ক হলো আর অমনি ফাতহুদ্দীন অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে তার কাঁধে আঘাত করলো। তলোয়ারের আঘাত কাঁধ চিরে বক্ষস্থল পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এক বিকট চিৎকার করে মোঙ্গল যোদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

হালাকুখান সবই দেখছে। সে আর সহ্য করতে পারলো না। সম্মিলিত আক্রমণের নির্দেশ দিলো। মোঙ্গল বাহিনী ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে এগিয়ে এলো। মুসলমানরাও এগিয়ে এলো। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। তলোয়ারের আঘাতের আওয়াজ, আহতদের আর্তচিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষারব। চারদিকে এক ভীতিকর অবস্থা। সময়ের তালে তালে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। মরণপণ যুদ্ধ। মোঙ্গলরা জানে মুসলমানদের সংখ্যা কম। তাই তারা প্রথমেই প্রচণ্ড আক্রমণে মুসলমানদের

নিঃশেষ করে দেয়ার চিন্তা করলো। আর মুসলমানরা ভাবলো, আমরা সংখ্যায় কম। পরাজিত হলে মোঙ্গলরা একজনকেও জীবন নিয়ে ফিরতে দেবে না। সুতরাং মরতে হলে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রেই মরবো। ভীতু কাপুষের ন্যায় গর্তে গিয়ে মরবো না। তাই তারা মরণপণ যুদ্ধ করছে।

মোঙ্গলদের ধারণা, মুসলমানরা দ্রুত পরাজিত হবে। কিন্তু তারা তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে দারুণ বিস্মিত হলো। তারা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পুনরায় আক্রমণ করে বহু মোঙ্গল যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করলো। ক্ষিপ্ত মোঙ্গল বাহিনী আবার প্রবল প্রচণ্ডতার সাথে আক্রমণ করলো। মুসলমানরা সুকৌশলে তা প্রতিহত করেই ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণকারীদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে অনেককে ধরাশায়ী করলো। এভাবে দেখতে না দেখতে অনেক মোঙ্গল যোদ্ধা নিহত হলো।

এ যুদ্ধে মুসলমান যোদ্ধারা যেনো মোঙ্গলদের মৃত্যুদূতরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। যার মাথায় আঘাত করলো, আঘাত হলো চূড়ান্ত, অব্যর্থ। মাথার খুলি দ্বিখণ্ডিত হয়ে সেখানেই নিস্তেজ হয়ে গেলো। যার বুকে আঘাত করলো আঘাত হলো ভয়াবহ। পাজরের হাড় চিরে বেরিয়ে এলো বিক্ষত হৃদপিন্ড। তারপর একটি মাত্র আর্তচিৎকারের পরই জীবন প্রদীপ নিভে গেলো।

মৃত্যুকে হাতে নিয়ে মুসলমানরা আক্রমণ করেছে। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও অপ্রতিরোধ্য সে আক্রমণ। সারির পর সারি মোঙ্গল সৈন্য হত্যা করে তারা অগ্রসর হচ্ছে। মোঙ্গল যোদ্ধারা তা প্রতিহত করতে পারছে না।

যুদ্ধে মুসলমানরাও যে নিহত হচ্ছে না, তা নয়। তবে একজন মুসলমান শহীদ হওয়ার পূর্বে দশজন মোঙ্গল যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করে তবেই শহীদ হচ্ছে। আর কোনো মুসলমান শহীদ হলেই পার্শ্ববর্তী মুসলমান যোদ্ধা এগিয়ে এসে সেই মোঙ্গল যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করে দিচ্ছে।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতি দেখে মোঙ্গল যোদ্ধারা ঘাবড়ে গেলো। তাদের মনোবল ভেঙে গেলো। হাতের তলোয়ার যেনো আর আগে বাড়তে চায় না। এদিকে মুসলমান যোদ্ধাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। মোঙ্গল যোদ্ধারা আর স্থির থাকতে পারলো না। তারা পিছু হটতে লাগলো। হালাকুখান আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের স্থির রাখতে পারলো না। তারা পালাতে শুরু করলো। মোঙ্গল যোদ্ধারা নিজেদের লোকদের পদদলিত করে পালাতে লাগলো। দারুণ বিশৃঙখলা সৃষ্টি হলো। অবশেষে হালাকু খানও পালালো। নেকড়ের তাড়া খেয়ে ছাগল যেভাবে উর্ধ্বশ্বাসে পালায়, ঠিক তেমনিভাবে পালালো।

উনচল্লিশ.

পলায়নপর মোঙ্গল যোদ্ধারা পেছন ফিরে তাকানোর অবকাশ পেলো না। ছুটছে তো ছুটছেই। সেনা ছাউনী পশ্চাতে ফেলে তারা এগিয়ে গেলো। ফাতহুদ্দীন অবসন্ন দেহে ফিরছিলো। মুজাহিদুদ্দীন আইবেক ঘোড়া নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। বললো, কী খবর? ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরছো বুঝি?

ফাতহুদ্দীন বললো, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। রক্তপিপাসু মোঙ্গলরা পরাজিত হয়ে পালিয়েছে।

মুজাহিদুদ্দীন বললো, অসম্পূর্ণ বিজয়েই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছো? ফিরে না গিয়ে তাদের ধাওয়া করো।

ফাতহুদ্দীন বললো, এমন পরিস্থিতিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। মোঙ্গলরা পালিয়ে যাচ্ছে, যেতে দাও।

মুজাহিদুদ্দীন বললো, ভুল করো না। তাদের পা টলে গেছে। আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসেছে। ধাওয়া করে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দাও, যেনো আর কখনো ইরাকের দিকে চোখ তুলে না তাকায়।

ফাতহুদ্দীন বললো, এটা ভুল হবে। কারণ, আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম। তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। যদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, তাহলে হতে পারে, তারা রুখে দাঁড়াবে, আক্রমণ করবে।

মুজাহিদুদ্দীন বললো, এটা তোমার ভুল ধারণা। আমাদের প্রভাব ও ভয় তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাবে আর আমরা তাদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তা দিয়ে ফিরবো?

ফাতহুদ্দীন বললো, তুমি মোঙ্গলদের স্বভাব-চরিত্র জানো না। তারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধে পেরে না ওঠলে পালিয়ে যায়। কিন্তু পশ্চদ্ধাবন করলে তারা রুখে দাঁড়ায়। জীবন দিয়ে' যুদ্ধ করে। কারণ, এটা তাদের আত্মমর্যাদার বিষয়। মর্যাদার জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। তাদের ধাওয়া করা আমাদের উচিত হবে না। বরং এখানেই অবস্থান করে দেখা দরকার তারা কী করে? তারা কি খোরাসানেই পালিয়ে যায়, না থেমে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

মুজাহিদুদ্দীন বললো, এটা ভুল হবে। আমরা যদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করি, তাদের পুনঃপ্রস্তুতি ও বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেই, তাহলে তারা পুনরায় সমবেত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ করবে। আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো না। ফলে আমাদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হবে।

ফাতহুদ্দীন বললো, আক্রমণে আমার মতো কেউ নেই। যদি সত্যিই তাদের

উপর আমাদের প্রভাব ও ভয় সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তারা খোরাসানে পৌঁছার পূর্বে থামবে না। সেখানে পৌঁছে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

মুজাহিদুদ্দীন বললো, যদি মোঙ্গলদের ভয় পেয়েই থাকো আর আক্রমণ করতে না-ই চাও, তাহলে আমি কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করছি না। তুমি ফিরে যাও। আমি তাদের উপর আক্রমণ করতে চললাম।

ফাতহুদ্দীনের কণ্ঠ বদলে গেলো। শান্তকণ্ঠ অশান্ত হয়ে ওঠলো। বললো, তুমি আমার কথা মানছো না। ভুল পথেই অগ্রসর হতে যাচ্ছো। তবে শুনে রাখো, আমিও তোমার এই ভুল পথেই অগ্রসর হবো। আমি কুরাইশ নারীদের একথা বলবার সুযোগ দেবো না, নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এসেছো। আমার বীরত্বের বিস্ময়কর কাহিনী আরব জাতির মুখে মুখে থাকলেও আমি জানি, আমার মৃত্যু আমাকে ঠেলে ঠেলে মোঙ্গলদের সামনে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সত্যই মানুষ তকদীরের কাছে দায়বদ্ধ। তকদীর থেকে পালিয়ে সে কোথাও যেতে পারবে না।

উভয় সেনাপতি মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ঘোড়া হাঁকালো। মুসলমান যোদ্ধারাও তাদের পিছু পিছু ছুটলো। গোটা বাহিনী নিয়ে দ্রুত চলা অসম্ভব। তবু তারা যথাসম্ভব দ্রুত ছুটলো। কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর তারা উড়ন্ত ধূলি দেখতে পেলো। ফাতহুদ্দীন বললো, ঐ ধূলির পশ্চাতে মোঙ্গল বাহিনী রয়েছে। তারা ফিরে যাচ্ছে। এখনো সময় আছে, পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করো। তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দাও।

মুজাহিদুদ্দীন আবার সেই তর্ক শুরু করলো। বললো, আমি বলছি, এটাই তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাতের সুবর্ণ সুযোগ।

ফাতহুদ্দীন বললো, চলো, আমরা ভাগ্যের কাছে পরাজিত হতে যাচ্ছি। তারা আবার ঘোড়া ছুটালো। ছুটতে ছুটতে একেবারে মোঙ্গল বাহিনীর নিকট গিয়ে পৌঁছলো। তাদের ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে মোঙ্গলরা পশ্চাতে ফিরে দেখলো। তাদের কয়েকজন চিৎকার করে বললো, মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। কয়েকজন মোঙ্গল অফিসার ফিরে তাকিয়ে দেখলো। তারা মুসলমানদের দেখেই চিৎকার করে ওঠলো– হে তমুচীনের সন্তানরা! মুসলমানরা মনে করেছে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। তাই তারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। এটা আমাদের কলংক। এটা আমাদের অপমান। এ লাঞ্ছনার পূর্বে মরে যাওয়াই উত্তম। বাজাও, যুদ্ধের ডংকা বাজাও।

অফিসারদের এই নির্দেশ মাত্রই যুদ্ধের ডংকা বেজে ওঠলো। সাথে সাথে মোঙ্গল যোদ্ধারা থেমে গেলো। গোটা মোঙ্গল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

হালাকুখান মাঝে। যুদ্ধের ডংকার আওয়াজ শোনামাত্র বললো, মনে হচ্ছে, মুসলমানরা আমাদের পশ্চদ্ধাবন করছে। তাহলে কী আমরা ভীতু-কাপুরুষ? এ লাঞ্চনার পূর্বে তো মৃত্যুই শ্রেয়। হে তমুচীন! চেঙ্গিস খানের সন্তানরা এ লাঞ্চনা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

সে চিৎকার করে বললো, হে মোঙ্গল যোদ্ধারা! তোমরা ভয় কী জিনিস জানো না। মারা আর মরাকেই জানো। এবার মরণযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে নাও। আজ তোমাদের সুনাম, সুখ্যাতি ও গর্ব ধুলায় ধূসরিত হতে যাচ্ছে। তোমরা চারণভূমির অনুসন্ধানে এসেছিলে। মহান সূর্যদেবতা তোমাদের সবুজ-শ্যামল ভূমি দান করেছেন। তোমরা কি তা ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবে? কিছুতেই নয়। রক্ত দাও। শির দাও। রক্তের বন্যা বইয়ে দাও। প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও।

মোঙ্গল যোদ্ধারা নবপ্রাণ ফিরে পেলো। চিৎকার দিয়ে সম্মতি জানালো এবং কোষ থেকে চক্‌চকে তরবারী বের করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানরা প্রায় তাদের নিকটে পৌঁছে গেলো। বীরবিক্রমে তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো। প্রথম আক্রমণেই মুসলমানদের প্রথম সারির যোদ্ধাদের শেষ করে ফেললো।

আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। ঠন ঠন শব্দে তলোয়ার চলতে লাগলো। শিরের পর শির কেটে মোঙ্গল বাহিনী অগ্রসর হতে লাগলো। এ যুদ্ধ এক হোলিখেলায় পরিণত হলো।

ফাতহুদ্দীন যথার্থই বলেছিলো। মোঙ্গলরা বরদাশত করতে পারেনি, মুসলমানরা তাদের পশচাদ্ধাবন করবে। তারা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হয় মরবে, না হয় প্রাণ দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করবে। তাই তারা এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করলো যে, মুসলমানরা দৃঢ়পদে দাঁড়াতেই পারলো না– পিছু হটতে লাগলো।

মোঙ্গলদের আক্রমণের তীব্রতা দেখে অদূরদর্শী মুজাহিদুদ্দীনের উত্তেজনা-স্পর্ধা পানি হয়ে গেলো। সে ক্রমে পিছু হটতে লাগলো। মুসলমান যোদ্ধারাও পিছু হটতে লাগলো। ফাতহুদ্দীন এই পশ্চাৎপদতা সহ্য করতে পারলো না। আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে অগ্রসর হলো এবং বিদ্যুদ্গতিতে মোঙ্গলদের উপর আক্রমণ করলো। প্রথম আক্রমণেই এক মোঙ্গল সরদারকে হত্যা করলো। আরো কয়েকজন যোদ্ধা তার আঘাতে লুটিয়ে পড়লো।

মোঙ্গলদের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলো। তারা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফাতহুদ্দীন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়তে লাগলো। ইতিমধ্যে কয়েকজন মোঙ্গল যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করলো। কিন্তু তার শরীরে বেশক'টি আঘাত লেগেছে। জখম থেকে রক্তের ধারা ছুটছে।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে জখমের দিকে মুহূর্তের জন্যও ফিরে তাকালো না। যুদ্ধ করতে করতে আরো দু'জন সরদারকে হত্যা করলো। কিন্তু তার দিকে শত শত চকচকে তরবারী এগিয়ে এলো। প্রচুর রক্তক্ষরণে বাহুর শক্তিও প্রায় নিঃশেষ। হঠাৎ এক মোঙ্গল যোদ্ধার প্রচণ্ড আঘাতে লুটিয়ে পড়লো।

ফাতহুদ্দীনের শাহাদাতবরণের সাথে সাথেই যেনো মুসলমানদের মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেলো। পালাও পালাও বলে পেছনে ছুটতে লাগলো। পলায়নপর মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে সবার আগে মুজাহিদুদ্দীন। মোঙ্গল যোদ্ধারা পশ্চাদ্ধাবন করে বহু মুসলমান যোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এক অদূরদর্শী একরোখা সেনাপতির কারণে একটি নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। এখান থেকেই শুরু হলো মুসলমানদের রক্তের ইতিহাস। পরাজয়ের ইতিহাস। আর্তচিৎকার আর আহাজারির ইতিহাস। মুসলমানদের গৌরবের ইতিহাসের চাকা এবার উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করলো। সে চাকা শুধুই ঘুরছে। অধঃপতনের দিকে ঘুরছে। কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে। তা আর থামেনি।

চল্লিশ.

মুজাহিদুদ্দীন আইবেক এমন আতংকগ্রস্ত হয়ে পালালো যে, ক্ষণিকের জন্যও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা বাগদাদে গিয়ে পৌঁছলো। কেল্লায় প্রবেশ করার পর সে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিছু সৈন্য রণক্ষেত্রেই নিহত হয়েছে। কিছু তার সাথে পালিয়ে এলো। আর আত্মমর্যাদাশীল কিছু সৈন্য পরাজয়ের লাঞ্ছনা মেনে না নিতে পেরে আক্ষেপে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লো।

ফাতহুদ্দীনের পরামর্শই সঠিক ছিলো। যদি মোঙ্গল যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করা না হতো, তাহলে তারা ইরাক থেকে চলে যেতো এবং খোরাসান গিয়ে দম ফেলতো। কিন্তু মুজাহিদুদ্দীন আইবেক একগুঁয়েমী করে মোঙ্গলদের ধাওয়া করেছে। তার অদূরদর্শিতার কারণেই বিজয় পরাজয়ে পরিণত হলো আর মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

মুজাহিদুদ্দীন আইবেক খলীফার সকাশে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের ঘটনা এমন চতুরতার সাথে বর্ণনা করলো, যেনো তার বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কারণে বিজয় হয়েছিলো। তারপর সে মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো। মোঙ্গলরা দারুণ আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু মুসলমান যোদ্ধাদের মন্থরগতি ও অলসতা সর্বনাশ করলো। বীরবিক্রমে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলো না। অথচ মোঙ্গল যোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে বীরবিক্রমে আক্রমণ করলো। ফলে পরাজয় বরণ করতে হলো।

খলীফার মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছুই ছিলো না। আর যা ছিলো তাও মদের বদৌলতে শেষ হয়ে গেছে। তিনি আইবেকের বেঁচে আসার কারণে মুবারকবাদ জানালেন। কিন্তু মোঙ্গলদের প্রতিহত করতে হবে এবং তাদের মোকাবেলার জন্য আরো সৈন্য পাঠাতে হবে, সে চিন্তা তার মাথায় এলো না। বাগদাদে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, শাহী ফৌজ মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। জনসাধারণের মাঝে এ ভয় ছড়িয়ে পড়লো, যদি মোঙ্গলরা বাগদাদ অবরোধ করে, তাহলে কী দশা হবে। কারণ, জনসাধারণ সবাই জানতো, মোঙ্গল যোদ্ধাদের সাথে মোকাবেলা করার মতো ফৌজ বাগদাদে নেই। পূর্বেই অধিকাংশ ফৌজকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। এখন অল্প কিছু ফৌজ বাকি আছে মাত্র।

তখনো সময় ছিলো, যদি বাগদাদের অধিবাসীরা নাচ-গান, আনন্দ-ফূর্তি ছেড়ে আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো, সাহসিকতার সাথে সামনে অগ্রসর হতো আর যুবকরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অবশিষ্ট ফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মোঙ্গলদের মোকাবেলা করতো, তাহলে বাগদাদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতো।

কিন্তু বাগদাদের অধিবাসীদের চোখ খোলেনি। চোখ থাকতেও তারা অন্ধত্বের জগতেই বিরাজমান রইলো। আগের মতোই তারা আনন্দ-স্ফূর্তি আর উল্লাসে মেতে রইলো। একের পর এক নাচ-গানের আসর হতে থাকলো। রাত-দিন বাগদাদের ঘর থেকে অট্টহাসির আওয়াজই ভেসে আসছে। বাগদাদের ইথারে ইথারে শুধু বাদ্যযন্ত্রের মোহনীয় সুরধ্বনিই বাজছে।

বাগদাদের অধিবাসীরা সম্পদশালী। নিশ্চিন্ত তাদের জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা বাগদাদের অধিবাসীদের সকল প্রকার নেয়ামত অপরিমিত দান করেছেন। নেয়ামত পেয়ে তারা আল্লাহ তায়ালাকেই ভুলে গেছে। সারাদিন তার নাফরমানিতেই মেতে আছে।

আবুবকর, আহমার ও আহমদও শুনলো, মোঙ্গলরা শাহী ফৌজকে পরাজিত করেছে। তারা বুঝে ফেললো, এখন মোঙ্গলদের দুঃসাহস বেড়ে গেছে। এখন তারা বাগদাদ প্রান্তে পৌঁছে তবে নিঃশ্বাস ফেলবে। একদিন তারা আবুবকরের অট্টালিকায় এসে জমায়েত হলো। পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা হলো।

আহমদ বললো, বাগদাদে থাকা এখন আর নিরাপদ নয়। কখন কী ঘটে বলা মুশকিল।

আবুবকর বললো, তোমার ধারণা সত্য। কিন্তু আমরা এখন কী করবো? আমরা কি খলীফাকে ছেড়ে চলে যাবো?

ঃ না গিয়েই বা কী করবে? খলীফা তো একেবারে অন্ধ হয়ে আছেন। তিনি

এখন ইবনে আলকামীর হাতের পুতুল। নিজের বিবেক দ্বারা তিনি কিছুই করেন না।

ঃ তোমার উত্তেজনা ও ক্ষোভ যথার্থ। এতে ফল দাঁড়াবে, আমরা ইবনে আলকামীর নিকট পরাজয়বরণ করলাম। সে একা-নিঃসঙ্গ। আর আমরা একাধিক। তাকে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য করা হবে।

ঃ এটা অসম্ভব। আমাদের কেউই কোনো ক্ষমতার অধিকারী নই। আমাদের মাঝে তুমি যুবরাজ। অথচ সালতানাতের কোনো বিভাগে তোমার কোন পদ নেই। ইবনে আলকামী উজীরে আজম। গোটা সালতানাত তার হাতের মুঠোয়। তার কথায় প্রশাসন চলে। আমাদের কথার কোনো মূল্য নেই। সে ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছে। খলীফা এতে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং আনন্দিতই হয়েছেন। অথচ কোনো শাসকেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি সামরিক শক্তি ছাড়া হয় না। তাতারীরা আক্রমণ করলো; অথচ বাগদাদের ফৌজ নেই। তাহলে মোকাবেলা হবে কীভাবে?

ঃ সব কথাই ঠিক। তবে ইবনে আলকামী খলীফাকে বশ করে নিয়েছে। আমরা কেনো তা পারবো না। আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

আহমার বললো, খলীফা শুধু ঐ কথাই শুনবেন, যাতে সম্পদ খরচ হবে না, বরং সম্পদ আগমনের পথ সুগম হবে। তিনি অত্যন্ত লোভী, কঞ্জুস হয়ে পড়েছেন। ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করাই তার ভাবনা। ফৌজ ভর্তি করলে সম্পদ খরচ হবে, তাই তিনি তা মেনে নেবেন না।

ঃ তোমার কথা সবই ঠিক। তবুও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তাকে অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

ঃ তাহলে পুনরায় গিয়ে খলীফাকে পুরো ঘটনা অবহিত করা দরকার।

ঃ চলো এক্ষুনি যাই।

তিনজনই খলীফার প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। প্রাসাদে পৌঁছে দেখে খলীফা অলস বসে আছেন। তারা ভেতরে গিয়ে খলীফাকে সালাম করলো। সালামের উত্তর দিয়ে খলীফা তাদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। খলীফা বললেন, তোমরা বোধ হয় কিছু বলতে এসেছো।

আবুবকর বললো, জি, মহামহিম খলীফা হয়তো শুনে থাকবেন, শাহী ফৌজ তাতারীদের কাছে পরাজয়বরণ করেছে।

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। মুজাহিদুদ্দীন আইবেক ঘটনাটি আমাকে সবিস্তারে শুনিয়েছে। আমি ইবনে আলকামীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে, মোঙ্গল যোদ্ধারা ফিরে যাবে। ইসলামী ফৌজের ভয় তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঃ যদি সে এমন বলে থাকে, তাহলে নির্ঘাত সে অসত্য বলেছে। বাস্তব হলো, মোঙ্গলদের সাহস আরো বেড়ে গেছে। তারা সামনে এগিয়ে আসছে।

ঃ বোধ হয় তোমরা ভুল বলছো।

আহমার বললো, মহামহিম খলীফার পদতলে আমার প্রাণ উৎসর্গিত। আমার বিশ্বাস, ইবনে আলকামী আজ পর্যন্ত আপনাকে যতো কথা বলেছে, সব মিথ্যা। ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করা, ফৌজের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায় করা এসব কিছু এক গভীর ষড়যন্ত্র ছিলো। এর সম্পর্ক মোঙ্গলদের আক্রমণের সাথেও সম্পৃক্ত। বরং আমি বলতে চাই, আক্রমণের জন্য মোঙ্গলদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

খলীফার কণ্ঠে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললো, কে? কে আমন্ত্রণ করেছে?

আহমদ বললো, ইবনে আলকামী ছাড়া আর কে?

বুঝলাম না, তোমরা কেনো এই বেচারার বিরুদ্ধে এতো অভিযোগ নিয়ে আসছো। সে তো এতো নিমকহারাম হতে পারে না!

আবুবকর বললো, মহামহিম খলীফা, সে তো বোকা নয়। অত্যন্ত চালাক। দেশ ও জাতির শত্রু। প্রথমে সে শিয়া-সুন্নী ধোঁয়া তুলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তাতে সফল হয়নি। তারপর সে ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছে। কর আদায়ের জন্য ফৌজ নিয়োগ করেছে, যেনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধে। তারপরই মোঙ্গলদের হামলা হলো। এসব মিলিয়ে বুঝে আসে যে, সে অবশ্যই গাদ্দারী করছে, সে মুনাফিক।

খলীফা রুষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। তার গাদ্দারীর স্বপক্ষে কি তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে?

আবুবকর অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললো, আফসোস! আমাদের নিকট কোনো প্রমাণ নেই। তবুও আমাদের দাবিই সত্য।

খলীফা বললেন, দলিল-প্রমাণহীন দাবির কোনো মূল্য নেই। আচ্ছা, আমি এখনই ইবনে আলকামীকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

খলীফা ইবনে আলকামীকে ডেকে পাঠান। কিছুক্ষণ পর ইবনে আলকামী খলীফার সকাশে উপস্থিত হলেন।

খলীফা বললেন, মোঙ্গল ফৌজরা কি ফিরে গেছে?

ইবনে আলকামী বললেন, জ্বি। মহামহিম খলীফার প্রভাবে ভীত হয়ে মোঙ্গল ফৌজ চলে গেছে।

আবুবকর বললো, কিন্তু আমি সংবাদ পেয়েছি, তারা এগিয়ে আসছে। পথে যে জনপদই সামনে পাচ্ছে, ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।

ইবনে আলকামী বললেন, আমি এমন কোনো সংবাদ পাইনি। আমার মনে হয় এতে কোনো সত্যতা নেই।

আবুবকর বললো, তাহলে কি আপনি সে সময়ের অপেক্ষায় আছেন, যখন মোঙ্গল বাহিনী বাদদাদ অবরোধ করে ফেলবে?

ইবনে আলকামী বললেন, নিশ্চিন্তে থাকুন। এমন হবে না, হতে পারে না।

আহমার বললো, বিষয়টি ভয়াবহ। মোঙ্গলরা একবার আক্রমণ করে বিজয়ী হয়ে ফিরে যাওয়ার মতো নয়। তবে ভবিষ্যতের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফৌজে কি লোক ভর্তি করা যায় না?

ইবনে আলকামী বললেন, কোনো আশংকাই যখন নেই, তখন অপ্রয়োজনে ফৌজে লোক ভর্তি করে লাভ কী?

খলীফা বললেন, এরা চায় প্রয়োজন ছাড়াই সম্পদ ব্যয় করা হোক।

আবুবকর বললো, প্রয়োজন নেই এমন নয়। বরং মুসলমানদের জীবন-সম্পদ ও ইসলামী খেলাফত রক্ষার স্বার্থে সম্পদ ব্যয় করা অবশ্যই প্রয়োজন।

খলীফা বললেন, যদি কোনো বিপদ এসেই পড়ে, তবে তা রক্ষার জন্য মুসলমানরাই তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে।

খলীফার কথা শুনে শাহজাদারা বিস্ময়ে বিমূঢ়। তারা বুঝে ফেললো, খলীফা অর্থের লোভে দেশ ও জাতির কোনো পরোয়া করছেন না। সুতরাং তার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তাই তারা আক্ষেপ করতে করতে খলীফার প্রসাদ থেকে বেরিয়ে এলো।

একচল্লিশ.

উজীরে আযম ইবনে আলকামী অত্যন্ত বাকপটু। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাতে তার জুড়ি নেই। কথার ফুলঝুড়িতে তিনি খলীফাকে আশ্বস্ত করে ফেললেন, শাহী ফৌজ পরাজিত হয়ে ফিরে আসার পর মোঙ্গলরা ফিরে গেছে। বাগদাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার আর সাহস পায়নি। অথচ বিষয়টি একেবারে উল্টো। শাহী ফৌজের পরাজিত হওয়ার পর তাদের দুঃসাহস ও মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হালাকুখানের উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসী বারংবার হালাকুখানকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাছাড়া ইবনে আলকামীর দূত একের পর এক আসছে আর হালাকু খানকে আশ্বস্ত ও অভয় দিচ্ছে, বাগদাদে কোনো ফৌজ নেই। সুতরাং মোকাবেলার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। আমাদের উজীরে আজম ইবনে আলকামী আপনার অপেক্ষার প্রহর গুণছেন।

এতো কিছুর পরও হালাকুখানের মন কিন্তু আশংকামুক্ত হয়নি। সারাক্ষণ কিসের দুশ্চিন্তা যেনো তাকে তাড়া করে ফিরছে। ভাবছে, খলীফা যতোই নির্বোধ

হোক, খেলাফত সম্পর্কে যতোই বেপরোয়া হোক, কিন্তু যখন সে শুনবে মোঙ্গল বাহিনী এগিয়ে আসছে, তখনই দেশ, জাতি, খেলাফত ও শাসনক্ষমতা রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠবে। সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবেলা করবে।

অথচ তার খবর ছিলো না যে, মুসলমানদের খলীফা ও ইসলামী খেলাফতের কর্ণধার এক গাদ্দার নিমকহারাম উজীরের খেলনার পুতুল হয়ে গেছেন। মদ্যপ, লোভী, ভীরু এই খলীফা তার জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সকল গুণাবলী হারিয়ে তাদের কলংক হয়ে বসেছেন। তিনি এতোটুকুও জানতেন না, মোঙ্গল বাহিনী ফিরে গেছে না এগিয়ে আসছে। না তার নিকট কোনো ফৌজ আছে, না মোঙ্গলদের মোকাবেলায় কোনো ফৌজ পাঠাতে তিনি সক্ষম। তবুও তিনি নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। আনন্দ-উল্লাস, মদ আর নারীর মাঝে ডুবে আছেন। ইবনে আলকামীর জালে তিনি পুরোপুরি জড়িয়ে গেছেন।

হালাকুখান তার বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে। ধীরগতিতে আসতে চাচ্ছে সে। কারণ, তার ভয় কখন শাহী ফৌজ এসে যমদূতের মতো সামনে দাঁড়ায়। তাই সে উজীরে আযম নাসীরুদ্দীন তুসী ও ইবনে আলকামীর প্রেরিত দূতদের কথায় তেমন সায় দিলো না। কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে এলেও যখন শাহী ফৌজের কোনো পাত্তা পেলো না, তখন তার সাহস বেড়ে গেলো। সকল ভয়-আশংকা তার হৃদয় থেকে উবে গেলো। সে এখন দ্রুত বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আর সামনে মুসলমানদের যে জনপদ পেলো, তাতে বর্বর আক্রমণ শুরু করলো। নির্ভয়ে নির্দয়ভাবে রক্তের হোলিখেলায় মেতে ওঠলো।

তার নির্দেশ, বাগদাদের পথে যে জনপদ পড়বে, তার নারী-পুরুষ-শিশু কাউকে ছাড়বে না, নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নেবে। তারপর তাতে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেবে।

মোঙ্গলরা ছিলো অসভ্য, বর্বর জাতি। তারা পাহাড়-পর্বত আর রুক্ষ মরুর বুকে পশুর মতো জীবন-যাপন করতো। পশুপালন আর লুটতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহ তাদের কলঙ্কময় ইতিহাস। তাহজীব-তমদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী, তা তারা বুঝতো না। ধন-দৌলতের শোভা ও চাকচিক্য তারা দেখেনি। রাজ্য পরিচালনা ও ক্ষমতার অমীয় স্বাদ তারা উপভোগ করেনি। ছিলো চীনাদের শাসিত গোলাম। বন্যপশুর ন্যায় বসবাস করতো। নির্বিবাদে চীনাদের অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতো। তাই তারা যে জনপদ অতিক্রম করতো, তা ধ্বংস্তূপে পরিণত করতো। যাকেই সামনে পেতো, তলোয়ারের আঘাতে ধরাশায়ী করতো। দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার লেশমাত্র ছিলো না তাদের চরিত্রে।

মোঙ্গল বাহিনীর সাথে ছিলো হালাকুখানের উজীরে আযম নাসীরুদ্দীন তুসী। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর এই নির্মম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের কারণে এবং মুসলিম বসতির উপর এই ধ্বংসলীলার কারণে তার হৃদয়ে একটুও অনুকম্পা জাগলো না। মোঙ্গলদের সাথে থেকে তার হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে।

মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলায় মাটিতে মিশে যাওয়া শহর ও জনপদ থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া কিছু লোক পালিয়ে অনত্র গিয়ে তাদের ধ্বংসের নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দিতে লাগলো। ফলে অন্যান্য গ্রাম-শহরেও ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো। এ ভয়াল মৃত্যু বিভীষিকা সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক। চারদিক নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত।

অবস্থার ভয়াবহতায় দূরদর্শী, বুদ্ধিমান ও ত্যাগী লোকেরা তাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললো। ধন-ঐশ্বর্য, অট্টালিকা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দের হাতছানিকে পদদলিত করে নিজের ও ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের জীবন নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে মিসরের দিকে অনিশ্চিত যাত্রা শুরু করলো। আর যারা ধন-ঐশ্বর্য ও বিত্ত-বৈভবের লোভে আটকে গেলো, তারা ভাবতে লাগলো, এই অঢেল ধন-দৌলত কীভাবে নিয়ে যাবো। স্থাবর এই মনোরম অট্টালিকা ও প্রাসাদগুলোর পরিণতি কী হবে? কার কাছে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করবে। লালসার টানাপড়েনে চক্কর খেতে খেতে সত্যিই একদিন তারা মোঙ্গল বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করলো।

মোঙ্গলরা কোনো শহর বা জনবসতিতে আক্রমণ করলে প্রথমেই তার নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করতো। তবে যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হতো, সে ধনদৌলত লুকিয়ে রেখেছে, তাকে ধরে আনতো। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য উত্তপ্ত লাল টকটকে লৌহ শলাকা দ্বারা তার শরীরে ছেক দিতো। কাউকে ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে মারতো। কাউকে আঘাতের পর আঘাত করতো। সারাদেহ রক্তাক্ত করে পরে নির্মমভাবে হত্যা করতো। আবার কারো শরীর থেকে ধারালো ছুরির ফলার টানে টানে চামড়া তুলে ফেলতো। অসহায় মাসুম শিশুদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করতো। তাদের ভয়ার্ত চিৎকার, আহাজারি আর মায়েদের বিনয়-কাতর ফরিয়াদ তাদের রক্ষা করতো না। তাদের হৃদয়ে একটু দয়ার আবেগও সৃষ্টি হতো না। বরং নিষ্পাপ শিশু আর মহিলাদের নির্মমভাবে হত্যা করতো।

মোঙ্গল সৈন্যরা যে বাড়িতেই আক্রমণ করতো, প্রথমে পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করতো। আর রূপসী যুবতীদের নিয়ে পৈশাচিক খেলায় মত্ত হতো। টেনে-হেঁচড়ে বিবস্ত্র করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তো অসুরের শক্তি

নিয়ে। নারীর কৌমার্য চাদরকে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত করে তরবারীর আঘাতে নিথর-নিস্তব্ধ করে দিতো।

তাই হাজার হাজার নারী এই মোঙ্গল অসুরদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিতো। হত্যালীলার পর তারা লুটপাটে নেমে পড়তো। স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরত, মনি-মুক্তা, চুন্নি-পান্না যা পেতো লুটে নিতো। তারপর চারদিক থেকে জনবসতিতে আগুন লাগিয়ে দিতো। আগুনের লেলিহান শিখা আর অনন্ত আকাশে বিলীয়মান ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে চারদিক হাহাকার পড়ে গেলেও কোনো কান্নার আওয়াজ শোনা যেতো না। কোনো আহাজারি বাতাসকে ভারী করতো না। এমনি ধ্বংসলীলায় মাতাল-মত্ত মোঙ্গল বাহিনী রূপসী নগরী বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

মোঙ্গলদের এই যাত্রাপথে কোনো শহর পড়লে শেয়ালের ন্যায় তাদের চক্ষু ঝলমল করে উঠতো। লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ আর যৌনতার পৈশাচিক আনন্দে তাদের পাষাণহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠতো। মোঙ্গলদের আগমন সংবাদে মুসলমানরা শহরের ফটকসমূহ বন্ধ করে দিলো এবং দূত পাঠিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো। তখন হালাকুখান দূতকে বলে পাঠালো, যাও মুসলমানদের গিয়ে বলো, তাদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা রইলো। কিন্তু কেউ সাথে কোনো কিছু নিতে পারবে না। আর এ শহরেও কেউ থাকতে পারবে না। নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সবাই কপর্দকহীন অবস্থায় বেরিয়ে এই মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হবে। তারপর যার যেখানে খুশি চলে যাবে।

দূত গিয়ে যখন মুসলমানদের হালাকুখানের সংবাদ শুনালো, তখন তারা আক্ষেপ করতে করতে বললো, হায়! শেষ পর্যন্ত বুঝি আর বাঁচা গেলো না! দেশান্তর হতেই হলো! তবে কেনো এর আগেই বেরিয়ে গেলাম না। তাহলে তো কিছু সম্পদও সাথে নেয়া সম্ভব হতো। হায়! এখন কি উপায় হবে। না আমাদের মোকাবেলা করার সামর্থ আছে, না শাহী ফৌজের আগমনের কোনো আশা করা যায়। এর আগে তো শহরের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর ফৌজ থাকতো। কিন্তু ইবনে আলকামী এ কী করলো! এখন তো হালাকুখানের কথা নতশিরে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই!

এভাবে আফসোস করতে করতে, বিগলিত অশ্রু মুছতে মুছতে শহরের নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীরা বেরিয়ে গেলো এবং দলে দলে মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হলো। এরপর রক্তপিপাসু হালাকুখান তার বাহিনী নিয়ে এই অসহায় মানুষগুলোকে পরিবেষ্টিত করে ফেললো এবং উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ বিশ্বাসঘাতকতা দেখে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হতবাক্! কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তারা ছুটে হালাকুখানের নিকট গিয়ে বললো, অসহায়

মানুষগুলোর উপর আপনার সৈন্যরা এ কেমন আচরণ করছে! আমরা তো আপনার হুকুম তামিল করে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছি!

অট্টহাসির পর হালাকুখান বললো, তাহলে কি তোমরা মনে করছো, আমি তোমাদের জীবিত ছেড়ে দেবো আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে তরবারী হাতে রুখে দাঁড়াবে? না, সে সুযোগ আমি কখনো তোমাদের দেবো না।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন আফসোস করতে লাগলো, হায়! যদি আপনার এমনই ধারণা হয়, তাহলে শুধু যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন পুরুষদের হত্যার নির্দেশ দিন। অবলা নারী ও নিষ্পাপ শিশুদের নির্মমভাবে কেনো হত্যা করছেন?

নিষ্ঠুর হালাকুখান তখন পরম পৈশাচিক তৃপ্তির সুরে বললো, হ্যাঁ, সাপ মেরে সাপের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

কেউ হয়তো সাহস করে বললো, কিন্তু আপনি তো আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন!

হালাকুখান তখন কূটিল কণ্ঠে বললো, সে তো তোমাদেরকে শহর থেকে বের করে আনার একটি কৌশল ছিলো মাত্র।

পাষাণ হালাকুখান। মানুষের রক্ত নিয়ে তার খেলা। লুটপাট আর ধ্বংসলীলা তার নেশা। তার জীবন অভিধানে দয়া-মায়া, মমতা ও ক্ষমা– এ ধরনের কোনো শব্দ নেই। তাই সে তার মতেই অটল-অবিচল।

হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে চারদিকে থেকে ঘেরাও করে হালাকুখানের বাহিনী তরবারীর আঘাতে নিঃশেষ করে চলেছে। আহাজারি, আর্তনাদ, মৃতের গোঙ্গানী আর রক্তের সয়লাবে কেয়ামতের অবস্থা সৃষ্টি হলেও হালাকুখানের কোনো পরিবর্তন নেই। আরো মারো, আরো কাটো এ-ই তার নির্দেশ।

নারী-পুরুষ আর শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করলেও হালাকুখানের বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য রূপসী যুবতীদের হত্যা না করে দূরে সরিয়ে রাখতো। সবাইকে হত্যা করে তারপর এই যুবতীদের দিকে মনোনিবেশ করতো এবং নিজেদের মাঝে তাদের বন্টন করে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতো। কেউ তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণে দেরি করলে বা অসম্মতি প্রকাশ করলে তার আর রক্ষা নেই। সব শেষ করে পরে নির্দয়ভাবে তার জীবনটিও শেষ করে দিতো।

বিয়াল্লিশ.

মোঙ্গল বাহিনী হত্যালীলা আর ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রেখে ক্রমে বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে এলাকা দিয়ে তারা অতিক্রম করবে, সে এলাকার কোনো মানুষকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে দেবে না। ফসলের জমি ও বাগবাগিচা ধ্বংস করে দেবে আর জনবসতিগুলো জ্বালিয়ে

নিঃশেষ করে ফেলবে। তাই তারা সবুজ-শ্যামল অঞ্চলগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব ভস্ম করে ফেললো। এভাবেই তারা বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিধ্বস্ত এলাকার কিছু লোক প্রাণ নিয়ে বাগদাদে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সর্বস্বহারা এই মানুষগুলো বাগদাদে পৌঁছেই পাগলের মতো মাতম তুলে কাঁদতে লাগলো আর মোঙ্গলদের বর্বর ও নির্মম হত্যা ও ধ্বংসের বিবরণ দিতে লাগলো। ফলে শ্রোতারাও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। গোটা বাগদাদ যেনো ভয়ার্ত নগরীতে পরিণত হলো। সবার মুখে মোঙ্গলদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও ধ্বংসলীলার বর্ণনা। বাঁচার আবেগে সবার হৃদয়ে ত্রাহি ত্রাহি ভাব। সবাই ভীত। সবাই সন্ত্রস্ত।

সবাই বলাবলি করতে লাগলো, এই বুঝি খোদায়ী আযাব এগিয়ে আসছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করলে এভাবেই গজব আসে। হায়! এবার এ থেকে বাঁচার উপায় কী? কিন্তু এই বলাবলিই সার। কাজের কাজ কিছুই হলো না। কেউ তাওবা করে দীনদার হলো না, পরহেজগার হলো না।

সংবাদটি জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার পর এক কান দু'কান হয়ে উজির, শাহজাদা এমনকি খলীফার কানেও গিয়ে পৌঁছলো। আমীর ও বাগদাদের গণ্যমান্য একদল লোক জনপ্রতিনিধি হিসেবে খলীফার নিকট গেলো। বর্তমান অবস্থার ভয়াবহতার বর্ণনা করে প্রতিনিধি প্রধান বললেন, আলা হযরত! এই ধ্বংস, এই মৃত্যুর হাতছানি শুধু যে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তা নয়, বরং আপনাকেও তা গ্রাস করবে। ঝড়ের ন্যায় এই যে ধ্বংসলীলা আসছে, আল্লাহর দিকে চেয়ে এর থেকে জাতিকে উদ্ধার করুন, মুক্ত করুন।

খলীফার কণ্ঠে নিঃশংকার আভাস। বললেন, এ ডাহা মিথ্যা কথা। আপনারা শুনলেন কোথায়? কে এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে চিরশান্ত বাগদাদ নগরীকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে? কোনো ভয় নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। মোঙ্গল বাহিনী চলে গেছে। তারা আর ফিরে আসবে না।

এই প্রতিনিধি দলে শিয়া-সুন্নী উভয় প্রকারের লোক ছিলো। ছিলো তাদের আমীর-উমরাও। একজন শীর্ষস্থানীয় আমীর দাঁড়িয়ে বললেন, মহামহিম খলীফা! মোঙ্গল লুটেরারা ফিরে যায়নি। তারা ক্রমশ বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা যে এলাকাই পদানত করছে, তা মিছমার করে, ধূলিসাৎ করে সামনে এগিয়ে আসছে। রক্তপিপাসু ও ধ্বংসলীলায় অভ্যস্ত এই পিশাচরা একেকটি বসতি ও শহর আক্রমণ করে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করছে। লুটতরাজ করছে। মা-বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুটে ছিন্নভিন্ন করছে। ওরা মুসলমানদের দুশমন। নিষ্পাপ

মাসুম শিশুরা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

খলীফার কণ্ঠে কোনো উদ্বেগ-শংকা নেই। কোনো ভয়-ভীতির লেশমাত্র নেই বললেন, শান্ত হও, নিশ্চিন্ত থাকো। তারা বাগদাদ পর্যন্ত আসতে পারবে না।

প্রতিনিধি প্রধান বললেন, আলা হযরত! আপনি এ কী বলছেন? তারা তো খুব নিকটে এসে পৌঁছেছে!

খলীফা বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা আমার নিকট কী নিবেদন নিয়ে এসেছো বলো।

প্রতিনিধি প্রধান বললেন, আমরা আলা হযরতের নিকট নিবেদন নিয়ে এসেছি, আপনি দ্রুত ফৌজে নতুন সৈন্য ভর্তি করে পুরোপুরিভাবে মোঙ্গলদের মোকাবেলা করুন।

খলীফার শির তির তির করে দুলে ওঠলো। বললেন, তোমাদের কথা বুঝলাম। কিন্তু নতুন সৈন্যদের ভাতা ও তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিপুল দেরহাম-দিনারের প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা কে করবে? কোষাগার শূন্য। তাই তো ফৌজের সংখ্যা হ্রাস করেছিলাম।

প্রতিনিধির কণ্ঠে চরম বিস্ময়! বললেন, তাহলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

খলীফা বললেন, শহরের লোকেরা কোষাগারে অর্থ জমা করলে নতুন ফৌজ ভর্তি করা হবে ও তাদের অস্ত্রের প্রয়োজনও পূরণ করা হবে।

প্রতিনিধির লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক্। তারা যেনো ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। খলীফা বোকার মতো এসব আবোল-তাবোল কী বলছেন। তাদের মনে হলো, খলীফা মোঙ্গলদের আক্রমণের কথা বিশ্বাসই করছেন না। তাই ফৌজে সৈন্য সংগ্রহ করে অস্ত্রের আয়োজন করতে নারাজ। তারা আর কোনো কথা না বলে হতাশাভরা হৃদয়ে আক্ষেপ করতে করতে নীরবে প্রস্থান করলো।

মরুঝড়ের তীব্রবেগ নিয়ে প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতার কথা বাগদাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো। এক গাঢ় হতাশার কালো ছায়া বাগদাদ নগরীতে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই অস্থির-বেচাইন। বাঁচার বিন্দুমাত্র আলোক রশ্মি দেখা যাচ্ছে না।

একদিন হাজার হাজার বাগদাদবাসী শাহী প্রাসাদের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। মিছিল করলো। স্লোগান দিলো– 'শাহী ফৌজে সৈন্য চাই, মোকাবেলার জন্য অস্ত্র চাই। বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।' হাজার হাজার মানুষের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে শাহী প্রাসাদ কেঁপে ওঠলো। মিছিল-বক্তৃতা আর স্লোগান চলতে লাগলো।

এবার মদ্যপ খলীফার কিছুটা চৈতন্য ফিরে এলো। ভাবলেন, মোঙ্গল আক্রমণের সত্যিই বাস্তবতা আছে। তা না হলে এতো মানুষ তো কখনো শাহী

প্রাসাদের সম্মুখে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি! তিনি ইবনে আলকামীকে ডেকে পাঠালেন। ইবনে আলকামী ক্ষুব্ধ জনতার পাশ দিয়ে শাহী প্রাসাদে আসছিলেন। তাকে দেখেই বিক্ষুব্ধ জনতা ফেটে পড়লো। লাখো কণ্ঠে একই ধ্বনি ওঠলো– 'ইবনে আলকামী নিপাত যাক, উজীরে আযম মুর্দাবাদ'। ইবনে আলকামী তাদের থামাতে চাইলে বিক্ষুব্ধ জনতা ফুসে ওঠলো। ভড়কে গেলেন ইবনে আলকামী। দ্রুত শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

খলীফার নিকট পৌঁছে তিনি বললেন, এই মিছিলকারীরা কী বলছে? জনতার মাঝে এতো ক্ষোভ কেনো?

ইবন আলকামী বললেন, তারা মুর্দাবাদের শ্লোগান দিচ্ছে।

খলীফার কণ্ঠে বিস্ময়! সতই্য কি তারা এ শ্লোগান দিচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ, তারা মুর্দাবাদের শ্লোগান দিচ্ছে।

ঃ কার মুর্দাবাদের শ্লোগান দিচ্ছে?

ঃ আপনার এই অফাদার খাদেমের।

ঃ আরে ঐ জ্ঞানহীন বোকার দলের কথা রাখো।

ইবনে আলকামী বিনীতস্বরে বললেন, এ খাদেমকে কেনো স্মরণ করলেন?

ঃ তুমি তো বলেছিলে মোঙ্গল বাহিনী ফিরে গেছে।

ঃ হযরত আলা! আমি সত্যই বলেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মোঙ্গলদের আক্রমণের আহ্বান জানাচ্ছে। খলীফাকে তারা সহ্য করতে পারছে না।

খলীফার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ। বজ্রকণ্ঠে বললেন, কে সেই কমীনা, বিশ্বাসঘাতক?

ঃ আমি তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি। পেলেই বন্দি করে খলীফার পদপ্রান্তে উপস্থিত করবো।

ঃ তাহলে সত্যই কী মোঙ্গলরা এগিয়ে আসছে?

ঃ জ্বি। এইমাত্র আমি এটাই শুনে এলাম।

ঃ তাহলে এখন কী করতে হবে?

ঃ আলা হযরতের শুভদৃষ্টিতে কিছুই হবে না। ওরা লেজ গুটিয়ে পালাবে।

ঃ কিন্তু শাহী ফৌজে সৈন্য একেবারে নগন্য। অস্ত্রেরও তো অভাব।

ঃ আলা হযরত! কোনো চিন্তা করবেন না। আমি অস্ত্রের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। এখন শুধু সৈন্য ভর্তি করে নিলেই হয়।

ঃ কিন্তু কোন্ দিন তুমি সৈন্য ভর্তি করবে?

ঃ অতি শীঘ্রই।

ঃ আচ্ছা তাহলে সৈন্যদের ভাতার ব্যবস্থা কী করবে?

ইবনে আলকামী চিন্তার রেশ টেনে বললেন, মহামহিম খলীফা! আমি কিন্তু এ চিন্তাই করছিলাম। আমার খেয়াল এর ব্যয় জনগণ থেকে সংগ্রহ করলেই ভালো হবে।

ঃ বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় সকল লোক এসেছিলো। আমিও তাদের এ কথাই বলেছি।

ঃ ঠিক বলেছেন।

ঃ এই যে লোকেরা মিছিল করছে, গিয়ে তাদের বুঝাও। তাদের বলো, তারা যেনো মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

মিছিলকারী জনতার ক্ষোভে পড়ে ইবনে আলকামী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাই তিনি যেতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু খলীফার নির্দেশ তাকে অম্লানবদনে মানতেই হবে। তাই বাধ্য হয়ে তিনি সেখানে গেলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, ভাইয়েরা আমার! কথা শুনুন। মহমহিম খলীফা বলেছেন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সার্বিক মোকাবেলা করা হবে। তাদের যুদ্ধের স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

জনতার মধ্য থেকে রব ওঠলো, আপনি চুপ থাকুন। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি না।

ইবনে আলকামী বললেন, এটা আমার কথা নয়, খলীফার কথা।

সমবেত জনতার মাঝ থেকে চিৎকার ওঠলো, না না, আমরা খলীফার মুখে শুনতে চাই। তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

ইবনে আলকামী ফিরে গিয়ে খলীফাকে জনতার দাবি জানালো। এবার খলীফা স্বয়ং এলেন। তাকে দেখেই মানুষ আনন্দিত হলো। যেনো মরুর প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে তারা শীতল স্নিগ্ধ বিস্তৃত অরণ্যে এসে পৌঁছলো। খলীফা বললেন, আপনাদের দেখে আমি মুগ্ধ। আপনাদের জাগ্রত হৃদয় বাগদাদকে রক্ষা করবে। আমি ইতোমধ্যে সৈন্য ভর্তির নির্দেশ দিয়েছি। অস্ত্রের কোনো অভাব হবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। দুরাচার মোঙ্গলদের আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবো না।

দিনমণি আলো বিতরণ করে ক্লান্তবদনে পশ্চিমাকাশে যাই যাই করছিলো। খলীফার আশ্বাসবাণী শুনে সেও মনে হয় আশ্বস্ত হয়ে অস্তমিত হলো। সমবেত জনতাও নিশ্চিন্তে ফিরে গেলো।

তখনও সময় ছিলো, খলীফা গাদ্দার ইবনে আলকামীর ষড়যন্ত্র অনুধাবন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শাহী ফৌজে সৈন্য ভর্তি করবেন, অস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন, দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য কোষাগার উন্মুক্ত করে দেবেন। কিন্তু অচেতন খলীফার চেতনা ফিরে এলো না। কোনো পদক্ষেপই খলীফা গ্রহণ

করলেন না। গাদ্দার ইবনে আলকামীর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে শাহী প্রাসাদে মদ আর নারী নিয়েই ব্যস্ত রইলেন।

এদিকে ইবনে আলকামী খলীফার শত্রু। তিনি নিজেই মোঙ্গলদের আক্রমণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তদুপরি জনতার মিছিল থেকে তার বিরুদ্ধে লাঞ্ছনাকর শ্লোগান ওঠেছে। এতে তিনি চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছেন। তাই প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি এখন আগুন। তাই তিনি মোঙ্গলদের মোকাবেলার কোনো আয়োজন করলেন না। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজ পাঠালেন না।

হালাকুখান ভেবেছিলো, বিজিত এলাকার মুসলমানদের যদি ছেড়ে দেয়, তবে তারা বিদ্রোহ করবে বা বাগদাদে গিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেবে। তাই সে কোনো মুসলমানকেই জীবিত রাখেনি। প্রত্যেক শহর ও জনপদের মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করে নিশ্চিন্তে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। তবে তাদের নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ থেকে ভাগ্যক্রমে দু'চারজন প্রাণ নিয়ে বেঁচে যেতে পারেনি, তা নয়।

যারাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছেছে, তারাই মাতম তুলে তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করেছে। তাদের বিবরণে বাগদাদবাসীদের চিন্তা-চেতনায় যদি বিপ্লব সৃষ্টি হতো, বাঁচার জন্য যদি তারা কোনো পদক্ষেপ নিতো, আল্লাহ-রাসূলের নাফরমানি ছেড়ে যদি ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে হয়তো রূপসী নগরী বাগদাদের উপর ধ্বংসলীলা নেমে আসতো না। লাখো মানুষের রক্তের স্রোতে দজলার পানি লালে লাল হয়ে ওঠতো না। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হয়ে যেতো না। কিন্তু আফসোস! অযোগ্য, অথর্ব, নির্বোধ খলীফা এবং উজীরে আজম ইবনে আলকামীর গাদ্দারীর কারণে বাগদাদের দিকে ঝড়ের বেগে ধেয়ে এলো সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলা।

মানবরূপী শয়তান পিশাচ হালাকুখান সত্যিই একদিন তার বাহিনী নিয়ে বাগদাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত হলো। সাথে তার দুর্ধর্ষ রক্তপিপাসু বিশাল বাহিনী। চোখে তাদের আগুনের গোলা। মোঙ্গল বাহিনীর নাম শুনেই সকলের পিলে চমকে ওঠলো।

ইবনে আলকামী চাচ্ছিলেন, যেনো শহরের ফটক খোলা থাকে আর মোঙ্গল বাহিনী নির্বিঘ্নে শহরে প্রবেশ করে খলীফা থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আবুবকর, আহমার, আহমদ আবুল কাসেম ও তাদের মতো আরো কিছু নওজোয়ান আর নীরব থাকতে পারলো না। তারা দ্রুত শহরের ফটক বন্ধ করে দিলো এবং শহরের হাতেগোনা সৈন্যদের থেকে তীর-ধনুক ছিনিয়ে নিয়ে মোঙ্গল বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। মোঙ্গল বাহিনী এগিয়ে এসে শহর অবরোধ করলো।

তেতাল্লিশ.

মোঙ্গল বাহিনীতে বিপুল সৈন্য। তাই সহজেই তারা বিশাল নগরী বাগদাদ অবরোধ করে ফেললো। এদিকে আবুবকর ও তার সাথীরা শাহী ফৌজের অবশিষ্ট সৈন্যদের নগর প্রাচীরের ফটকে ও বুরুজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করলো। বাগদাদে এতো পরিমাণ সৈন্য ছিলো না যে, নগর প্রাচীরের সর্বত্র সৈন্য নিয়োগ করা যায়।

ইবনে আলকামী হালাকুখানকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাগদাদে শাহী ফৌজ তেমন নেই। আপনার একটি আক্রমণই কেল্লার ভিত টলিয়ে দিতে যথেষ্ট হবে। আপনি আক্রমণ শুরু করলে তারা পিছু হটে যাবে। তখন আপনি নির্বিঘ্নে কেল্লায় প্রবেশ করতে পারবেন।

হালাকুখান ও তার বাহিনীর সেনানায়করা একদিন কেল্লার চারপাশে চক্কর দিলো। ঘুরে-ফিরে সবকিছু দেখলো। কেল্লার প্রাচীরে তারা সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করলো না। তারা বুঝে ফেললো, বাস্তবেই শহরে সৈন্যসংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ইবনে আলকামীর দেয়া তথ্য সত্য। কিন্তু তারা এটাও অনুধাবন করলো, কেল্লা ও নগর প্রাচীর এতো মজবুত ও দৃঢ় যে, তা ভাঙা বা তাতে আরোহণ করা অত্যন্ত কঠিন। আরো অনুধাবন করলো, এই মজবুত প্রাচীর রক্ষার জন্য যতো পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন তা বিদ্যমান রয়েছে।

হালাকুখান ও তার সেনানায়করা আরেকটি বিষয় অনুধাবন করলো, নগর প্রাচীরের মাঝে বিদ্যমান কোনো মানুষই নিঃস্ব ও দরিদ্র নেই। নগরের প্রত্যেকটি ঘর মূল্যবান আসবাবপত্র ও অলংকার-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। গোটা পারস্য ও খোরাসানের ধন-সম্পদ একদিকে আর শুধু বাগদাদ নগরীর ধন-সম্পদ একদিকে রাখলে বাগদাদের ধন-সম্পদই বেশি হবে। তারা আরো বুঝলো, শুধু উজীর ইবনে আলকামীর সম্পদ দিয়েই এই বিরাট অঞ্চল ক্রয় করা সম্ভব। আর খলীফার সম্পদের পরিমাণ চিন্তাই করা যায় না। শুধু কি তাই? বাগদাদের ঐ নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে অসংখ্য-অগণিত রূপসী নারী রয়েছে, যাদের রূপের ছটায় চোখ স্থির হয়ে যায়, মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তাই হালাকুখান, সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যরা চাচ্ছিলো, যেনো আজই কেল্লার পতন ঘটে। তাহলে তারা বাগদাদের ধন-সম্পদ আর রূপসী নারীদের লুটে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের লালসা ও আকাঙ্খার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো মজবুত কেল্লা, উঁচু নগরপ্রাচীর আর শাহী ফৌজের মুষ্টিমেয় সৈন্য।

শাহজাদা আবুবকর, আহমদ ও আহমার রাত-দিন নগরপ্রাচীরে টহল দিতে লাগলো। খলীফার নিকটও সংবাদ পৌঁছলো, মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদ নগরী

অবরোধ করেছে। কিন্তু এখনো তার চোখ খোলেনি। এখনো এ ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা-ফিকির নেই। যদি এ কঠিন মুহূর্তেও খলীফা একটু গভীর চিন্তা করতেন, সাহসিকতার সাথে পদক্ষেপ নিতেন, তাহলে বাগদাদ নগরী ও নগরবাসী ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেতো। কিন্তু তার মাথায় মদ-নারী আর কৃপণতার ভূত চেপেছে প্রচণ্ডভাবে। তাই আত্মরক্ষার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করলেন না। তিনি তার সেই পুরনো ধারণায়ই অটল রইলেন যে, ইবনে আলকামী নিশ্চয়ই তার দূরদর্শিতা, কূটকৌশল ও বুদ্ধির বলে মোঙ্গল বাহিনীকে তাড়িয়ে দেবে।

ইতোমধ্যে শাহজাদারা আরেকবার খলীফাকে বুঝালো, এ বিপদ ইবনে আলকামীই ডেকে এনেছে। মোঙ্গলরা হাজার হাজার জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছে। লাখ লাখ মুসলমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। বাগদাদেও তারা তা-ই করবে। সুতরাং এখনো সময় আছে ফৌজে সৈন্য ভর্তি করে শাহী শক্তি বৃদ্ধি করার, মোঙ্গলদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার। কিন্তু খলীফা তাদের কথায় কর্ণপাতও করেনি। বরং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, আমার নিকট অর্থ নেই। নগরবাসীরা যদি মোকাবেলা করতে চায়, তাহলে তারা যেনো নিজ খরচে ফৌজে সৈন্য ভর্তি করে নেয়। নিজেরাই যেনো তাদের বেতনের ব্যবস্থা করে। কারণ, ধ্বংস নেমে এলে তারাই সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খলীফার এ ধরনের প্রলাপ শুনে শাহজাদারা দারুণ মর্মাহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হলো। আহমদ আহমারকে বললো, এখন বাগদাদে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। শীঘ্রই বাগদাদ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া দরকার।

আহমার বললো, কিন্তু শাহজাদা আবুবকরকে আমরা কীভাবে ছেড়ে যেতে পারি?

আবুবকর বললো, আমার ভাগ্য খলীফার ভাগ্যের সাথেই সম্পৃক্ত। খলীফার যে পরিণতি ঘটবে, আমাকেও সে পরিণতিই বরণ করে নিতে হবে। তবে আমার অনুরোধ, তোমরা শাহী খান্দানের নারীদের নিয়ে বাগদাদ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। এখনো সময় আছে, সুযোগ আছে। হয়তো এ সুযোগও অল্প সময় পর থাকবে না।

আহমার বললো, আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না, তোমার যে পরিণতি হবে, আমাদেরও তা-ই হবে।

আবুবকর নীরব হয়ে গেলো। আর কোনো কথা বললো না। তিনজনই হাঁটতে হাঁটতে নগরপ্রাচীরে পৌঁছলো। ইতোমধ্যে দিনমণি উদয়াচল ছেড়ে বেশ উপরে উঠে এসেছে। তারা দেখলো, মোঙ্গল বাহিনীর মাঝে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁবু ছেড়ে সৈন্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আবুবকর বললো, আমার মনে হচ্ছে, আজ মোঙ্গল বাহিনী কেল্লায় আক্রমণ করবে।

আহমার বললো, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

আবুবকর বললো, আমরা তিনজন আছি। নগরপ্রাচীরের তিনদিকে চলে যাই। সিপাইদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে থাকি আর হানাদার মোঙ্গলদের উপর তীরবর্ষণ ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকি, যেনো তারা প্রাচীরের নিকটে ঘেঁষতে না পারে।

আহমদ বললো, তা-ই করতে হবে। কথা বলে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

তিন শাহজাদা প্রাচীরের তিনদিকে চলে গেলো। তারা সিপাইদের সতর্ক করে দিলো। প্রাচীরের স্থানে স্থানে তীর সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এদিক-সেদিক পাথরের স্তূপও প্রচুর। মাঝে-মাঝে মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র) বসানো আছে।

প্রাচীরের প্রায় সবদিকের সিপাইরা সতর্ক ও চৌকান্না হয়ে গেলো। মিনজানিক পরীক্ষা করে নিলো, যেনো যুদ্ধ বেঁধে গেলে সাথে সাথেই আক্রমণ করতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং যথাসময়ে হানাদার মোঙ্গলদের পর্যুদস্ত করা যায়।

মোঙ্গল সৈন্যরা খোলা ময়দানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মনে হচ্ছিলো, যেনো মোঙ্গলরা চারদিক একসঙ্গে আক্রমণ করবে। কিন্তু না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো, মোঙ্গল সৈন্যরা কেল্লার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা চারদিক থেকে উচ্চশব্দে নাকাড়া বাজাতে বাজাতে এবং এক ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলো এবং কেল্লা লক্ষ্য করে তীরবর্ষণ করতে লাগলো।

মোঙ্গলদের তীর লম্বা ও ভারী। তাদের ধনুকও ভারী। তার কারণ, তারা জাতিগতভাবে যাযাবর। মরুর বুকে বুকে, পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে তাদের জীবনের সিংহভাগ কাটে। তাই শিকার করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তারা তীর দ্বারা হরিণ শিকার করে। মাঝে মাঝে সিংহ এবং নেকড়েও শিকার করে।

মোঙ্গল সৈন্যরা তীরবর্ষণ শুরু করলো বটে; কিন্তু তাদের তীর নগর প্রাচীরে পৌঁছছে না। এর কারণ, তীরগুলো ভারী আর নগর প্রাচীর অত্যন্ত উঁচু। তাই নগর প্রাচীরে পৌঁছার পূর্বেই তীরগুলো মাটিতে পড়ে যায়।

বাগদাদের মুসলমানরা মোঙ্গলদের তীরবর্ষণ দেখছিলো। তাদের ঘোড়ার হ্রেষারব শুনছিলো। তাদের আক্রমণে যেনো মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠছিলো। সবার চেহারায় ভয়-ভীতি আর উৎকণ্ঠা। চোখ যেনো তাদের ছানাবড়া। শাহজাদারাও হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মোঙ্গল বাহিনী শোর-চিৎকার করতে করতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে আসছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তারা কেল্লার পাঁচিলের নীচে পৌঁছেই তবে ক্ষান্ত হবে। হয় তারা পাঁচিল ভেঙে ফেলবে, নয়তো কেল্লার ফটক ভেঙে

তাতে প্রবেশ করবে। তারপর রক্তের বন্যা বইয়ে শান্ত হবে।

মুসলমানরাও প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবন দিয়ে হলেও মোগলদের তাড়িয়ে দেবে তারা বারংবার সেনাপতির দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। যেনো নির্দেশের অপেক্ষায় অধীর। তারা পূর্ণ প্রস্তুত। পিঠে তূনীরভরা তীর। হাতে মজবুত করে ধরা ধনুক সামনে মিনজানিক প্রস্তুত। পাশেই স্তূপিকৃত পাথর।

মোঙ্গল বাহিনী দেখলো, মুসলমানরা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছে। তারা ভাবলো, মুসলমানরা ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তাই তারা তীরবর্ষণ করতে করতে সামনে এগিয়ে আসতে লাগলো। তারা নগর প্রাচীরের নিকট পৌঁছতেই ফৌজের অফিসাররা মিনজানিক চালানোর নির্দেশ দিলো। সাথে সাথে চারদিকের মিনজানিক সক্রিয় হয়ে ওঠলো। সিপাইরা বড় বড় পাথর এনে তাতে দিতে লাগলো আর মিনজানিক চালু দিতেই পাথরগুলে উড়ে গিয়ে মোঙ্গল বাহিনীল উপর পড়তে লাগলো। যেসব মোঙ্গল সৈন্যের উপর পাথর গিয়ে পড়লো, তাদের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। মাথা ফেটে মগজ ছিটকে পড়লো। বুকের হাড় ভেঙে পিঠের সাথে মিশে গেলো। মোঙ্গল বাহিনীর অগ্রযাত্রা কিছুটা থেমে গেলেও তারা পিছু হটলো না। বরং অত্যন্ত জিঘাংসা ও আক্রোশের সাথে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। ফলে তীরের আঘাতে প্রাচীরের উপরে কিছু মুসলমান আক্রান্ত হলো।

এবার মুসলমানরাও অত্যন্ত আক্রোশের সাথে আক্রমণ শুরু করলো। মিনজানিকে পাথর ভরে মোঙ্গল বাহিনীর উপর তা নিক্ষেপ করতে লাগলো। মোঙ্গল বাহিনীর সাথে শাহী ফৌজ ও বাগদাদের জনসাধারণের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের সূচনা হলো।

চুয়াল্লিশ.

মোঙ্গল বাহিনী জোশ ও আক্রোশের সাথে আক্রমণ করছিলো। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো, তারা নগর প্রাচীরের পাশে গিয়ে তবে থামবে। কিন্তু মুসলমানরা এমন কঠিনভাবে বাধা দিলো এবং মুষলধারায় তীর ও পাথর বর্ষণ করতে লাগলো যে, তারা আর সামনে অগ্রসর হতে পারছিলো না। তাদের অগ্রগযাত্রা থেমে গেলো।

মোঙ্গল সৈন্যরা মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য চিৎকার করছিলো আর নাকাড়া বাজাচ্ছিলো। ফলে রণক্ষেত্র যেনো থর থর করে কাঁপছিলো। কিন্তু মুসলমান যোদ্ধারা অত্যন্ত প্রশান্ত হৃদয়ে, দারুণ সাহসের সাথে তীর ও পাথর বর্ষণ করছিলো। তাদের দৃষ্টি মোঙ্গল সৈন্যদের উপর আটকে আছে। তারা চাচ্ছে, যেনো মোঙ্গল সৈন্যরা অগ্রসর হতে না পারে, তাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়।

রণক্ষেত্রের অদূরে এক উঁচু টিলার উপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হালাকুখান রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ক্রোধে তার চেহারা বিবর্ণ। চোখ লাল টকটকে, যেনো আগুনের গোলা। তার পাশেই আরেকটি ঘোড়ায় সওয়ার তার উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসী। সে একবার রণক্ষেত্রের দিকে, আরেকবার নির্দয় হিংস্র সম্রাট হালাকুখানের দিকে তাকাচ্ছে। সে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, হালাকু খান আজ এমন ক্ষিপ্ত ও আগুন হয়ে আছে, যদি সে মুসলমানদের কাবু করতে পারে, তবে তাদের পিপীলিকার মতো পিষে মারবে।

হালাকু খানকে এতো ক্ষিপ্ত ও ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেখে নাসীরুদ্দীন তুসী ভয়ে চুপসে গেলো। তার সন্দেহ হচ্ছে, অবশেষে নির্দয় হালাকু খান তার শিরটিই না উড়িয়ে দেয়। কারণ, ইবনে আলকামীর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে-ই হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে অনুপ্রাণিত করেছে। সে-ই হালাকু খানকে এ প্রত্যয় দিয়েছে যে, কোনো জায়গায়ই তার মোকাবেলা করতে হবে না। বাগদাদের নগর প্রাচীরের সামনে পৌঁছামাত্র নগরের ফটকগুলো একে একে খুলে যাবে। অনায়াসে সে বাগদাদে প্রবেশ করতে পারবে। নাসীরুদ্দীন তুসীকে ইবনে আলকামী একথাই লিখেছিলেন যে, মোঙ্গলদের জন্য বাগদাদের ফটক খোলা থাকবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ফটক বন্ধ আর তীর ও পাথর দ্বারা তাদের প্রতিহত করা হচ্ছে। তাই তার ভয়, রোষ-কষায়িত হালাকু খান কখন না তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

হালাকু খান ক্ষোভ ও আক্রোশভরা কণ্ঠে নাসীরুদ্দীন তুসীকে বললো, আমাদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে!

নাসীরুদ্দীন তুসী হতভম্ব। কী উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। তবে ক্ষিপ্ত হালাকু খানের কথার উত্তর তাকে দিতেই হবে। তাই বললো, শাহানশাহ! আমার ধারণা, গাদ্দারীর অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যই হয়তো সে নামমাত্র মোকাবেলা করছে।

হালাকুখান অগ্নিচক্ষু মেলে নাসীরুদ্দীন তুসীর দিকে তাকালো। ভয়ে নাসীরুদ্দীন তুসীর প্রাণবায়ু যায় যায় অবস্থা। হালাকুখান বললো, গাদ্দার-দাগাবাজ, এরা সর্বদাই মানুষকে ধোঁকা দেয়। প্রবঞ্চনার আবর্তে ফেলে ঘুরপাক খাওয়ায়। হতে পারে আব্বাসী খলীফা তার মনোকামনা পূরণ করে দিয়েছে। তাই সে আমাদের সাথে এ ধোঁকাবাজি করছে।

বিনীত কণ্ঠ নাসীরুদ্দীন তুসীর। বললো, শাহানশাহে আলম! আমার জানামতে ইবনে আলকামী এমন লোক নয়।

হালাকুখান বললো, এরা নিমকহারাম। আজ আব্বাসী খেলাফতের সাথে গাদ্দারী করছে, আগামীতে আমার সাথে গাদ্দারী করবে।

নাসীরুদ্দীনের কণ্ঠ অত্যন্ত সতর্ক। বললো, শাহানশাহ! কথা ঠিক। তবে

আমার জানামতে ইবনে আলকামী তেমন লোক নয়। সে একবার যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তা করেই ছাড়ে। নিশ্চয়ই সে বাগদাদের ফটক শাহানশাহের জন্য খুলে দেবে।

হালাকুখানের কণ্ঠ বিস্ময়মাখা। বললো, তা হলে এ মোকাবেলা কেনো?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, কোনো অপারগতার কারণেই সে তা করতে বাধ্য হচ্ছে। নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তা আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হালাকুখানের কণ্ঠে শ্লেষ। বললো, তাহলে বুঝি আমরা পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর আমাদের জন্য শহরের ফটকগুলো খোলা হবে?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, না, না, এমন হবে না শাহানশাহে আলম!

হালাকুখান বললো, নিমকহারাম ইবনে আলকামীর উপর আমার ক্রোধ বেড়েই চলেছে। যদি সে আমার সাথে গাদ্দারী করে থাকে, তাহলে আমি তাকে ও তার বংশের প্রত্যেককে ধরে এনে টুকরো টুকরো করে কুকুরকে খাওয়াবো।

নাসিউদ্দীন তুসী বললো, আলবৎ, গাদ্দারদের বিচার এমনই হওয়া চাই। হ্যাঁ, যদি সে শাহানশাহকে খুশি করতে পারে, তাহলে...।

হালাকুখান তার কথা সমাপ্ত করতে না করতেই বলে ওঠলো, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, তখন তার পুরস্কার কী হবে?

হালাকুখান বললো, সে যে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য মনে হবে, তা-ই প্রদান করা হবে।

এখনো পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। মোঙ্গল সৈন্যরা তীরবর্ষণ করছে আর মুসলমানরা মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়ে মারছে। মোঙ্গলদের তীর মুসলমানদের খুব কমই ক্ষতি করছে। কিন্তু মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত পাথর মোঙ্গলদের প্রচুর ক্ষতি করেছে। যার গায়ে যে স্থানে লাগছে, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কারো মাথায় লাগলে খুলি ভেঙে থেতলে রক্তের ধারা নেমে আসছে। কারো চোখে লেগে চোখের গোলক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

মোঙ্গল সৈন্যরা দারুণ ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। তাদের ইচ্ছা, এবার কেল্লার প্রাচীরের নীচে গিয়ে পৌঁছবেই। কিন্তু প্রবল পাথরবর্ষণ তাদের ইচ্ছাকে কমজোর করে দিচ্ছে। তারা যতো দ্রুত সামনে অগ্রসর হতো, তার চে' আরো বেশি দ্রুত পেছনে ফিরে আসছে। এই সম্মুখ ও পশ্চাদগমনের কারণে তারা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে কাঁপছে।

মুসলমানরা অত্যন্ত স্থিরতার সাথে দারুণ মনোবল নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

মোঙ্গলদের তীর তীব্র আকারে প্রাচীরের উপর এসে পড়লে তারা ঢাল দ্বারা আচ্ছাদন তৈরি করে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর তীরগুলো এসে ঢালে লেগে মাটিতে পড়ছে। যারা মিনজানিক পরিচালনা করছে আর যারা তাতে পাথর ভরে দিচ্ছে, অন্যরা ঢালের আড়ালে তাদের হেফাজত করছে। ফলে তাদের শরীরে কোনো তীর লাগছে না। তারা নিশ্চিন্তে মোঙ্গল বাহিনীর উপর পাথর ছুঁড়ে মারছে।

যদিও মোঙ্গল সৈন্যরা দেখছে, তাদের তীর কোনোই কাজে আসছে না; তবু তারা তীর নিক্ষেপ থেকে বিরত হচ্ছে না। মুষলধারায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর ভাবছে, হয়তো এবার মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এবার প্রাচীরের নিকটে পৌঁছা সম্ভব হবে। কিন্তু মুসলমানরা পাথর দ্বারা তাদের প্রতিহত করছে।

ভীষণ যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা হালাকুখানের আক্রমণ প্রতিহত করছে। ঠিক এমন সময় ইবনে আলকামী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে প্রাচীরের উপর উঠে এলেন।

ইবনে আলকামীর মাথায় শিয়ালের বুদ্ধি। মুখে কথার মধু। বললেন, আলিজাহ্! মোঙ্গল সৈন্যের অবস্থা দেখুন। বাগদাদের চারদিক তারা ঘিরে রেখেছে। এতো সৈন্যের বিরুদ্ধে আমরা আর কতোক্ষণ টিকে থাকতে পারবো। তাহলে অনর্থক মোকাবেলা করে মোঙ্গলদের ক্ষেপিয়ে লাভ কী?

খলীফার দৃষ্টি মোঙ্গল সৈন্যাধিক্যের উপর আটকে আছে। তিনি ইতিমধ্যেই দারুণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে তার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে। তিনি ধারণাও করতে পারেননি, এতো বিরাট বাহিনী নিয়ে মোঙ্গলরা বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি ভয়-বিজড়িত আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছো। আমরা এই বন্য তাতারীদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারবো না।

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ নির্বোধ শাসক। তার মাথায় এতোটুকু বুদ্ধি এলো না, তিনি ইবনে আলকামীকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা আলকামী! এতো বিরাট দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে হালাকুখান এগিয়ে আসছে তুমি কি তা জানতে না? তুমি আমাকে বারংবার বলেছো, তারা ফিরে গেছে। কিন্তু তুমি কেনো এ সত্যটি গোপন করেছিলে? এর উত্তর দাও। এ ধরনের হাজারো প্রশ্নে আলকামীকে জর্জরিত করতে পারতেন। তাহলেই তার গাদ্দারী ধরা পড়ে যেতো আর মুসলিম উম্মাহ এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পেতো। কিন্তু নির্বোধ, বেকুব খলীফার মাথায় এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হলো না। বরং তিনি ভয়াতুর কণ্ঠে বললেন, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। বৃথা এই যুদ্ধ করে লাভ কী হবে?

ইবনে আলকামী দেখলো তার কূটচাল সফল হচ্ছে। তাই কপট আনুগত্যের সুর টেনে বললেন, আলিজাহ! এই গোলাম সারাজীবন আপনার খেদমত করে আসছে। আজকের সেবাটুকু আশা করি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার অনুমতিক্রমে যদি যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে হয়তো কূট-কৌশলের বলে আমি একাই এই বর্বর মোঙ্গলকে তাড়িয়ে দিতে পারবো।

খলীফা বললেন, যদি তা-ই হয়, তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়াই ভালো। সাথে সাথে খলীফা শাহজাদা আবুবকরকে ডেকে পাঠালেন। আবুবকর এলে তাকে বললেন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের আর ক্ষেপিয়ো না। বরং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।

আবুবকরের কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়। বললো, মহামহিম খলীফা! আপনি এ কেমন কথা বলছেন! আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেই মোঙ্গল বাহিনী নগর ফটক ভেঙে চুরমার করে শহরে প্রবেশ করবে? আর সাথে সাথে গণহত্যা শুরু করবে?

খলীফা বললেন, ইবনে আলকামী বলছে, সে কূটকৌশলের মাধ্যমে মোঙ্গল বাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারবে।

আবুবকরের কণ্ঠে আগুন। বললো, ইবনে আলকামী গাদ্দার, ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক। ইনিই তো মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণে উৎসাহিত করেছেন, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আবুবকরের ভয়াবহ মূর্তিতে খলীফা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদের কাজে বাধা দিচ্ছি না। তোমরা যা ভালো মনে করো করতে থাকো।

খলীফা ইবনে আলকামীকে নিয়ে চলে গেলেন। ইবনে আলকামীর আশা পূরণ হলো না। তার ধারণা ছিলো, খলীফা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন আর তিনি হালাকুখানের জন্য বাগদাদের প্রধান ফটক খুলে দেবেন। কিন্তু তা হলো না।

এদিকে যুদ্ধ চলছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। মরণপণ যুদ্ধ। মোঙ্গলরা বারংবার আক্রমণ করছে আর মুসলমানরা তাদের প্রতিহত করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। মোঙ্গল সৈন্যরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা বারবার মিনজানিকের পাথরের আঘাতে আক্রান্ত হয়ে পিছু হটছে। শত শত তীরের আঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে।

নাসিরুদ্দিন তুসীর আশা ছিলো, ইবনে আলকামী তার প্রভাব ও কূটকৌশলে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত তার কিছুই হলো না। তাই বিনীত

কণ্ঠে হালাকুখানকে বললো, আমার মনে হয় এখন যুদ্ধ বন্ধ করে অবরোধ আরো কঠিন করা দরকার।

হালাকুখান এ প্রস্তাব মেনে নিলো। মোঙ্গল বাহিনী ব্যর্থ হয়ে পশ্চাতে ফিরে গেলো।

পঁয়তাল্লিশ.

মোঙ্গলরা কঠোর অবরোধ শুরু করলো। তাদের ধারণা, মুসলমানরা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে শহরের ফটক খুলে দেবে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। কারণ, যেসব গ্রাম-বসতি মোঙ্গলরা ধ্বংস করতে করতে বাগদাদ পৌঁছেছে, তার কিছু লোক পালিয়ে বাগদাদে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে নগরপ্রাচীর রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়েছে এবং প্রাণপণে নগর রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মোঙ্গলদের জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে জনগণকে উৎসাহিত করছে। তাই মুসলমানরা প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা লড়তে লড়তে শহীদ হবে। কিন্তু মোঙ্গলদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে না। তাদের কোনো কথাই তারা বিশ্বাস করবে না। তাই বাগদাদের জনগণ যুদ্ধ করে মরতে রাজি; কিন্তু সন্ধি বা আত্মসমর্পণে রাজি নয়।

মোঙ্গলরা প্রথমে শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে অনর্থক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তাই পুনঃ আক্রমণে তাদের সাহস হলো না। কিন্তু অবরোধ বেশি দীর্ঘ হওয়ার কারণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে যেতে লাগলো। হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত আর লুটপাটে অভ্যস্ত মোঙ্গল সৈন্যরা শহর অবরোধ করে বসে থাকতে রাজি নয়। তারা চায় যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন আর ধর্ষণ।

ইবনে আলকামীর উপর হালাকুখানের ক্রোধ প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তিনি হালাকুখানের নিকট যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, মুসলমানরা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তারা মোঙ্গলদের জন্য নগরের ফটকসমূহ খুলে দেবে। কিন্তু হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। মুসলমানরা নগরের ফটক বন্ধ করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অথচ তার সৈন্যরা আকাশের নীচে মরুর ধূলিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অবর্ণনীয় কষ্ট করছে।

হালাকুখান জানতো, মুসলমানরা যোদ্ধা জাতি। তারা প্রাণ দিতে জানে; কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে জানে না। তাই তাদের রাজধানী পদানত করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এ জন্যই সে বাগদাদ আক্রমণে বিলম্ব করছিলো। কিন্তু একদিকে ইবনে আলকামীর পত্রের পর পত্র, অপরদিকে উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসীর উৎসাহ তাকে বাগদাদ আক্রমণে সম্মত করেছে। এখন তারা পশ্চাতে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। মুসলমানদের তীর আর পাথর

বর্ষণে তাদের জোশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সাহস চুপসে গেছে।

অবরোধের পর পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু ক্ষতিই হতে চলছে। সার্বিক বিষয়টি ভাবতে ভাবতে হালাকুখান আনমনা হয়ে গেলো, হতাশার এক অস্পষ্ট কালো ছায়া তার চেহারায় ছড়িয়ে পড়লো। সে উজীরে আজম ইবনে আলকামীকে ডেকে পাঠালো। ক্রোধে তার চোখ দু'টি যেনো আগুনের গোলক হয়ে গেছে। সে তুসীকে বসবারও অনুমতি দিলো না। গর্জন করে বললো, তবে কি বদমাশ ইবনে আলকামীর এই মতলব ছিলো?

হালাকুখানকে ক্রোধে অধীর দেখে তুসী কাঁপতে লাগলো। ভাবলো, আজ আর রক্ষা নেই। তাই চরম বিনয়ের সাথে কাঁপাস্বরে বললো, শাহানশাহ! গোস্তাখী মাফ করবেন, আমি এখনো বুঝে ওঠতে পারছি না, ইবনে আলকামী গাদ্দারী করলো, না কোনো অপারগতার কারণে এমনটি ঘটছে।

হালাকুখান চিৎকার করে ওঠলো। বললো, অপারগতা কিছুই নয়, সে আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে। তুমিও তার সাথে এ গাদ্দারীতে শরীক রয়েছো।

নাসীরুদ্দীন তুসীর কণ্ঠ একেবারে বিগলিত। বললো, বান্দা শাহানশাহের এক তুচ্ছ গোলাম। ওফাদার দাস। আমি জানি, বাগদাদের ধন-দৌলত অপরিসীম। তাছাড়া বাগদাদে বহু অপরূপা নারী রয়েছে, যাদের হাসিতে মুক্তা ঝরে, চোখের বাঁকা চাহনীতে হৃদয়ে পুলকের বান বয়ে যায়। এ কারণেই আমি আমার শাহানশাহকে বাগদাদ আক্রমণে উৎসাহিত করেছি। আমার ধারণা, মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষপ্রায়। খাদ্যাভাবে চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। শীঘ্রই তারা নগরের ফটকগুলো খুলে দেবে।

ধন-দৌলত আর সুন্দরী নারীপাগল হালাকুখান। এ দু'টি কথা শুনেই তার ক্রোধ উবে গেলো। একেবারে শান্ত হয়ে গেলো সে। বললো, আচ্ছা উজীরে আজম! বলো তো বাগদাদের সেই ধন-দৌলত আর হূর-পরীরা কবে আমার হস্তগত হবে?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, শীঘ্র– অতি শীঘ্র। আমি শুনেছি, শাহজাদী নাজমা এতো সুন্দরী ও রূপসী যে, পূর্ণিমার চাঁদও তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। তাছাড়া উজীরে আজম ইবনে আলকামীর মেয়ে হাজেরাও অনন্যা। এ ধরনের বহু রূপসী সুন্দরী রয়েছে, যাদের দেখলে যুবকদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। হৃদয়ে কামনার ঝড় ওঠে। আমার ইচ্ছা, এই সুন্দরীরা আমাদের শাহানশাহের হৃদয়কে প্রদীপ্তময় করবে।

হালাকুখান বললো, তুমি কি ইতিমধ্যে ইবনে আলকামীর কাছে কোনো পয়গাম পাঠিয়েছো?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, এখনও আমি কোনো বিশ্বস্ত লোক পাইনি। ঘটনাক্রমে আজ একজন ব্যক্তিকে পেয়েছি। আগামীকালই আমি ইবনে আলকামীকে সবিস্তারে সব জানিয়ে দেবো।

হালাকুখান বললো, হ্যাঁ, তার নিকট শীঘ্রই আমাদের পয়গাম পাঠিয়ে দাও আর আমার পক্ষ হতে তাকে জানিয়ে দাও, সে যদি আমাদের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করে, তাহলে যেনো তার মেয়ে হাজেরাকে নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

নাসীরুদ্দীন হালাকুখানের নিকট থেকে চলে এলো। সে দারুণ মনস্তাপে জ্বলতে লাগলো যে, অন্যান্য সুন্দরীদের সাথে সে হাজেরার নাম কেনো উল্লেখ করলো। কেনো এই দানব মোঙ্গল সম্রাটের নিকট ভুলটা করলো। কিন্তু যে তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে, তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই এখন আর আক্ষেপ করে লাভ নেই।

সেদিন সকালেই ইবনে আলকামীর দূত নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট এসেছে। লোকটি শিয়া। সুন্নী খলীফাদের পতন তার লক্ষ্য। ইবনে আলকামীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে, শীঘ্রই ইবনে আলকামী মোঙ্গল বাহিনীকে বাগদাদে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। তাই অস্থির না হয়ে আরেকটু ধৈর্যধারণ করতে হবে। নাসীরুদ্দীন তুসী সেই দূতের মাধ্যমে লিখে পাঠায়–

'অবরোধ দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে হালাকুখানও অত্যন্ত নারাজ হতে চলেছেন। তার স্বভাব-চরিত্র পশুসুলভ। যদি তিনি তোমার সহায়তা ছাড়া শক্তিবলে বাগদাদ পদানত করেন, তাহলে কিন্তু তোমার রক্ষা হবে না। তার সন্তুষ্টি ও কৃপা পেতে হলে শীঘ্রই শহরকে তার হাতে তুলে দাও। আর সম্ভব হলে তুমি নিজে এসে হালাকুখানকে সান্ত্বনা দিয়ে যাও। আরেকটি কথা বলছি, গভীরভাবে চিন্তা করবে। তোমার ভবিষ্যৎ জিন্দেগীর জন্য খুবই উপকারি হবে। তাহলো, হালাকুখান হাজেরার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছেন। যদি সে মোঙ্গলদের হেরেমে পৌঁছতে পারে, তাহলে দৌলত-ইজ্জত আর ক্ষমতা তোমার পদচুম্বন করবে।

-ইতি

নাসীরুদ্দীন তুসী।

দূত রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে যে পথে এসেছিলো, সে পথেই বাগদাদ গিয়ে পৌঁছলো এবং সোজা ইবনে আলকামীর নিকট উপস্থিত হলো। ইবনে আলকামী তারই অপেক্ষা করছিলেন। তাকে পেয়ে তিনি দারুণ আনন্দিত হলেন। দূত তাকে নাসীরুদ্দীন তুসীর পত্রটি দিলে তিনি তাকে বিদায় দিয়ে চিঠিখানা পড়া শুরু করলেন। পড়তে পড়তে তিনি যতোই সমনে অগ্রসর হচ্ছেন, তার চেহারা ততোই ফ্যাকাসে ও রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ বাক্যটি পড়তেই তার চেহারা

দীপ্তিময় হয়ে ওঠলো। আনন্দের আবেশে তার চোখ ঝলমল করতে লাগলো। কণ্ঠচিরে অস্ফুট স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল– না, কিছুই না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে তিনি খলীফার নিকট গেলেন। বললেন, মহামহিম খলীফার মর্জি হলে আমি একটি কথা বলতে চাই। মোঙ্গলরা দীর্ঘদিন যাবত বাগদাদ অবরোধ করে রেখেছে। তাছাড়া তাদের সৈন্যসংখ্যা অসংখ্য। রসদ-সামানও পর্যাপ্ত। নিঃসন্দেহে তারা বাগদাদ পদানত করবে। যদি তারা যুদ্ধ করেই বাগদাদ পদানত করে, তাহলে শহরবাসীদের অবস্থা-ই কী হবে আর আমাদের পরিণতি-ই বা কী হবে। সারারাত এ চিন্তায় আমার ঘুম হয়নি। বিছানায় ছটফট করেছি। যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহলে আমি সন্ধির আলোচনা শুরু করতে পারি।

খলীফার কক্ষে নীরবতা নেমে এলো। খলীফা চোখ বন্ধ করে চিন্তায় ডুবে গেলেন। থমথমে ভাব। কিছুক্ষণ পর পিট পিট করে তাকিয়ে বললেন, ইবনে আলকামী! আমিও তো ঠিক একই চিন্তা করছিলাম।

ইবনে আলকামী বললেন, দূত পাঠিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। স্বয়ং আমি গিয়ে একটি সুন্দর ব্যবস্থা করে আসি।

ঃ এটাই সবচে' ভালো হবে। তা-ই করা হোক।

ঃ শাহজাদারা যদি এর বিরোধিতা করে, তাহলে?

ঃ তাদের বিরোধিতায় কোনো কাজ হবে না।

ইবনে আলকামী শাহী প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সোজা নিজের প্রাসাদে চলে এলেন। প্রস্তুত হয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে সোজা নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট চলে গেলেন। নাসীরুদ্দীন তুসী তাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠলো, আরে তুমি একা এলে যে! হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না?

ঃ এবারে আমি একাই এলাম।

ঃ কী উদ্দেশ্যে এলে?

ঃ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমি খলীফাকে হালাকুখানের হাতে তুলে দিতে চাই। তারপর হালাকুখান তার পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারিত করে নেবেন।

ঃ খলীফা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ আমি যখন এসে পড়েছি, তাহলে মনে করো, খলীফাও এসে যাবেন। কিন্তু প্রথমেই আমার ও আমার বংশের নিরাপত্তা দিতে হবে।

ঃ বেশ, তা অবশ্যই দেয়া হবে। এখনই তুমি আমার সাথে চলো।

নাসীরুদ্দীন তুসী ইবনে আলকামীকে সাথে করে হালাকুখানের নিকট গেলো। বললো, ইবনে আলকামী শাহানশাহকে আদাব জানাচ্ছে।

ইবনে আলকামী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাকে সালাম জানান।

নাসীরুদ্দীন তুসী জানতো, হালাকু খান ইবনে আলকামীর প্রতি দারুণ ক্ষুব্ধ, অত্যন্ত নাখোশ। তাই হালাকুখান এখন এমন কথা বলে ফেলতে পারে, যার কারণে ইবনে আলকামীর মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হতে পারে। তাই বললো, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এসেছে। সে খলীফাকে আপনার হাতে তুলে দিতে চায়।

ঃ যদি খলীফা আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়, তাহলে শহরের চাবিকাঠি সব আমাদের হাতে এসে যাবে।

ঃ সেই সাথে বাগদাদের পুঞ্জিভূত ধনসম্পদ আর হূর-পরীরাও শাহানশাহের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

ঃ আচ্ছা তাহলে তা কবে হবে?

ইবনে আলকামী বললেন, অতি দ্রুত। কাল বা পরশু।

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, ইবনে আলকামী তার ও তার বংশের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছে।

হালাকুখানের মুখে মধুময় হাসি। বললো, নিরাপত্তা দিলাম। আমরা তোমার সাথে এমন আচরণ করবো যে, তুমি সন্তুষ্ট ও বিমুগ্ধ থাকবে।

ইবনে আলকামী হালাকুখানকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে নাসীরুদ্দীন তুসীর তাঁবুতে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ তার সাথে গোপন আলোচনা ও পরামর্শ করলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হৃদয়ে নিরাপদে শহরে ফিরে এলেন।

ছেচল্লিশ.

'ইবনে আলকামী কেল্লার ফটক খুলে বাইরে গেছে' সংবাদটি গোপন রইলো না। ফটকের মোহাফেজরা শাহজাদা আবুবকরকে বিষয়টি জানিয়ে দিলো। এ সংবাদ শুনে আবুবকর স্তব্ধ হয়ে যায়, যেনো অশনিপাত হয়েছে। তাহলে কি ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে বাগদাদবাসীর জীবনও। না, এ জাল ছিন্ন করতেই হবে। বাগদাদাবাসীকে উদ্ধার করতেই হবে। কালবিলম্ব না করে আবুবকর ছুটে গেলো খলীফার কাছে। বিনীতকণ্ঠে জানতে চাইলো, মহামহিম খলীফার অনুমতি নিয়ে কি ইবনে আলকামী তাতারীদের সৈন্য শিবিরে গেছে?

খলীফা বললেন, হ্যাঁ, আমার অনুমতি নিয়েই গেছে।

আবুবকরের কণ্ঠে আরো বিনয় ভাব ঝরে পড়লো। বললো, মহামহিম খলীফার নিকট পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করে বলছি, এ কথা জিজ্ঞেস করার তো আমার অধিকার নেই যে, সে কেনো তাতারীদের নিকট গেলো। কিন্তু মহামহিম খলীফাকে আমি যতোটুকু ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে আমি যে

প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, তা আমাকে বাধ্য করছে, যেনো আমি জিজ্ঞেস করি, এ মুহূর্তে কেনো সে তাতারীদের নিকট গেলো? কী সেই প্রয়োজন?

খলীফার কণ্ঠ গম্ভীর। বললেন, সন্ধির আলোচনা করতে।

আবুবকরের কণ্ঠ থেকে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে পড়লো। বললো, মহামহিম খলীফা! সে গাদ্দার, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ। সে-ই মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখন সে নিজের নিরাপত্তা হাসিলের জন্য তাতারীদের নিকট গেছে। আমি কসম করে বলতে পারি, সে আমাদের এক ভয়াবহ বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাগদাদবাসীদের উপর এক কেয়ামত ধেয়ে আসছে।

খলীফার কণ্ঠে বিরক্তির ঝাঁঝ। বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, তুমি তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখো। তাই তুমি তার প্রত্যেকটি কাজের বিরোধিতা করো। অথচ তুমি তার গাদ্দারী, ধোঁকাবাজি ও মিথ্যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারছো না। সে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওফাদারী করে যাচ্ছে আর তোমরা তাকে গাদ্দার বলছো!

আবুবকর কণ্ঠে একটু শীতলতা এনে বললো, সে এমন ধূর্ত যে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহ আমাকে দূরদর্শিতা দান করেছেন। বুদ্ধিমত্তাও দান করেছেন। আমি কসম করে বলতে পারি, সে গাদ্দার, ধোঁকাবাজ। সে আমাদের রাজ পরিবারের শত্রু। বাগদাদবাসীর শত্রু। সে এ নগরীকে ধ্বংস করার সকল আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে।

খলীফা বললেন, এ ধরনের চিন্তা তুমি তোমার হৃদয় থেকে মুছে ফেলো। পঞ্চাশ দিনের বেশি হয়ে গেলো বাগদাদ অবরুদ্ধ। এর মধ্যে কারো সাহস হলো না শহরের বাইরে গিয়ে মোঙ্গলদের সাথে আলোচনা করবে। কিন্তু ইবনে আলকামী জান বাজি রেখে সে কাজটি করতে গেছে। আর তুমি তার সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশংসা না করে তাকে গাদ্দার, ধোঁকাবাজ বলছো। এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়?

আবুবকর খলীফার কথা শুনে সত্যিই বিস্মিত হলো। বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ খলীফার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, পঞ্চাশটি দিন বিগত হলো। আমরা রাত-দিন সজাগ থেকে দুশমনের মোকাবেলা করছি। কোথায় সেই উজীরে আজম, কোথায় তার অফাদারী ও সহমর্মিতা। একবারও তো সে এসে আমাদের দেখলো না। পাঁচিলে এসে আমাদের সাহস দিলো না। অস্ত্রশস্ত্র দেখে আমাদের যুদ্ধের কোনো পরামর্শ দিলো না। আহত সিপাহীদের অবস্থা দেখে গেলো না।

খলীফা আমতা আমতা করে বললেন, সে তোমাদের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে যেনো তোমরা পূর্ণোদ্দমে যুদ্ধ করে মোঙ্গলদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু পঞ্চাশ দিন বিগত

হলো তোমরা এখনো কিছুই করতে পারলে না। এখন সন্ধি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই সে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গেছে।

আবুবকরের কণ্ঠে আক্ষেপ ও রোষ ঝরে পড়লো। বললো, অসম্ভব, সে কিছুতেই এমন নয়। তাতারীদের সাথে যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হই এটা সে চায় না। এ জন্যই সে ফৌজ থেকে সৈন্য সংখ্যা কমিয়েছে। তার উদ্দেশ্য দুশমনদের জন্য পথ পরিষ্কার করা। আর এখন সে তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাতারীদের নিকট গেছে।

খলীফার কণ্ঠ ক্রোধে ভরা। বললেন, তোমার কথা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি একজন নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত মানুষকে গাদ্দার-বেঈমান-মিথ্যুক বলছো। প্রমাণ ছাড়া কারো সম্পর্কে কুধারণা রাখা ইসলাম পছন্দ করে না। অজ্ঞতা আর অদূরদর্শিতার কারণেই তুমি এ ভুলটি বারবার করছো সুতরাং একবার নয়, তোমার বারবার তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

ঃ আমি মহামহিম খলীফার গোলাম। যদি আপনি আমাকে হুকুম দেন, তবে আমি ইবনে আলকামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

ঃ এটা আমার হুকুম নয়। কিন্তু আমি চাই ইসলামী নীতিমালা ঠিক থাকুক আর তুমি ইবনে আলকামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

ঠিক তখন আহমদ ও আহমার এসে উপস্থিত হলো। বললো, আমরা ইবনে আলকামীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পেয়ে গেছি। তার এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি কিছু বলার জন্য এসেছে।

খলীফা বললেন, তাকে উপস্থিত করো। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা এমন কিছু উপস্থাপন করতে পারবে না, যদ্বারা তার গাদ্দারীর প্রমাণ মেলে।

আহমার বললো, হয়তো লোকটি মহামহিম খলীফার নিকট এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করবে, যদ্বারা প্রকৃত বিষয়টি মহামহিম খলীফার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

খলীফা বললেন, আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো।

আহমার চলে গেলো এবং ঐ ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এলো, যে ইবনে আলকামীর দূত হয়ে নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট গিয়েছিলো এবং তার চিঠি নিয়ে এসেছিলো। তার নাম কাসেম। সে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে খলীফাকে সালাম দিলো।

খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

ঃ জাঁহাপনা, আমার নাম কাসেম। আমি উজীরে আজমের খাদেম।

ঃ তুমি কী বলতে এসেছো?

ঃ আমি এ কথা বলতে এসেছি যে, উজীরে আজম মোঙ্গলদের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি আমাকে গোপনে হালাকুখানের উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসীর

নিকট পত্রসহ পাঠিয়েছিলেন। আমি সেই চিঠি তার নিকট পৌঁছিয়েছি এবং তার চিঠিও এনে উজীরে আজমের নিকট দিয়েছি।

খলীফা বললেন, হয়েছে, আর কিছু বলবে কী?

আজ সকালে যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখন অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে স্বগতোক্তি করছিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে যাচ্ছে। আমি যা চাচ্ছিলাম, তা-ই হতে যাচ্ছে। হঠাৎ তিনি আমাকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, আমার এ কথা কিন্তু কাউকে বলবে না। অত:পর তিনি চলে গেলেন। এরপর থেকে আমার অন্তর আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি অস্থির হয়ে গেছি। আমার বিশ্বাস, তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি আমার এই কথাগুলো মহামহিম খলীফাকে বলবো।

খলীফা বললেন, তুমি খুব ভালো করেছো। আমি তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। শীঘ্রই তোমাকে এর পুরস্কার দেয়া হবে। এখন তুমি যাও।

কাসেম চলে যাওয়ার পর খলীফা বললেন, তোমরা তার সব কথা নিশ্চয়ই শুনেছো, তার কোন্ কথা দ্বারা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়?

আবুবকর বললো, প্রথম কথা তো উজীরে আজম মহামহিম খলীফার সাথে পরামর্শ না করে নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট দূত পাঠিয়েছে। তদুপরি সে যে চিঠি পাঠিয়েছে, তা জাঁহাপনাকে দেখায়নি। আর নাসীরুদ্দীন তুসী যে উত্তর দিয়েছে, তাও দেখায়নি। দ্বিতীয়ত, সে বলেছে, 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে যাচ্ছে। আমি যা চাচ্ছিলাম, তা-ই হতে যাচ্ছে।' তৃতীয়ত, সে কাসেমকে সতর্ক করে দিয়েছে, যেনো তার অভিব্যক্তিটি কারো নিকট বর্ণনা না করে। এ তিনটি কথা তার গাদ্দারী ও বেঈমানির বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তোলে।

খলীফা হাসতে হাসতে বললেন, এখনো তোমরা সেই অবোধ বালকই রয়ে গেলে। এ কথাগুলো বুঝলে না যে, যদিও সে আমার পরামর্শ ছাড়া চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করে থাকে, তবে সে কোনো অন্যায় করেনি। সে তো উজীরে আজম। সে এমনটি করতে পারে। আর সে আমাকে কিছু বলেনি। কারণ, সন্ধির বিষয় নিশ্চিত না হলে তো কিছু বলে লাভ নেই। তাই সে কিছু বলেনি। আর সন্ধির সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়ার পর তো সে আমাকে সবকিছুই বলেছে। আর তার অভিব্যক্তি 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে যাচ্ছে' এ কথার অর্থ এই যে, সন্ধির ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে গেছে। এর দ্বারা তো তার গাদ্দারী-নিকমহারামী বুঝায় না। বরং তার বিশ্বস্ততা ও ওফাদারীরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবুবকর অনোন্যপায় হয়ে বললো, আল্লাহ তা-ই করুন। সে যেনো বিশ্বস্ত ও ওফাদারই হয়।

শাহজাদাদের ও খলীফার মাঝে আলোচনা দীর্ঘ হলো। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হলো। আলোচনা চলাকালেই ইবনে আলকামী এসে উপস্থিত হলেন। তার চেহারায় আনন্দের আভা ঝলমল করছে। খলীফা তাকে দেখেই বললেন, এসো আমার ওফাদার উজীর! বলো কী হয়েছে?

ইবনে আলকামী বসতে বসতে বললেন, আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, সফল হয়েই ফিরে এসেছি।

ইবনে আলকামীর কথায় খলীফার চেহারাও ঝলমল করে ওঠলো। তিনি শাহজাদাদের দিকে ফিরে তাকালেন। যেনো দৃষ্টির ভাষায় তাদের বলছেন– দেখলে তো হে শাহজাদারা, আমার উজীরে আযম কেমন ওফাদার!

খলীফা বললেন, সবিস্তারে বর্ণনা করো কী হয়েছে?

ইবনে আলকামী বললেন, আমি উজীর নাসীরুদ্দীন তুসীর সহায়তায় হালাকু খানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে বললাম, শহরের লাখ লাখ অধিবাসী যুবক দলে দলে ফৌজে ভর্তি হচ্ছে। বাগদাদের মুসলমানদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে ফৌজ আসছে। তারা এসে পৌঁছলেই শহরের কেল্লা থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে আক্রমণ করবে। সুতরাং এখন সময় থাকতে সসম্মানে সন্ধি করে আপনার ফিরে যাওয়া উচিত। আমার কথা শুনে হালাকুখান ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি সন্ধি করতে প্রস্তুত।

আমি বললাম, কোন্ শর্তে আপনি সন্ধি করতে চান? উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেক বছর খলীফার আমাকে খাজনা দিতে হবে। আমি বললাম, খলীফা তা মেনে নেবেন না। হালাকুখান বললেন, আচ্ছা তাহলে খলীফাকে চার লাখ দীনার দিতে হবে আর তার এ ওয়াদা করতে হবে যে, তিনি কখনো মোঙ্গল সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন না। আমি বললাম, চার লাখ দীনার অনেক বেশি। অনেক বাদানুবাদের পর এক লাখ দীনার গ্রহণে তিনি রাজি হয়েছেন।

খলীফা আনন্দিত হয়ে বললেন, এটা তুমি অত্যন্ত ভালো করেছো।

ইবনে আলকামী বললেন, হালাকুখান বাগদাদ শহরে এসে মহামহিম খলীফা থেকে এই ওয়াদা নিতে চাচ্ছিলেন যে, খলীফা কখনো মোঙ্গল সাম্রাজ্যে আক্রমণ করবেন না। কিন্তু আমি চাইলাম না, মোঙ্গলরা বাগদাদে প্রবেশ করুক। তাই আমি বললাম, না, তা হতে পারে না। বরং খলীফা স্বয়ং এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন।

খলীফা বললেন, তোমার এ প্রস্তাবও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মোঙ্গল সরদারের বাগদাদ প্রবেশ কিছুতেই মঙ্গলজনক নয়। বেশ, আমিই তার নিকট যাবো।

আবুবকর বিস্মিত হয়ে বললো, এটা অযৌক্তিক কথা। খলীফা কোনো

অবস্থায়ই শহরের বাইরে যাবেন না। মোঙ্গল সরদার ও তার সিপাহীদের কখনো বিশ্বাস করা যায় না।

খলীফা বললেন, আমি সেখানে গেলে যদি বিপদ কেটে যায়, তাহলে সেখানে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আহমার বললো, মোঙ্গল সৈন্যদের মাঝে মহামহিম খলীফার গমনকে আমি অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করছি।

ইবনে আলকামী বললেন, কিন্তু আমি তো একথা বলে এসেছি যে, মহামহিম খলীফা মোঙ্গল সৈন্যদের মাঝে শীঘ্রই তাশরিফ আনবেন। আর হালাকুখান আমার কথা বিশ্বাস করে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন শুরু করে দিয়েছে।

খলীফার কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর। বললেন, আমি উজীরে আজমের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো।

শাহজাদারা আপ্রাণ চেষ্টা করলো, যেনো খলীফা দুশমনের নিকট না যান। তাকে বিভিন্নভাবে বুঝালো। কিন্তু খলীফা তাদের কথা কানেও তুললেন না। তিনি মোঙ্গল সৈন্যদের নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

সাতচল্লিশ.

খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে ইবনে আলকামী বাড়িতে পৌঁছেছেন। আজ তিনি দারুণ আনন্দিত, যেনো সত্বর তিনি খলীফা হতে যাচ্ছেন। বিশাল সাম্রাজ্য তার পদানত হতে যাচ্ছে। আজকের এই রাত যেনো তার শেষ হয় না। বহু কষ্টে রাত কাটান। কাকডাকা ভোরেই বিছানা ছেড়ে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। খলীফার নিকট আসার জন্য ইবনে আলকামীর প্রস্তুতি শেষ হলে হাজেরা তার নিকট এলো। এখনো ইবনে আলকামী দারুণ আনন্দিত। তার চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলছে।

হাজেরা তার পিতার দিকে তাকিয়েই বিষয়টি আঁচ করে ফেললো। বললো, আব্বাজ্জান! বলুন না, কী হতে যাচ্ছে? কোনো সুসংবাদ আছে কি?

মানুষ অত্যধিক আনন্দিত বা খুব ব্যথিত হলে নিজের অনিচ্ছায় মনের অবস্থা অন্যের নিকট ব্যক্ত করে ফেলে। ফলাফলের দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকায় না। তাই ইবনে আলকামীর মতো ধূর্ত চৌকস লোকটিও এ মুহূর্তে নিজেকে আটকে রাখতে পারলো না।

তিনি বললেন, শোনো বেটী! দীর্ঘদিন যাবত আমি যে চেষ্টা করে আসছি, তা আজ পূর্ণতায় পৌঁছুতে যাচ্ছে। আজ আমার ভাগ্যতারকা ঝলমল করে উদিত হবে। দিগন্তময় তার আলোকমালা ছড়িয়ে পড়বে। আমার সাথে তোমার ভাগ্যও পাল্টে যাবে।

হাজেরার আগ্রহ বেড়ে গেলো। বললো, আব্বাজান! বলুন না, কা হতে যাচ্ছে?

ইবনে আলকামী বললেন, আজ আমি ও হতভাগ্য খলীফা মোঙ্গল সৈন্যদের নিকট যাবো। আজই খলীফা নিহত হবে। আর শীঘ্রই আমি ইরাকের প্রধান শাসক হয়ে যাচ্ছি। আর তুমি হবে রাণী। ফিরে এসে বিস্তারিত বলবো।

হাজেরার কণ্ঠে সীমাহীন ভয় আর আতঙ্ক। বললো, আব্বাজান! আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি মোঙ্গলদের বিশ্বাস করবেন না। তারা মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, ওয়াদা ভঙ্গকারী, খুনী। খলীফা আমাদের কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাকে মোঙ্গলদের হাতে তুলে দেবেন না। আমি কয়েক দিন যাবত অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির সময় অতিবাহিত করছি। কী জানি কী হয়ে যায়।

মেয়ের ভয়, আতঙ্ক আর অস্থিরতা দেখে ইবনে আলকামীর চৈতন্যোদয় হলো যে, মনের কথাটা মেয়েকে বলা ঠিক হয়নি। মেয়েকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বললো, তাহলে কি তোমারও এই মত? ঠিক আছে, আমি তা-ই করবো। মোঙ্গলদের সাথে সন্ধি করে তাদের ফিরিয়ে দেবো।

হাজেরা বললো, হ্যাঁ, আব্বাজান! যে করেই হোক মোঙ্গলদের সাথে সন্ধি করে তাদের ফিরিয়ে দিন। ইবনে আলকামী কণ্ঠে কপট দৃঢ়তা এনে বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমার কথাই রাখবো।

ইবনে আলকামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা খলীফার নিকট চলে এলেন। খলীফাও মোঙ্গল সবদার হালাকুখানের সাথে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন। কিছু জানবাজ খাদেমকে সাথে নিয়ে তারা রওনা হয়ে গেলেন।

হাজেরাকে তার পিতা যতোই প্রবোধ বাণী শোনালেন, তার অশান্ত মন কিছুতেই শান্ত হলো না। সে জানতো, ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছা তার পিতার দীর্ঘ দিনের সাধ। তাই কিছুতেই তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করবেন না। তাছাড়া হাজেরা জানতো, তার পিতাই হালাকুখানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু ইবনে আলকামী তার পিতা। তাই সে কারো নিকট তা বলেনি। পিতার ক্ষতির চিন্তা সে করেনি।

কিন্তু আজ তার পিতার একটি কথা তাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুললো। তিনি বলেছেন শীঘ্রই সে 'রাণী' হতে যাচ্ছে। এটা তো অসম্ভব। কারণ, আব্বাসী খেলাফতের যুবরাজ আবুবকর। সে তো ফেরদাউসকে বিয়ে করেছে। তার মাথায় তার পিতার এই কথাটি ঘুরপাক খেতে লাগলো। সে তার পিতাকে চেনে। পিতা কখনো তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারে না। তাহলে সে কোন্ দেশের রাণী হতে যাচ্ছে? কীভাবে সে রাণী হতে পারে? এ চিন্তা তার মাথায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

হঠাৎ তার চিন্তাশক্তিতে যেনো একটি আলোকমালা বিচ্ছুরিত হলো। হ্যাঁ, আব্বাজানের গোপন ও ব্যক্তিগত আলমারী-ড্রয়ারগুলো তালাশ করে দেখা যেতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে চাবি পেয়ে গেলো। একের পর এক ড্রয়ার খুলতে লাগলো ও কাগজপত্র ঘাটতে লাগলো। অবশেষে একটি ড্রয়ার খুলে তাতে নাসীরুদ্দীন তুসীর কয়েকখানা পত্র পেলো। নিষ্পলক নয়নে হাজেরা নাসীরুদ্দীন তুসীর সবগুলো পত্র এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো। এবার তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো, সত্যিই তার পিতা গাদ্দারী করেছেন। তিনি মোঙ্গলদের সাথে ষড়যন্ত্র করে খলীফাকে হালাকুখানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর নিজে ইরাকের একচ্ছত্র শাসক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। ইরাকের শাসক হওয়ার বিনিময়ে তাকে নরপশু হালাকুখানের ভোগ্য হিসেবে তার হেরেমে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

হাজেরা অস্থির, বেচাইন। ক্ষণিকের ব্যবধানে সে অন্য হাজেরা হয়ে গেলো। শাহী খান্দানের নারী-পুরুষের সাথে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। তাদের সবাইকে সে ভালোবাসে। বিশেষভাবে আহমদকে সে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। তাকে নিয়ে রঙ্গিন স্বপ্নও সে দেখে। বিশ্বস্ততা ও অফাদারীর প্রেরণা তার অন্তরকে উদ্বেলিত করলো। আহমদসহ খলীফা পরিবারের ভালোবাসা তাকে আরো শক্তিশালী করলো। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলো, সে আহমদকে নাসীরুদ্দীন তুসীর পত্রগুলো দেখিয়ে ওফাদারী ও সহমর্মিতার প্রমাণ দেখিয়ে আত্মপ্রশান্তি লাভ করবে। মর্মজ্বালা নিবারণের চেষ্টা করবে।

হাজেরা চিঠিগুলো নিয়ে ছুটলো আহমদ আবুল কাসেমের মহলে। প্রথমেই নাজমার সাথে সাক্ষাৎ হলো। নাজমা তাকে স্বাগত জানালো। হাজেরার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। বললো, আহমদ কোথায়?

নাজমার মুখে মিষ্টিমধুর হাসি। বললো, আল্লাহর শোকর, অবশেষে তোমার পাষাণহৃদয়ে ভালোবাসার নহর প্রবাহিত হয়েছে। ভাইজানের নাম তুমি মুখে তুলেছো!

হাজেরার কণ্ঠে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা। বললো, তিনি কোথায় আগে তা বলো।

নাজমা বললো, পেরেশান হয়ো না। আমি তাকে এক্ষুনি ডেকে আনছি। কিন্তু বলো তো আজ তোমার অন্তরে এতো পেরেশানি কেনো? কী কথা তোমার হৃদয়ে এই অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে?

হাজেরা বললো, কথা বলে সময় ক্ষেপণের সময়টুকু হাতে নেই। খলীফাকে মোঙ্গল বাহিনীর নিকট যেতে বাধা দিতে হবে।

নাজমা ঘাবড়ে গেলো। বললো, কেনো? নতুন কিছু জানতে পেরেছো কি?

হাজেরা বললো, হ্যাঁ। তারপর নাসীরুদ্দীন তুসীর চিঠিগুলো নাজমার হাতে

তুলে দিলো। নাজমা এক নিঃশ্বাসে চিঠিগুলো পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। বললো, হে আল্লাহ! হে রহমান! আমাদের প্রতি রহম করুন।

ঠিক তখন আহমদ ও আহমার এসে কামরায় প্রবেশ করলো। আহমদ বললো, কী খবর নাজমা! তুমি এমন পেরেশান কেনো?

নাজমা চিঠিগুলো আহমদের দিকে বাড়িয়ে দিলো। বললো, হাজেরা এইমাত্র নিয়ে এসেছে। আহমদ নিষ্পলক চোখে চিঠিগুলো পড়ে বললো, উফ!

আহমার বললো, কী হয়েছে?

আহমদ বললো, ইবনে আলকামীর গাদ্দারীর রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। আহমার চিঠিগুলো পড়ে বললো, হায় হায়! সর্বনাশ হয়ে গেছে। যদি আমরা এ পত্রগুলো একদিন আগেও পেতাম! আর দেরি নয়, শীঘ্রই চলো। খলীফাকে মোঙ্গল বাহিনীর নিকট কিছুতেই যেতে দেবো না।

আহমদ বললো, শীঘ্রই চলো। কিন্তু আমরা তো হাজেরার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারলাম না।

নাজমা বললো, নিঃসন্দেহে হাজেরা এক বিরাট খেদমত করেছে। শাহী খান্দানের প্রত্যেকেরই তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

আহমার বললো, সত্যই বোন হাজেরা অসীম সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। আমরা সবাই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হাজেরার কণ্ঠে আকুলতা। বললো, কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রয়োজন নেই। খলীফা ও শাহী খান্দানের লোকদের যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমি হৃদয়ে লালন করি, তা আমাকে বাধ্য করেছে পিতার গাদ্দারীর কথা প্রকাশ করতে। আমি আফসোস করছি। হায়! যদি আমি তা গতকাল জানতে পারতাম!

নাজমা বললো, যাও ভাইয়েরা! এখুনি গিয়ে চেষ্টা করো। জাঁহাপনা যেনো কিছুতেই কেল্লা থেকে বের না হন।

আহমার ও আহমদ ঊর্ধশ্বাসে ছুটে চললো। খলীফার প্রাসাদে পৌঁছে তারা আবুবকরকে পেলো।

আহমার তাকে জিজ্ঞেস করলো, খলীফা আছেন কি?

আবুবকর বললো, তিনি তো এই মাত্র বেরিয়ে গেছেন। কী হলো? তোমাদের এতো পেরেশান দেখা যাচ্ছে কেনো? কোনো খবর আছে কি?

আহমার বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইবনে আলকামীর গাদ্দারী, নিমকহারামী ধরা পড়ে গেছে। সে জেনে-শুনে ষড়যন্ত্র করে খলীফাকে মোঙ্গলদের থাবায় আটকে দিয়েছে।

আবুবকরের কণ্ঠে বিস্ময়। বললো, কী হলো?

আহমদ বললো, পড়ে দেখো। সে আবুবকরের দিকে চিঠিগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বললো, হাজেরা এগুলো নিয়ে এসেছে।

আবুবকর চিঠিগুলো পড়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো। আক্ষেপ আর দুশ্চিন্তায় তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। ক্ষণিকের জন্য একেবারে মূক হয়ে গেলো। তারপর আক্ষেপভরা কণ্ঠে বললো, দুর্ভাগ্য, লোকটা খলীফার বিবেকের উপর আবরণ ঢেলে দিয়েছিলো। আমাদের কারও কথা-ই তিনি কখনো কানে তোলেননি। গাদ্দারের প্রত্যেকটি কথাকে তিনি সত্যমনে করে বিশ্বাস করেছেন। ফলে তারই বিজয় হয়েছে। সে এতোক্ষণে তাকে মোঙ্গলদের হিংস্র থাবায় তুলে দিয়েছে।

সংবাদটি আবুবকরকে এতো আঘাত করলো যে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

আহমার বললো, আরে! আপনি দেখছি একেবারেই ভেঙে পড়েছেন!

আবুবকর বললো, হ্যাঁ, আমার গোটা শরীর পাথর হয়ে গেছে।

তিনজন ফিরে চললো এবং আবুবকরকে তার প্রাসাদে পৌঁছিয়ে দিলো। ফেরদাউস তার অবস্থা দেখে কাঁপতে লাগলো। কাঁপা কাঁপা রোরোদ্যকণ্ঠে বললো, কী হলো আপনার? একেবারে যে বিধ্বস্ত দেখছি!

আবুবকর সোফায় বসে বললো, ফেরদাউস! সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না। যা আশংকা করেছিলাম ঠিক তা-ই হতে চলেছে। এখন আর জীবনের কোনো মূল্য নেই। মৃত্যুই এখন হা হা করে তেড়ে আসবে।

আতংকভরা ফেরদাউসের কণ্ঠ। বললো, কী হয়েছে একটু বলুন না?

আহমার বললো, ইবনে আলকামীর গাদ্দারী ধরা পড়েছে।

আহমারের কথা শেষ না হতেই ফেরদাউস বললো, এখন মহামহিম খলীফা কী বলবেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আহমার বললো, হায়! সবই তো হাতছাড়া হয়ে গেছে! খলীফা এখন ইবনে আলকামীর ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ।

ফেরদাউস বললো, তাহলে কি খলীফা কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ সত্যই ভাগ্যের নির্মম আচরণ বুঝি শুরু হয়ে গেছে। তকদীরের চাকা বুঝি উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এখন আর জীবনের কোনো মূল্য নেই। ...আচ্ছা খলীফাকে কী কোনোভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়?

আহমদ বললো, অসম্ভব।

কিন্তু এই গাদ্দারীর বিষয়টি কীভাবে জানতে পারলে?

ঃ হাজেরা নাসীরুদ্দীন তুসীর চিঠিগুলো পেয়ে আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

ঃ কোথায় চিঠিগুলো?

আহমার চিঠিগুলো ফেরদাউসের হাতে দিয়ে বললো, পড়ে দেখো।

চিঠি পড়তে পড়তে ফেরদাউস বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। বললো, কতো নিচু আর বজ্জাত এই ইবনে আলকামী! নিজের মেয়েকে পর্যন্ত সে হালাকুখানের হেরেমে পৌঁছিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে!

আহমার বললো, নিশ্চয় সে হাজেরার নিকট তার মনের আশার কথাও ব্যক্ত করেছে।

ফেরদাউস বললো, অসম্ভব, হাজেরা একটি ভালো মেয়ে। সে কিছুতেই সূর্যপূজারীর হেরেমে যেতে রাজি হবে না।

আবুবকর বললো, হায়, যদি আমরা এ বিষয়টি গতকালও জানতে পারতাম!

আহমদ বললো, হাজেরা পত্রগুলো পাওয়ার সাথে সাথে নিয়ে ছুটে এসেছে। একটুও দেরি করেনি।

আহমার বললো, এখন আমাদের করণীয় চিন্তা করতে হবে।

আবুবকর বললো, আমাকে একটু শান্ত হতে দাও। একটু প্রকৃতস্থ হতে দাও। তারপর আলোচনা করবো। সবাই নীরব হয়ে গেলো। দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক আর হতাশা তাদের চিন্তাজগতে এক ভয়াবহ আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

আটচল্লিশ.

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ইবনে আলকামীর হাতের পুতুল। ইবনে আলকামী যা বলেন, খলীফা ঠিক তা-ই করেন। নিজের পুত্রদের চেয়ে ইবনে আলকামীর উপর বেশি ভরসা রাখেন। তাই খেলাফতের সকল দায়িত্ব তার জিম্মায় দিয়ে রেখেছেন।

ইবনে আলকামীর জীবনে কোন অপ্রাপ্তি ছিলো না। ধন-দৌলত, সম্মান ও ক্ষমতা সবকিছুই তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু হিংসা আর লোভ তার দু'চোখকে অন্ধ করে রেখেছিলো। ইরাকের শাসক হওয়ার খায়েশ তাকে নিমকহারাম, বেঈমান, গাদ্দার বানিয়ে ছাড়লো। ধীরে ধীরে তার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলো। অত্যন্ত নিচু, ইতর স্বভাবের লোকে পরিণত হলেন। তিনি তার মনিব, সুখ-শান্তি ও ক্ষমতা প্রদানকারী খলীফা এবং পিতার চেয়েও স্নেহশীল লোকটির সাথে গাদ্দারী করেছেন!

ইবনে আলকামী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে বলেছিলেন, মোঙ্গলরা তার অভ্যর্থনার আয়োজন করছে। কিন্তু তিনি যখন মোঙ্গল সৈন্যদের নিকট পৌঁছে

অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন দেখলেন না, তখনই তার চোখ খুলে গেলো। তিনি বুঝে ফেললেন, তিনি ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি ইবনে আলকামীকে বললেন, ইবনে আলকামী! তুমি তো বলেছিলে, মোঙ্গলরা অভ্যর্থনার আয়োজন করছে; কিন্তু কিছুই তো দেখছি না! তারা তো সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত!

ইবনে আলকামী এবার আবরণ খুলে ফেললেন। বললেন, তোমার মতো ব্যক্তিকে তারা অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত মনে করে না।

ইবনে আলকামীর বেয়াদবীমূলক কথায় খলীফার চৈতন্য ফিরে এলো। আবুবকরের প্রত্যেকটি কথা এখন তার মনে পড়তে লাগলো। এই গাদ্দার-নিমকহারাম সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা-ই এখন তার নিকট সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। সত্যই তার এখন দারুণ আফসোস, কেনো তিনি এই নিমকহারামকে আগে চিনতে পারলেন না! কেনো তিনি বারংবার শাহজাদাদের কথাকে উড়িয়ে দিয়েছেন, যার ফলে এখন তিনি মোঙ্গল হায়েনাদের থাবায় এসে পড়েছেন! কিন্তু এখন আফসোস করে কোনো লাভ নেই। আর ইবনে আলকামীর নিকট কিছু বলাও অনর্থক।

তারা হালাকুখানের প্রশস্ত তাঁবুতে পৌঁছুলে হালাকু খান তাদের দেখে ক্রুর হাসি হাসতে লাগলো। খলীফা মনে মনে বললেন, আমি এরই যোগ্য। গোটা দুনিয়া এখন আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসবে। যে সাপকে শত্রু মনে করে না, হীনকে হীন জ্ঞান করে না, উল্টো গাদ্দারকে জানবাজ মনে করে, নিমকহারামকে ওয়াফাদার ভাবে, সে এরই যোগ্য যে, দুনিয়ার মানুষ তার নির্বুদ্ধিতায় হাসবে।

তাঁবুতে প্রবেশ করলে হালাকুখান খলীফাকে বসতে অনুমতি দিলো। ইবনে আলকামী হালাকুখানকে বললেন, জাঁহাপনা, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আব্বাসী খলীফাকে আপনার তাঁবুতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

হালাকুখান তিরস্কার করে বললো, আমি আব্বাসী খলীফাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি জানতাম, রাজারা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী হয়। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারলাম, এমন নির্বোধ ব্যক্তিও রাজা হয়, যে শত্রু-বন্ধু চিনতে পারে না। কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই দুশমনের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়।

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ এর কী উত্তর দেবেন। তিনি তো বর্ণচোরা দুশমনের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ভুল মানুষই করে। তবে আক্ষেপের কথা, আমি নিকৃষ্টতম দুশমনকে দোস্ত মনে করেছিলাম। গাদ্দারকে ওফাদার মনে করেছিলাম। তবে গাদ্দারকে অবশ্যই তার গাদ্দারীর ফল ভোগ করতে হবে।

হালাকুখানের কণ্ঠ শোনা গেলো। বললো, ক্ষমা চাচ্ছি। কোনো চিন্তার

কারণ নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার মর্যাদা পরিপন্থী কোনো কথা বলবো না। আপনি আব্বাসী খান্দানের প্রদীপ। বনু আব্বাস মুসলমানদের হেফাজত করে আসছে।

হালাকুখান এ কথার দ্বারা খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে আরেকটি আঘাত করলো। কয়েকজন আব্বাসী খলীফা তো এমন ছিলেন, যারা মজলুম মুসলিম নারীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং জালেমদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসতাসিম বিল্লাহ ইবনে আলকামীর কথামতো মুসলমানদের হেফাজতের কোনো ব্যবস্থাই করেননি। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, জীবনে তিনি বহু ভুল করেছেন। ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করেছিলেন। মোঙ্গলদের মোকাবেলার জন্য কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি। শুধুই সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ধান্ধায় ব্যস্ত ছিলেন। আজ এ সম্পদ তার কোনো কাজে আসছে না। যদি আজ পর্যাপ্ত সৈন্য থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতো। হতাশাভরা কণ্ঠে খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমার মহান পূর্বসূরীরা মুসলমানদের মোহাফেজ ছিলেন। কিন্তু আমি মুসলমানদের হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা করিনি। তাও ঐ ভুলের কারণেই হয়েছে যে, আমি নিমকহারামকে নিমকহালাল মনে করেছিলাম।

হালাকুখানের কণ্ঠ একেবারে শান্ত। বললো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি মুসলমানদের শিক্ষা দেয়ার জন্যই এসেছি– তাদের শাসন করার জন্য আসিনি। বলুন, আপনি কী চান?

ঃ আমি এখন আপনার বন্দি। সুতরাং আমার কিছু চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ঃ এমন ভাববেন না। নির্দ্বিধায় বলুন, আপনি কী চান?

ঃ আমি সন্ধি করতে চাই।

ঃ কোন্ শর্তে?

ঃ আপনি বিজয়ী। সুতরাং আপনি আপনার শর্ত পেশ করুন।

ঃ আপনি যে শর্তই পেশ করবেন, আমি তা মেনে নেবো। তবে শর্তগুলো যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। তাই আমার প্রস্তাব, আপনি এ ব্যাপারে আলেম, পরামর্শদাতা ও শাহজাদাদের সহায়তা গ্রহণ করুন।

হালাকুখানের এই প্রস্তাবে খলীফার মনের আকাশে আশার ক্ষীণ আলো জ্বলে ওঠলো। তিনি চিন্তা করলেন, যদি পরামর্শের নামে একবারের মতো হালাকুখানের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি, তাহলে তাকে উপযুক্ত উত্তরই দেয়া হবে। খলীফা বললেন, আপনি যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন। তাহলে আমি তাদের সাথে পরামর্শ করে আসি।

হালাকুখানের কণ্ঠে বন্ধুসুলভ সুর। বললো, আমিও চাই, আপনি শহরে গিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে আসুন। কিন্তু আমার সৈন্যরা এখানে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। তারা দ্রুত ফিরে যেতে চায়। তাই আপনি তাদের সবাইকে এখানেই ডেকে আনুন।

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর এখনো চৈতন্য হয়নি। তিনি বুঝতে পারেননি হালাকুখানের উদ্দেশ্য কী?

খলীফা সরলমনে বিশ্বাস করলেন, সত্যই হালাকুখান চলে যেতে চায়। তাই তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে আমি তাদের ডেকে আনছি।

খলীফা তখনই তার একজন বিশ্বস্ত খাদেমকে ডেকে যাদের সাথে তিনি পরামর্শ করতে চান, তাদের নাম বলে শহরে পাঠিয়ে দিলেন। খাদেম শহরে পৌঁছে শাহজাদা আবুবকরের নিকট উপস্থিত হলো এবং তাকে খলীফার পয়গাম শোনালো। আবুবকর তাকে বিদায় করে দিয়ে সাথে সাথে আহমদ, আহমার ও নাজমাকে ডেকে পাঠালো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে উপস্থিত হলো। আবুবকরের কণ্ঠ আজ অত্যন্ত গম্ভীর। বললো, যদি আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, তোমাদের অন্তরে আমার প্রতি কেমন আস্থা ও ভালোবাসা রয়েছে, তাহলে তো তোমরা বিস্মিত হবে না?

আহমার বললো, বিস্ময়ের কিছুই নেই। তবে মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

আবুবকর বললো, তোমার ধারণা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে কথা বলার পূর্বে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আহমদ বললো, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, আপনার কথায় পরিপূর্ণ আস্থা রাখি এবং আপনাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।

নাজমা বললো, আমি আপনাকে যে কেমন বিশ্বাস করি ও মহব্বত করি, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

আহমার বললো, আমি আপনার উপর আস্থাও রাখি না, মহব্বতও করি না।

আবু বকরের কণ্ঠ গম্ভীর। বললো, এখন ঠাট্টা-মশকরা করার সময় নয়।

আহমার বললো, আমি ঠাট্টা-মশকরা করছি না। আমি অন্ধ আস্থা ও অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষপাতি নই।

নাজমার কণ্ঠে রোষ। বললো, যুবরাজের সাথে এসব তুমি কী বলছো?

আহমার বললো, আমার অন্তরে এখন যা আছে, আমি তা-ই বলছি। আগে সেকথা বলা হোক, যাকে ভিত্তি করে এ প্রশ্ন করা হচ্ছে। তখন আমি বলবো, তোমার ওপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস কেমন।

আবুবকর বললো, যদি আমি সে কথা বলতেই পারতাম, তাহলে তো আমার এই প্রশ্নেরই কোনো প্রয়োজন থাকতো না।

নাজমার চোখে ক্রোধভরা দৃষ্টি। সে আহমারকে বললো, যুবরাজকে পেরেশান করো না। তার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আহমদ বললো, আমার সন্দেহ হচ্ছে, যুবরাজ আমাদেরকে এমন কিছু করতে বলবেন, যা আমরা করতে রাজি হবো না।

নাজমা বললো, আমরা যুবরাজের প্রত্যেকটি কথা অম্লানবদনে মেনে নেবো।

আহমার বললো, আমি আপনাকে এতো ভালবাসি ও আপনার কথায় এতোটুকু আস্থা রাখি যে, আপনি ইশারা করলে আমার প্রাণটুকুও বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবো না।

আবুবকরের প্রশান্ত কণ্ঠ শোনা গেলো। বললো, আমি তোমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আর এই আবেদন করছি, তোমরা শীঘ্রই বাগদাদ ছেড়ে চলে যাও। এটা আমার শেষ নিবেদন। আমার কথা বিশ্বাস করো যে, বাগদাদে ভয়াবহ কেয়ামত নেমে আসবে। বাগদাদবাসীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। আমাদের বংশকে চিরতরে মুছে ফেলা হবে। তোমরা আমাদের খান্দানকে রক্ষা করো। এ খান্দানের প্রদীপকে তোমরা নিভে যেতে দিও না।

আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। সে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো। কক্ষজুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। দুঃখ-বেদনা আর মনস্তাপে তারা দিশেহারা, ব্যাকুল, চঞ্চল।

কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভেঙে আহমার বললো, আমি যার আশংকা করেছিলাম, তা-ই ঘটলো।

আবুবকর বললো, তোমরা যদি আমার আবেদন রক্ষা না করো, তাহলে আমার প্রাণবায়ু দেহ ছেড়ে অনন্তে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না। মৃত্যুর পর আমার রূহ বেচাইন হয়ে থাকবে। আমি কেনো একথা বলছি, তাও তোমরা শুনে নাও।

আবুবকর খলীফার দূতের আগমন ও তার উদ্দেশ্যের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলো। পরে বললো, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ষড়যন্ত্র আমাদের টেনে বাগদাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি মহামহিম খলীফা বাইরে না যেতেন, তাহলে আমি কিছুতেই বাগদাদের বাইরে যেতাম না। এখন তোমরা বলো, আমার আবেদন কি তোমরা পূরণ করবে?

সবাই সমস্বরে বললো, মন তো কিছুতেই তা মেনে নিতে চায় না। কিন্তু আপনার হুকুমকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না।

আবুবকর আনন্দিত হয়ে বললো, আজ আমার বুঝে এসেছে, তোমরা আমার উপর কেমন আস্থা রাখো। অজানা সফরের জন্য তৈরি হয়ে আসো আর আমিও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের হাতছানিতে সাড়া দিতে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আসি।

সবাই গন্তব্যহীন সফরের জন্য তৈরি হতে চলে গেলো।

ঊনপঞ্চাশ.

আবুবকর যখন তৈরি হয়ে এলো, ততোক্ষণে আহমদ এবং আহমারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে ফেরদাউস সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তার উজ্জ্বল ঝলমলে সেই সুন্দর মুখখানি দুশ্চিন্তা, আতংক আর উৎকণ্ঠার মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ডাগর চোখ দু'টিতে অশ্রু ছল ছল করছে। ফেরদাউস নির্বাক, বিমূঢ়, হতবুদ্ধি। কান্নার একটা ঝড় তার হৃদয় মরুতে তাণ্ডব তুলে বারংবার ওষ্ঠাধর ও কপোলকে কাঁপিয়ে তুলছে।

আবুবকরের দৃষ্টি এখন ফেরদাউসরে মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ। সে হৃদয় দিয়ে ফেরদাউসের হৃদয়ের অবস্থা উপলব্ধি করছে। কিন্তু কিছুই যে করার নেই। নির্মম ভাগ্যের হাতে নিজেকে সপে দেয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। তাই আবুবকরও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল। ক্ষণকাল পরই আবুবকরের চেতনা ফিরে এলো। তির তির করে তার ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠলো। বললো, সুপ্রিয়া ফেরদাউস! তুমি কি সত্যই বিষন্ন, আতংকিত?

ফেরদাউস অশ্রু ছল ছল ডাগর চোখ দু'টি আবুবকরের দিকে তুলে ধরলো। সে নির্বাক। কোনো কথা নেই তার কণ্ঠে। চোখের ভাষায় যেনো ফেরদাউস আবুবকরকে তার হৃদয়ের আকুতি, অস্থিরতা আর ব্যাকুলতার কথা ব্যক্ত করলো। ঠিক তখন নাজমা এসে উপস্থিত হলো। তার হৃদয়েও দুশ্চিন্তা আর আতংকের ঝড় বইছে। ফেরদাউসের অবস্থা দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

মুহূর্তে আবুবকর সম্বিত ফিরে পেলো। সকল জড়তা, আতংক আর উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললো, শোনো, তোমরা বুঝি ভুলে গেছো, তোমাদের শিরায় আরবদের খুন প্রবাহিত। আরব নারীরা সর্বদা গৌরবময় আবদান রেখে গেছে। হাসতে হাসতে তারা ছেলে, ভাই ও স্বামীদেরকে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়েছে। জখমীদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে, জিহাদের ময়দানে গিয়ে পিপাসার্তদের পানি পান করিয়েছে। প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছে। তবুও তারা কখনো বিমর্ষ, চিন্তিত ও হতাশাক্রান্ত হয়নি। তাই তোমরাও বিমর্ষ হয়ো না।

কান্নাবিজড়িত অথচ দৃঢ়তায় ভরা ফেরদাউসের কণ্ঠ ভেসে এলো। বললো,

আমার মাথার তাজ! যদিও দুঃখ-বেদনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে; তথাপি কথা দিচ্ছি, আমি ধৈর্যধারণ করবো। আমি বীরত্বের পরিচয় দেবো। হায় আফসোস! মহামহিম খলীফা যদি আমার কথা শুনতেন! যদি ইবনে আলকামীকে বিশ্বাস না করতেন!

আবুবকর বললো, এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই। আমার কথা শোনো, নাজমার সাথে তুমিও চলে যাও।

প্রবল আবেগভরা ফেরদাউসের কণ্ঠ। বললো, আমাকে ভীরু মনে করবেন না। জীবন বাঁচাতে আমি কোথাও যাবো না। নাজমা ও অন্যান্য শাহজাদীরা রাজবংশের মেয়ে। তাদের চলে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। বরং অত্যন্ত জরুরি। আমার ভাগ্য আপনার ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে গেছে। সুতরাং আমি কিছুতেই বাগদাদ ত্যাগ করে কোথাও যাবো না।

আবুবকর বললো, ফেরদাউস! একটু ভেবে দেখো, যখন মোঙ্গল হিংস্র হায়েনারা দলে দলে শহরে প্রবেশ করবে, প্রত্যেকটি ঘরে ঢুকে রক্তের নদী প্রবাহিত করবে, ইসলামের আলোকমালা যখন নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখন তুমি কী করতে পারবে?

ফেরদাউসের কণ্ঠে বীরত্বের সুর। বললো, সে সময় আমি তা-ই করবো, যা আরব নারীর জন্য শোভনীয়। নিজের ও ধর্মের হেফাজতের জন্য জিহাদ করতে করতে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করবো। জিহাদের চেয়ে বড় ইবাদত আর কী হতে পারে?

আবুবকর বললো, বেশ আমি তো এটাই চাই যে, তুমি ভাই আহমার ও আহমদের সাথে চলে যাও। তারপর তাদের সাথে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবার এসো।

ফেরদাউসের কণ্ঠে আরো দৃঢ়তা ফুটে ওঠলো। বললো, আমার, তোমার ও অন্যান্য মুসলমানদের প্রতিশোধ ভাই আহমার, আহমদ ও অন্যান্য শাহজাদা ও শাহজাদীরা নেবে। কিন্তু আমার নিবেদন, আপনি আমাকে বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন না।

আবুবকর কী যেনো বলতে চাচ্ছিলো। এমন সময় হাজেরা এসে উপস্থিত হলো। তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা, ভয় আর আতংকের ছায়া। সে বললো, আমি আপনাদের সাথে যেতে প্রস্তুত। আপনারা কি আমাকে সঙ্গে নেবেন?

আবুবকর বললো, তুমি কি তোমার পিতা থেকে পৃথক হয়ে যেতে চাও?

হাজেরা বললো, হ্যাঁ, আমি আজ দারুণ লজ্জিত। অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি আমি। আমার পিতা এ জনপদের জন্য এমন আযাব ডেকে এনেছেন, যা একে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

আবুবকর বললো, আমরা সবাই তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভাই আহমদ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

আহমদ বললো, কিন্তু মোঙ্গল সরদার কী ভাববে?

হাজেরার কণ্ঠ ক্ষোভে পরিপূর্ণ। বললো, আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দেন, তাহলে মোঙ্গল সরদারের মাথাটি আমি ধড় থেকে এক আঘাতে ধরায় নামিয়ে আনবো।

আবুবকরের কণ্ঠে ব্যস্ততার আভাস ফুটে ওঠলো। বললো, আমি এখন তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার শেষ নিবেদন, তোমরা রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাগদাদ ছেড়ে চলে যাও।

আবুবকর বাইরে চলে এলো। দেখলো প্রাসাদের বাইরে বাগদাদের বড় বড় আলেম ও ফকীহগণ দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের ইল্‌মের গভীরতা ও বুযুর্গীর কথা বাগদাদের আমজনতা পরিজ্ঞাত। কিছু খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যুবরাজ আবুবকর বাইরে বেরিয়েই তাদের সালাম দিলো। প্রধান বিচারপতি আবুবকরের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, শোনো আবুবকর! আমার অন্তর বলছে, আমরা সেখানে পৌঁছুলে আমাদের হত্যা করা হবে।

আবুবকর বললো, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, মোঙ্গল সম্রাট যখন আমাদের ডেকেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্যেই ডেকেছেন। সেখানে আমাদের সবচে' ঘোর দুশমন ইবনে আলকামী আছে। তাই সে যে আমাদের হত্যা করতে চাইবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রধান বিচারপতি বললেন, যদি তা-ই ধারণা হয়, তাহলে শিয়া আলেমদের সাথে না নেয়া উচিত।

উপস্থিত আলেম-ওলামার মাঝে শিয়া আলেমরাও ছিলেন। তাদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, আমরা সর্বদা আপনাদের সাথে ছিলাম, আপনাদের সাথে থাকবো। মরতে হয় আপনাদের সঙ্গে থেকেই মরবো।

আবুবকর বললো, তা ঠিক, কিন্তু আপনারা না গেলেই ভালো হয়।

আরেক শিয়া আলেম বললেন, অসম্ভব, আমরা যাবোই। আর যদি যুক্তির কথা বলা হয়, তাহলে আমি বলবো বরং আজকে এই পরিস্থিতিতে শুধু শিয়া আলেমদেরই যাওয়া উচিত।

আবুবকর বললো, আর বিতর্ক করে লাভ নেই। আমরা সবাই যাবো।

সবাই রওনা হয়ে শহরের বাইরে চলে গেলো। মোঙ্গল সিপাইদের নিকট পৌঁছুলে সিপাইরা তাদেরকে হালাকুখানের তাঁবুতে নিয়ে গেলো। হালাকুখান তখন তাঁবুর বাইরে খোলা চত্বরে উপবিষ্ট। তার ডানে-বাঁয়ে বাহিনীর বড় বড়

সেনাপতিরা বসে আছে। উজীরে আজম নাসীরুদ্দীন তুসীও উপবিষ্ট। তার এক পাশে ইবনে আলকামী, অপর পাশে খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ একটি আসনে বসে আছেন।

হালাকুখান আগন্তুকদের দিকে চোখ তুলে তাকালো। সে চোখে যেনো শকুনের তীক্ষ্নতা আর শেয়ালের ধূর্ততা বিরাজমান।

ইবনে আলকামীকে তাদের পরিচয় তুলে ধরতে নির্দেশ দিলো। ইবনে আলকামী দাঁড়িয়ে বললেন, ইনি শাহজাদা আবুবকর। আব্বাসী খেলাফতের যুবরাজ। ইনি প্রধান বিচারপতি। সুবিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এভাবে একে একে সবার পরিচয় তুলে ধরলেন। কে শিয়া আলেম আর কে সুন্নী আলেম, তাও উল্লেখ করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো, নাসীরুদ্দীন তুসী যেনো শিয়া আলেমদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য মোঙ্গল সম্রাটের নিকট সুপারিশ করে।

হালাকুখানের কণ্ঠে ক্রোধ। বললো, আর শাহজাদারা কোথায়?

আবুবকর বিনীত কণ্ঠে বললো, তারা শহরে আছে।

আবার হালাকুখানের অগ্নিঝরা কণ্ঠ ভেসে ওঠলো। বললো, তারা আসেনি কেনো?

ঃ খেলাফতের কোনো কাজে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি পরামর্শ সভায়ও তারা উপস্থিত হতো না। তাই তারা আসেনি।

ঃ তোমার নাম কি আবুবকর?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বাগদাদে ফেতনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তুমিই হোতা ছিলে?

ঃ কে তা করতো, তাকে দুনিয়ার সবাই চেনে। আমি সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পথে কাজ করেছি। কখনো ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেইনি।

হালাকুখান ইবনে আলকামীর দিকে তাকিয়ে বললো, ওফাদার বন্ধু! তুমি তার অপরাধের কিছু বিবরণ তুলে ধরো।

ইবনে আলকামী দাঁড়িয়ে বললো, এই শাহজাদা শিয়াদের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করেছে। সুন্নী দাঙ্গাবাজদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে নিষ্পাপ শিয়াদের বন্দি করেছে। মোঙ্গল সরদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছে। মোঙ্গল সৈন্যরা শহর অবরোধ করলে সে-ই বাগদাদবাসীদের মোকাবেলার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। মোঙ্গলদের প্রতিটি আক্রমণ সে-ই প্রতিহত করেছে।

বিদ্রূপভরা হালাকুখানের কণ্ঠ। বললো, তুমি কি তোমার অপরাধের তালিকাটি শুনেছো?

আবুবকর বললো, শুনেছি। তবে প্রথম দু'টি অভিযোগের উত্তর শিয়া আলেমরা দেবেন। পরবর্তী দু'টি প্রশ্নের উত্তর হলো, উজীরে আযমের অনুমতি ছাড়া কখনো ফৌজ প্রেরিত হয়নি, আর হওয়া সম্ভবও ছিলো না।

ইবনে আলকামী বললেন, সম্রাট মহোদয়! এর কথা-বার্তা খুবই শাণিত আর উপস্থিত উত্তর প্রদানে দারুণ পারদর্শী।

হালাকুখানের শির দুলে ওঠলো। ওষ্ঠে মৃদু বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আবু বকরের কণ্ঠে বীরত্বের সুর। বললো, আমি জানি, আমার কোনো কথা-ই শোনা হবে না। তবে আমি বলতে চাই, আমি আব্বাসী খেলাফতের উত্তরাধিকারী শাহজাদা। আমি ভীরু নই। আমি বীরপুরুষ। বীরের মৃত্যুই আমার কাম্য। আমার অন্তিম তামান্না, আপনি এই নিরপরাধ আলেমদের হত্যা করবেন না।

হালাকুখান এক হিংস্র রক্তপিপাসু যোদ্ধাকে ইশারা করলো। সে উঠে এসে আবুবকরের গর্দানে ধারাল তরবারী দ্বারা আঘাত করলো যে, তার মাথাটি দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়লো। এ দৃশ্য দেখে খলীফার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। দুশ্চিন্তা আর বিষন্নতার পাহাড় যেনো তাকে পিষে ফেলছে। তিনি আর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

হালাকু খান এবার প্রধান বিচারপতির দিকে ফিরে তাকালো। বললো, তুমি বুঝি সবচে' বড় আলেম, সবচে' বেশি জ্ঞানী লোক?

বিচারপতি বললেন, আমি প্রধান বিচারপতি একথা সত্য। কিন্তু আমি যে সবচে' বড় আলেম, সে দাবি করি না।

হালাকুখান দাঁতে দাঁত পিষে বললো, তুমি নাকি আমাকে কাফের বলো?

প্রধান বিচারপতি বললেন, কখনো তো আমাকে কেউ এমন কথা জিজ্ঞেস করেনি। তবে আপনি যদি মূল বিষয়টি জানতে চান, তাহলে আমি বলছি, আমাদের মা'বুদ বা উপাস্য ঐ সত্ত্বা, যিনি এ নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যা দু'চোখে দেখি, আর যা দেখি না সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আকাশ-পাতাল, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্র, আগুন-পানি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। আর আমরা তার সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে ছেড়ে অন্য কোনো কিছুর পূজা করে, সে কাফেরই বটে।

হালাকুখান ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তুমি আমাকে কাফের বলছো, তোমার শাস্তিও মৃত্যু। এক মোঙ্গল সৈন্য এক আঘাতে প্রধান বিচারপতির শির উড়িয়ে দিলো। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর হালাকুখান প্রত্যেক আলেমকে একই প্রশ্ন করলো, যা প্রধান বিচারপতিকে করেছে আর প্রত্যেক আলেমই প্রধান বিচারপতির মতো উত্তর শুনিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। সত্যাশ্রয়ী আলেমরা সবাই একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। শিয়া আলেমরা পর্যন্ত মুক্তি পেলেন না।

এরপর খেলাফতের পৃষ্ঠপোষক ও উজীরদের পালা এলো। হালাকুখান তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো, তারা মোঙ্গল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তাই তাদের হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। তারাও শহীদ হয়ে গেলেন।

এতোক্ষণ পর্যন্ত খলীফা নিষ্পলক ও বিস্ফারিত চোখে মোঙ্গলদের রক্তের হোলি খেলা দেখছিলেন আর আক্ষেপ করছিলেন। এবার হালাকুখান তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, বাগদাদে অবস্থিত সিপাইদের নিকট নির্দেশ পাঠাও, তারা যেনো শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

খলীফা অপারগ। এখন তিনি হালাকুখানের হাতের পুতুল। হাঁ-না কিছুই বলার অধিকার তার নেই। তাই নীরবে নির্দেশনামা লিখে দিলেন।

পঞ্চাশ.

ক্লান্ত দিনমণি পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হতেই খলীফার প্রাসাদে চাঞ্চল্য বেড়ে গেলো। আহমদ, আহমার, নাজমাসহ অন্যান্য শাহজাদা ও শাহজাদীরা অনিশ্চিত যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলো। বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে তাদের মন না চাইলেও আবুবকরের সাথে কৃত ওয়াদাই যেনো তাদের বাগদাদ ত্যাগে বাধ্য করছে।

এর মাঝে তারা জানতে পারেনি, যুবরাজ আবুবকরকে শহীদ করা হয়েছে। বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা, ফকীহ, বুযুর্গ ব্যক্তি ও ওজীরদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। যদি ঘুণাক্ষরেও তারা তা জানতো, তাহলে বাগদাদ ছেড়ে তাদের আর যাওয়া হতো না। হয়তো সংখ্যায় কম হলেও তারা জিহাদের স্পৃহায় আত্মহননের উন্মাদনায় শহর থেকে বেরিয়ে মোঙ্গল সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। আর হয়তো ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অন্য ধারায় লিপিবদ্ধ হতো।

সে রাতে ছিলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুনিয়ার সকল তমসা যেনো সেদিন বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেমে এসেছিলো। শহরে যথেষ্ঠ আলো থাকায় তা অনুভব করা না গেলেও শহরের বাইরে ছিলো তমসার একচ্ছত্র দাপট। এতো অন্ধকার যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না।

শাহজাদা-শাহজাদীদের এই ছোট্ট কাফেলাটি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হাজেরাও এসে তাদের সাথে যোগ দিলো। নাজমা ও হাজেরা উভয়ে মিলে ফেরদাউসকে সাথে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ফেরদাউস অটল। স্বীয় মত থেকে কিছুতেই টলতে রাজি নয় সে। বললো, আবুবকরের জীবন খলীফার জিন্দেগীর সাথে মিশে গেছে আর আমার জিন্দেগী আবুবকরের জীবনের সাথে একাকার হয়ে

আছে। তাই আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। তার যে পরিণত হবে, আমিও সেই পরিণতি অম্লানবদনে হৃষ্টচিত্তে মেনে নেবো। হায়! যদি ফেরদাউস জানতে পারতো, আবুবকর ইতিমধ্যে শাহাদাতের অমীয় শরাব পান করে জান্নাতবাসী হয়েছে!

ফেরদাউস কোনো প্রকারেই যেতে প্রস্তুত না হলে এই ছোট্ট কাফেলাটি বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। কাফেলায় রয়েছে কয়েকজন শাহজাদা-শাহজাদী, দাস-দাসি। তারা সাথে কিছু দীনার, মূল্যবান অলংকার ও কাপড়-চোপড় ও অত্যন্ত জরুরি সামগ্রী নিয়ে নিলো। ঘোড়ায় সামান তুলে শাহজাদা-শাহাজাদীরা তাতে আরোহণ করলো। সবশেষে পুরুষরা ও দাসিরা ঘোড়ায় আরোহণ করলো। তারপর যাত্রা শুরু হলো।

শাহজাদা-শাহজাদীদের এই প্রস্থানের বিষয়টি কেউ জানতে পারলো না। যারা দেখলো তারা ভাবলো, হয়তো শাহজাদারা মোঙ্গলদের নিকট যাচ্ছে। যদি বাগদাদের মানুষ জানতো পারতো, তারা বাগদাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাহলে বাগদাদের অগণিত নারী-পুরুষ তাদের সাথে রওনা হয়ে যেতো। শহরে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। আর হয়তো শহর থেকে তারা বের হওয়ামাত্র মোঙ্গল ফৌজের হাতে ধরা পড়ে বেঘোরে জীবন হারাতো। কিন্তু সবার অজান্তে ও অজ্ঞাতে তারা নগর প্রচীরের ফটকের নিকট পৌঁছলো। তারা পৌঁছামাত্র ফটক খুলে দেয়া হলো। তারা নির্বিঘ্নে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

তারা যে পথে চলছে, সেটি সিরিয়ার পথ। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখলো, মোঙ্গল সৈন্যদের সারি সারি তাঁবু। তাঁবুর চারপাশে মশাল জ্বলছে। প্রহরীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টহল দিচ্ছে। মোঙ্গল সৈন্যদের তাঁবু দেখেই তাদের পিলে চমকে ওঠলো। কাফেলা দাঁড়িয়ে গেলো।

আহমার বললো, তুমি ঠিক বলেছো। প্রত্যেকটি পথেই মোঙ্গল সৈন্যরা তাঁবু ফেলে পথ বন্ধ করে আছে। আমাদের এ পথ ছেড়ে বনবাদাড় ও মরুর বুক চিরে এগুতে হবে।

আহমার বললো, বিস্‌মিল্লাহ বলে বামদিকে চলতে শুরু করো।

পথ ছেড়ে এখন কাফেলা গভীর অন্ধকারের মধ্যদিয়ে চলতে লাগলো। সকলের অন্তর ভয়ে টুক টুক করছে। যদি কোনো মোঙ্গল প্রহরী দল এদিকে ছুটে আসে, তাহলে কী হবে? আহমার সবাইকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে, নীরবে এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলবে, যেনো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও মোঙ্গল সৈন্যরা শুনতে না পায়।

তারা মোঙ্গল সৈন্যদের থেকে দূরে থেকে থেকে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ তারা

বুঝতে পারলো, তারা একদল মোঙ্গল সৈন্যের তাঁবুর নিকটে চলে এসেছে। ভয়-ভীতি আর আতংকে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। প্রতি মুহূর্তে গ্রেফতারের আশংকায় তারা অস্থির-চঞ্চল। ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলো। ঘোড়ার পায়ের শব্দও শোনা যায় না। কিন্তু নীরব-নিঝুম রাতে সামান্য আওয়াজও উচ্চ শোনায়। তাই তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতে লাগলো।

এদিকে আহমদ ও আহমার কাফেলার সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, যদি তারা কোনো মোঙ্গল বাহিনীর মুখামুখি হয়ে যায়, তাহলে তারা তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর শাহজাদা-শাহজাদীরা ঘোড়া নিয়ে মুহূর্তে পালিয়ে যাবে।

কিন্তু ভাগ্যের জোরে তারা মোঙ্গল সৈন্যের মুখোমুখি হয়নি। মোঙ্গল সৈন্যদের পেছনে ফেলে তারা বহুদূর এগিয়ে গেছে। এবার তারা মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে পশ্চাতে ফিরে তাকালো। মোঙ্গল সৈন্যদের সারি সারি তাঁবু আর মশালের আগুন দেখতে পেলো। আগুনের আলোয় মোঙ্গল সৈন্যদের চলাফেরা করতে দেখলো। আরো দূরে একেবারে দিগন্তে বিরাট প্রাচীরের আলো। আফসোস আর আক্ষেপে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠলো। তাদের হৃদয় শুকিয়ে যেনো মরু হয়ে গেলো। হায়! এই তো সেই স্বপ্ন নগরী বাগদাদ। এই নগরীতে তারা জন্মলাভ করেছে। এখানেই তারা লালিত-পালিত হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বর্গতুল্য এ নগরীতে তাদের আনন্দ-সুখের কোনো কমতি ছিলো না। মোহনীয় গানের কলি সর্বদা তাদের কানে গুঞ্জরিত হতো। একের পর এক বাগদাদের স্মৃতি তাদের হৃদয়কে অস্থির করে তুললো। কিন্তু আগামীকাল সে স্বপ্নের নগরীর কী অবস্থা হবে? তা কি চিরদিনের জন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে? দুঃখভরা হৃদয় নিয়ে তারা আবার সামনে চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে বাগদাদের সেই শেষ চিহ্নটুকুও অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

শাহজাদা-শাহজাদীদের কাফেলাটি শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই শহরের অন্য ফটক দিয়ে খলীফার দূত শহরে প্রবেশ করলো। এরা জানে, আবুবকর এবং তার সাথে যারা মোঙ্গল সম্রাট হালাকুখানের নিকট গিয়েছিলো, তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু হালাকুখান তাদের নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেনো শহরে গিয়ে এ কথা কাউকে না বলে। যদি বলে, তাহলে তারা তো নির্মম শাস্তি থেকে রেহাই পাবেই না, উপরন্তু তাদের পরিবার-পরিজনকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।

বন্দি খলীফা এখন বোঝেন, সবকিছু ইবনে আলকামীর ইশারায়ই হচ্ছে। শহর থেকে যেসব ফৌজ বেরিয়ে আসবে, তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু খলীফা এতো ভীত ও সাহসহারা হয়ে পড়েছেন যে, সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও তিনি

ফৌজদের ডেকে আনতে অস্বীকার করলেন না। যদি খলীফা বেঁকে বসতেন এবং ফৌজদের শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ না দিতেন, তাহলে মোঙ্গল সৈন্যরা এতো সহজে শহরে প্রবশে করতে পারতো না। হয়তো খলীফাকে হত্যা করা হতো। আর হত্যা তো তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়েই আছে। তাই হয়তো বাগদাদের মুসলমানদের উপর যে প্রলয় নেমে এসেছিলো, তা এতো ভয়াবহ হতো না।

আব্বাসী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর প্রতি বাগদাদের জনগণ ছাড়া গোটা ইরাকের লোকদের এতোটা বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো যে, তারা যদি শুনতো, বর্বর মোঙ্গলরা খলীফা ও তার পুত্র আবুবকরকে হত্যা করেছে, তাহলে প্রতিশোধস্পৃহায় গোটা ইরাকের জনমানব অস্ত্র হাতে নেমে আসতো। ভীষণ যুদ্ধ হতো। আর এটাও বিচিত্র ছিলো না যে, মোঙ্গলরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতো।

ইবনে আলকামীর অপরাধ, তিনি গাদ্দারী করেছেন, নিকমহারামী করেছেন। আর খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর অপরাধ, তিনি অত্যন্ত ভীরুতা দেখিয়েছেন। সামান্যতম বীরত্বও প্রদর্শন করেননি। যদি খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের ধারার অভিশাপ নেমে না আসতো, বরং দেশের বিজ্ঞজনদের পরামর্শের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতো, তাহলে আবদুল্লাহ আবু আহমদ মুসতাসিম বিল্লাহ কিছুতেই খলীফা হতে পারতেন না। আর ইসলামী দুনিয়ায় এই প্রলয় নেমে আসতো না।

খলীফার দূত রাতেই প্রধান সিপাহসালারের নিকট গিয়ে খলীফার পয়গাম শোনালো। সিপাহসালার এই পয়গাম শুনে বিষম চিন্তায় পড়লেন। মনের আকাশে বিভিন্ন আশংকা ও সংশয় দেখা দিলো। জিজ্ঞেস করলেন, যুবরাজ আবুবকর ও তার সাথে যেসব আলেম-ওলামা ও নেতৃবর্গ গিয়েছে, তাদের অবস্থা কী?

দূত বললো, তারা ভালো আছেন। তারা খলীফার সাথেই আছেন।

সিপাইসালার নীরবে চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। দূতকে বিদায় করে আরো গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিন্তু কী সিদ্ধান্ত নেবেন তার কিনারা পেলেন না। তাই অন্যান্য অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। বিষয়টি অবহিত করে সবার নিকট পরামর্শ চাইলেন।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, যখন খলীফা নিজে এই পয়গাম পাঠিয়েছেন, তখন তার ডাকে আমাদের সাড়া দেয়াই কর্তব্য। তাই আগামীকাল সকালেই সকল ফৌজ নিয়ে আমরা শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবো।

রাতেই ফৌজের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হলো, যেনো সবাই আগামীকাল সকালে শহরের বাইরে সমবেত হয়।

নিত্যদিনের মতো পরদিন সূর্য উদিত হলো। কিন্তু তার মুখে যেনো আজ আর আনন্দ নেই। বিষাদ তাকে ঘিরে আছে। পৃথিবীকে আজ নির্মল আলোয় যেনো আলোকিত করতে সে নারাজ। বাগদাদের বুকে যে প্রলয় আজ বয়ে যাবে, তা দেখতে যেনো সে অপ্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহর দেয়া অমোঘ বিধান তাকে মানতেই হবে। তাই ধীরে ধীরে পূর্ব আকাশে আলো ছড়িয়ে উঁকি দিলো। তারপর বেরিয়ে এলো পূর্বদিগন্তে।

এদিকে বাগদাদের সেনা ছাউনিতে তাড়া হচ্ছে, দ্রুত বেরিয়ে এসো আর দেরি করো না। তড়িঘড়ি করে নিরস্ত্র ফৌজরা নগর প্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর মোঙ্গল ফৌজদের নিকট পৌঁছুতেই তারা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। হাজার হাজার বর্বর হিংস্র মোঙ্গল সৈন্যদের মাঝে মুসলিম ফৌজরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পর হালাকুখান খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ও ইবনে আলকামীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। ইবনে আলকামী বললেন, এরা অবাধ্য সিপাহী। মোঙ্গল সৈন্যদের বিরুদ্ধে এরাই জীবনপণ যুদ্ধ করে তাদের সমূহ ক্ষতি করেছে।

হালাকুখানের চোখ যেনো আগুনের পিণ্ড। ক্রোধে তার আপদমস্তক থর থর করে কাঁপছে। বললো, এই অপদার্থদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

হালাকুখানের মুখ থেকে শুধু 'মৃত্যুদণ্ড' শব্দটি বের হতেই চারদিক থেকে হিংস্র মোঙ্গলরা নিরস্ত্রদের উপর তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে নিরস্ত্র মুসলিম সৈন্যদের হত্যা করতে লাগলো। আর্তচিৎকার, ছুটাছুটি, বাঁচার চরম আকুতিতে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তের স্রোতের মাঝে মুসলিম ফৌজরা চিরশান্ত সমাহিত হয়ে গেলো। নির্বাক খলীফা। বোবা দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইলেন।

হাজার হাজার মুসলমান সিপাইকে রক্তপিপাসু মোঙ্গল সৈন্যরা চোখের পলকে হত্যা করে ফেললো। তারপর হালাকুখানের নির্দেশে তাদের লাশ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হলো। নিষ্পাপ হাজার হাজার মুসলিম সিপাইর রক্তে দজলা নদীর পানি লাল হয়ে গেলো।

মুসলমান সিপাইদের এই নির্মম হত্যার দৃশ্য দেখে ইবনে আলকামীর চোখ আনন্দে ঝলমল করতে লাগলো। কারণ, খলীফা এদের উপরই নির্ভর করতেন। এরাই বাগদাদ নগরী হেফাজত করতো। এরাই মোঙ্গল বাহিনীকে শহরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে। এদের হত্যা করার ফলেই তো ইবনে আলকামী মোঙ্গল বাহিনীর জন্য বাগদাদের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে পারছে।

ইবনে আলকামী বিমর্ষ খলীফার দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, এ ফৌজী

শক্তির উপর ভরসা করেই না আমাকে অপমান করেছিলে। আমার লোকদের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিলে। আমার কোনো আবেদনই গ্রহণ করোনি। আজ কোথায় তোমার সেই সুপুত্ররা? কোথায় তোমার সেই ফৌজ, যাদের ভরসায় আমাকে অপমান করেছিলে?

বিষন্ন খলীফার কণ্ঠ। বললেন, হ্যাঁ, আমার ভুলই হয়েছে। আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।

ইবনে আলকামী বললেন, আমাকে এখনো পুরোপুরি চিনতে পারোনি। আমি যে সোনালী যুগের সূচনা করতে যাচ্ছি, যে গৌরবময় ইতিহাস গড়তে যাচ্ছি, তার অভিযাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র। আহ যদি তুমি তার শেষও দেখতে পারতে! আল্লাহ না করুন যেনো এর মাঝে অন্য কিছু না ঘটে।

খলীফা বললেন, তুমি সত্যই বলেছো। এর মাঝেই অন্য কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু ভুলে যেও না, তুমি আমার নিকমখোর ছিলে।

ইবনে আলকামী বললেন, হ্যাঁ, আমি নিমকখোর ছিলাম বটে। তবে তার বিনিময়ে তোমার সাম্রাজ্যও পরিচালনা করেছি। যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি আর তুমি ছিলে আনন্দ-ফূর্তিতে বিভোর। গান-বাজনায় নিমগ্ন। আমি আমার কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছি। সুতরাং তোমার নিমকখোর কীভাবে ছিলাম?

ঠিক তখন হালাকুখানের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়লো। আমার বাহাদুর জানবাজ সৈন্যরা! বাগদাদ শহরে এখন তোমাদের মোকাবেলা করার কেউ নেই। এ শহরের কথা তোমরা অনেক শুনেছো। এর ধন-দৌলত, সোনা-রূপা, মুক্তা-মাণিক্য আর পান্নার সুখ্যাতি দুনিয়াজোড়া। এ শহরের সুন্দরী, রূপসী, মোহময়ী ললনার ডাগর চোখের চাহনী বিশ্বখ্যাত। এ সম্পদ আর হূর-পরীদের অর্জন করতে হলে রক্তের নদী অতিক্রম করতে হবে। যাও, শহরে প্রবেশ করো। যারা নিরাকার খোদাকে ইবাদত করে, তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করো আর বলো, আমাদের খোদা আমাদের বিজয় দান করেছেন। স্মরণ রাখবে, কোনো রূপসী যুবতীকে কিন্তু হত্যা করবে না আর মুসলমানদের কোনো স্মৃতি-চিহ্ন বাকি রাখবে না।

মোঙ্গল সৈন্যরা এ দিনের অপেক্ষায় অধীর ছিলো। তারা জানতো, বাগদাদ সম্পদের খনি। এ শহরে কোনো গরীব নেই। আর এ কথাও প্রসিদ্ধ যে, পৃথিবীর কোথাও বাগদাদের চেয়ে রূপসী নারী নেই।

সম্রাটের নির্দেশ শুনেই মোঙ্গল সৈন্যরা শহরের দিকে ছুটতে শুরু করলো। ধূলি উড়িয়ে বাতাসের গতিতে ছুটলো। শহর রক্ষার জন্য এখন কোনো সৈন্য নেই। নগর-প্রাচীরেও শহরবাসীদের কেউ মোঙ্গলদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য দাঁড়িয়ে নেই।

আফসোস! এতো কিছুর পরও বাগদাদের অধিবাসীদের চেতনা ফিরে আসেনি। এখনো তারা গান-বাদ্য-নিত্য আর আমোদ-ফূর্তিতে ডুবে আছে। তারা একবারও ভেবে দেখেনি, আল্লাহর গজব মোঙ্গলদের রূপ ধারণ করে বাগদাদের বাইরে অপেক্ষা করছে। সুতরাং আল্লাহর এই গজব থেকে বাঁচতে হলে তওবা করে আল্লাহরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হতে হবে। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতে হবে। এ চেতনাটুকুও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়নি। তারা ভেবেছে, আমাদের নিকট ধন-দৌলত আছে। আমরা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করবো। অবাধে আনন্দ-উল্লাস করবো, নৃত্য আর গান-বাদ্যে মেতে থাকবো। আমাদের এই ধন-দৌলত, এই হাসি-আনন্দ কোনোদিন কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহর দেয়া ধন-দৌলতে তারা প্রবঞ্চিত হয়েছে। অহংকারী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে গেছে। মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে।

নগরের ফটকগুলো খোলা ছিলো। মোঙ্গল সৈন্যরা তাতে অনায়াসে প্রবেশ করলো। শুরু হলো গণহত্যা। নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, কেউ-ই তাদের তরবারীর আঘাত থেকে রক্ষা পেলো না। রাস্তায় রাস্তায় বাজারে বাজারে মানুষের লাশের স্তূপ জমে গেলো। চারিদিকে রক্তের নদী বইতে লাগলো। আর্তনাদ আর বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে চারদিক আতংকে ভরে গেলো।

মোঙ্গল সৈন্যরা শহরের কয়েকটি ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো। যে-ই তাদের সামনে পড়েছে, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যে বাড়িই পথে পড়েছে, তাতে ঢুকে অধিবাসীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে ধন-দৌলত লুট করেছে।

মুহূর্তে গোটা শহরে মোঙ্গল সৈন্যদের আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। পুরুষরা ভয়ে হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হয়ে গেলো। নারীরা মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললো। শিশুরা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মায়েদের জড়িয়ে ধরলো। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। এক মহাপ্রলয় কাণ্ড।

বাগদাদের অধিবাসীদের আজ কোনো আশ্রয় নেই। কোনো ত্রাণকর্তা নেই। আল্লাহর গজব এসে গেছে, তাই তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও কেউ নেই। মোঙ্গল সৈন্যের নিকট মানুষের কোনো মূল্য নেই। হত্যার পর হত্যা করে, লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠন করে তারা এগিয়ে চললো। চারদিকে রক্ত আর রক্ত, লাশ আর লাশ। পানির মতো খুন প্রবাহিত হচ্ছে।

কেউ কেউ বাঁচার আকুতি নিয়ে নগর ফটকের দিকে ছুটলো। কিন্তু বাঁচার সকল পথই আজ রুদ্ধ। সেখানেও আজরাইলের রূপ ধরে মোঙ্গল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। যে-ই মোঙ্গল সৈন্যের সামনে পড়ছে, অমনি নাঙ্গা তলোয়ার ছুটে এসে তাকে নিমিষে নিঃশেষ করছে।

বহু নারী ও যুবতী এই হত্যালীলা দেখে ভয়ে মৃত্যুবরণ করে। অনেকে কুরআনের দোহাই দিয়ে বাঁচতে চাইলো। কিন্তু সূর্যপূজারী মোঙ্গলরা কুরআনের মর্যাদা কী বোঝে? তারা কুরআন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের হত্যা করলো।

হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু ও যুবতীদের হত্যার পর এবার মোঙ্গল সৈন্যদের মনে অন্য চেতনা জাগ্রত হলো। পিশাচ মোঙ্গলরা এবার রূপসী যুবতীদের ধরে এনে প্রকাশ্যে তাদের লালসা চরিতার্থ করতে লাগলো। তাদের কৌমার্য ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত করতে লাগলো।

চারদিকে হত্যালীলা চলছে। নারী-পুরুষ, শিশু কেউ রক্ষা পাচ্ছে না। মোঙ্গল সৈন্যরা যাকে পাচ্ছে, তাকেই নির্দয়ভাবে হত্যা করছে। বাগদাদ নগরী রোজ কেয়ামতের চেয়ে যেনো বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়ে রাস্তার উভয় পার্শ্বের নালায় গড়িয়ে পড়ছে। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে বড় নালায় পড়ছে। তারপর তা দজলা নদীতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। বাগদাদবাসীদের রক্তে দজলা নদীর পানি লালে লাল হয়ে গেছে। যেনো তা রক্তের নদী। এ নদীতে আজ রক্তের ঢেউ খেলছে। মাইলের পর মাইল শুধু লাশ আর রক্ত পরিদৃশ্য হচ্ছে।

নগণ্য কিছু লোক ভূগর্ভস্থ কুঠরীতে আত্মগোপন করে জীবন রক্ষা করলো। যারা ঘরে-বাইরে, এদিকে-সেদিকে আত্মগোপন করেছিলো, তারা নিজেদের জীবন রক্ষা করতে পারলো না। হানাদার মোঙ্গলদের তরবারীর আঘাতে তারাও বেঘোরে প্রাণ হারালো।

প্রলয়ের সেই দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। ৬৫৬ হিজরী। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে বাগদাদ শহরে ষোলো লাখ মুসলমান মোঙ্গল তাতারীদের হাতে শহীদ হয়েছিলো। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো। পাপাচার ও আয়েশ–আরামে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলো।

একান্ন.

বাগদাদ শহরে মোঙ্গল সৈন্যরা প্রবেশের পর সেই যে প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়েছে, তার যেনো শেষ নেই। লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত এই প্রলয়কাণ্ড চলে। যেদিকে চোখ যায় শুধু রক্ত আর রক্ত, লাশ আর লাশ। এদিক-সেদিক চারদিক থেকে আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। পুড়ছে ঘরবাড়ি, প্রাসাদ আর বাসভবন। ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে সুনীল আকাশ।

বাঁচবার ক্ষীণ আশা নিয়ে মানুষ যেখানেই আশ্রয় নিচ্ছে, সেখানেই যমদূতের মতো মোঙ্গল সৈন্যরা হাজির হচ্ছে। নির্দয় আঘাতে একের পর এক হত্যা করছে। তারপর সেই আশ্রয়স্থলটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মুসলমানরা হাসপাতালে

আশ্রয় নিলে মোঙ্গল সৈন্যরা হাসপাতালে উপস্থিত হচ্ছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে। অসুস্থ রোগাক্রান্তদের যবাই করছে। তারপর হাসপাতালে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। মুসলমানরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিলে মোঙ্গল সৈন্যরা সেখানে উপস্থিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি কক্ষ তালাশ করে করে মুসলমানদের হত্যা করছে, রক্তের সমুদ্র বইয়ে দিচ্ছে। তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারদিকে আগুন দিচ্ছে। লেলিহান আগুনের থাবায় সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বাগদাদে বড় বড় পঞ্চান্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো। তার কয়েকটি খেলাফতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। অবশিষ্ট সবগুলো আমীর ও সর্দাররা নির্মাণ করেছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের জন্য বিরাট বিরাট জমিদারি ওয়াক্ফ ছিলো। তার আয় থেকে এ প্রতিষ্ঠানগুলো চলতো। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো মর্মর পাথরে নির্মিত উঁচু উঁচু এমন দৃষ্টিনন্দন যে, তাকালে চোখ ফেরানো মুশকিল। মর্মম পাথরে নির্মিত আলমারীতে মহামূল্যবান পুস্তকসমূহ থরে থরে সাজিয়ে রাখা হতো।

নরপশু মোঙ্গল সৈন্যরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে নির্মমভাবে ছাত্র ও অন্যান্য লোকদের হত্যা করেছে। লাইব্রেরীর মহামূল্যবান আলমারী ভেঙে পুস্তকগুলোয় আগুন দিয়েছে। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ইট-পাথরের স্তূপে পরিণত করেছে।

বাগদাদের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি ছিলো বিশাল। কতো বিশাল বলা দুষ্কর। অত্যন্ত শানদার ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিলো বিশাল চল্লিশটি ইমারত। প্রত্যেকটি বিষয়ের, প্রত্যেক শাস্ত্রের অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ পুস্তকসমূহ তাতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষিত ছিলো। এ লাইব্রেরী ছিলো মুসলিম বিশ্বের অহংকার ও গৌরবের ধন। পাঁচশ বছর ধরে মুসলমান খলীফা, আমীর ও জ্ঞানী-গুণীরা তিলে তিলে সাজিয়ে ছিলেন এটি।

নরপশু মোঙ্গল সৈন্যরা সেই লাইব্রেরীতে আক্রমণ চালায়। তার মহামূল্যবান পুস্তকসমূহ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করে। রক্তে রক্তে পুস্তকের পাতা লাল হয়ে গেলো। তারপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়।

বাগদাদে মাজারও কম ছিলো না। প্রত্যেক মাজারের ইমারত বড় চকৎকার করে তৈরি করা হতো। স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত সুসজ্জিত মাজার। প্রত্যেকটি মাজারে মোঙ্গল সৈন্যরা আক্রমণ করলো। সোনা-রূপা লুটে নিলো। তারপর মাজারগুলো মিসমার করে দিলো।

আমীর-রঈসদের প্রাসাদগুলোর সাথে সাথে শাহীমহলগুলোও আক্রান্ত হলো।

শিয়া এলাকা কারখ জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সুন্নী, হাম্বলী, শাফেয়ীদের মহল্লাগুলোও বিরান করে ফেলা হলো।

মোঙ্গল সৈন্যরা ইসলামী স্থাপনা ও স্মৃতিসৌধগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলো। প্রত্যেক মসজিদ, মাজার, বালাখানা, বাসভবন, অট্টালিকা, প্রাসাদ, লাইব্রেরী, গবেষণাগার ও হাসপাতালে আক্রমণ করে তার মূল্যবান সামগ্রী লুটে নিলো। সাথে সাথে হত্যাযজ্ঞ চললো সমান তালে। তারা ভেড়া-বকরীর মতো মুসলমানদের যত্রতত্র হত্যা করছে আর সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

শহরের চারদিকে হত্যাযজ্ঞ চলছে। মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে কোথাও গিয়ে কেউ আশ্রয় পাচ্ছে না। ঠিক তখন কিছু মুসলমান এক প্রশস্ত ময়দানে জড়ো হতে লাগলো। বিশাল ময়দান। এক লাখ মানুষ তাতে সহজেই অবস্থান করতে পারে। ময়দানের পশ্চাতে আমীরদের কিছু মহল বিদ্যমান। ময়দানে সমবেত মুসলমানরা তাদের স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানদের সেই মহলগুলোতে পাঠিয়ে দিলো। ফেরদাউস, তার পিতা ইয়াকুব ও মাতা যোবাইদাও একটি মহলে আশ্রয় নিলো। তারা জীবন-মরণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাদের হাতে ধারালো তরবারী। মুখে আল্লাহর নাম। তাদের প্রতিজ্ঞা, মোঙ্গল সৈন্যরা আক্রমণ করলে তারাও আক্রমণ করবে। হত্যার বিনিময় হত্যা দিয়ে হবে। রক্তের বিনিময় রক্ত দিয়ে হবে। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে তবেই মরতে হবে।

গোটা বাগদাদ শহরে এরাই প্রকৃত মুসলমান। সর্বস্তরের প্রকৃত মুসলমানরা এখানে এসে সমবেত হয়েছে। এদের মাঝে আছেন ছাত্র-শিক্ষক, মজুর-শ্রমিক, আমীর-ফকীর, আলেম-উলামা, মুফতী-কাজী আরো অনেকে। সবাই দীনদার, পরহেজগার। সবাই সাচ্চা মুসলমান। জিহাদের জযবায় তারা উদ্বেলিত। শাহাদাতের পিপাসায় তারা কাতর।

হঠাৎ মোঙ্গলদের একটি সৈন্যদল মুসলমানদের হত্যা করতে করতে এ ময়দানে এসে উপস্থিত হলো। সমবেত মুসলমানদের দেখে হত্যার নেশায় তাদের চোখ চক চক করে ওঠলো। সংখ্যা আড়াইশ। দেখতে বেজায় ভয়ংকর। তারা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটে এলো। নিকটে পৌঁছতেই কয়েকজন মুসলমান তাদের আসতে বারণ করলো। কিন্তু নরপশু মোঙ্গল সৈন্যরা কি তা শুনবে? ক্ষেপে এসে তারা সমবেত মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো।

ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় মুসলমানরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চোখের পলকে মোঙ্গল সৈন্যের প্রায় সবাইকে হত্যা করলো। এ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান আহত হলো। শহীদ হলো না কেউ। কয়েকজন মোঙ্গল সৈন্য পালিয়ে গিয়ে অফিসারদের নিকট সবিস্তারে বললো। মোঙ্গলরা যদিও হিংস্র ও রক্তপিপাসু ছিলো,

সাহসী ছিলো কমই। তাই তারা পাল্টা আক্রমণ করতে সাহস করলো না।

মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটি যখন মরণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখন হালাকুখান খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলো। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তো তা ছিলো আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নপুরী। চারদিকে উঁচু উঁচু অট্টালিকা, সবুজে ঘেরা বনকুঞ্জ। এদিকে-সেদিকে চিত্তাকর্ষী ফুলের সমারোহ।

কিন্তু মাত্র তিন দিন পর শহরে প্রবেশ করে মনে হলো যেনো তা এক বিধ্বস্ত নগরী। উঁচু উঁচু প্রাসাদ আর অট্টালিকাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বা আগুনে পুড়ে ভূতের রূপ ধারণ করেছে। থেকে থেকে এখনো আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উড়ছে। চারদিকে ধ্বংসের আলামত। সবুজ বনকুঞ্জ তার সজীবতা হারিয়েছে। গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। গণমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন। হায়! আমার বোকামীতে আজ ইবনে আলকামী এই স্বপ্নের শহরকে ধ্বংস করলো! কিন্তু এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।

রাস্তায় চলতে চলতে খলীফা দেখলেন, এদিকে-সেদিকে মুসলমান নারী-পুরুষ আর শিশুদের লাশ পড়ে আছে। অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন হয়ে পড়লো তার মন। মর্মবেদনায় তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

কয়েকজন অফিসার এসে হালাকুখানকে বললো, কিছু মুসলমান সশস্ত্র অবস্থায় এক ময়দানে সমবেত হয়েছে। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সাথে সাথে হালাকু খানের চেহারা লাল হয়ে ওঠলো। ক্রোধে ক্রোধে যেনো তিনি অধীর। সাথে সাথে তিনি সেদিকে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে তার কয়েক হাজার মোঙ্গল সৈন্য। নাসীরুদ্দীন তুসীও তার সাথে রয়েছে। হালাকুখান সমবেত সেই মুসলমানদের নিকট গিয়ে অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললো, হাতিয়ার ফেলে দাও। অন্যথায় তোমাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।

কয়েকজন মুসলমান চিৎকার করে বললো, আমরা মরতে চাই। আমরা শহীদ হতে চাই। তোমার হুকমিতে আমরা ভীত নই। সাহস থাকলে এগিয়ে এসো।

সমবেত মুসলমানদের বীরত্ব দেখে হালাকুখান বিস্মিত হলো। খলীফাকে বললো, এই লোকদের বলো, তারা যেনো অস্ত্র ফেলে দেয়। আমি তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিলাম।

খলীফা মুসলমানদের হাতিয়ার রেখে দিতে বললে এক আলিমের উচ্চকণ্ঠ ভেসে এলো, এটা আপনার নির্দেশ নয়। এটা কাফেরের বাচ্চা হালাকুখানের নির্দেশ। আমরা কিছুতেই এই নির্দেশ মানবো না।

ইবনে আলকামী খানিক এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা মোঙ্গল সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করে পারবে না। তাই তোমাদের জন্য এটাই মঙ্গলজনক যে, তোমরা তাদের সম্রাটের কথা মেনে নাও।

একজন মুসলমান চিৎকার করে ওঠলো, গাদ্দার-বেঈমান। তারপরই সে তলোয়ার নিয়ে ইবনে আলকামীর দিকে তেড়ে এলো। ইবনে আলকামী চোখের পলকে ছুটে মোঙ্গল সৈন্যদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো।

এক বিজ্ঞ আলেম খলীফাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি ইবনে আলকামীর উপর ভরসা করেছিলেন। অথচ সে মুসলমান ছিলো না। জীবনে কখনো সে নামায পড়েনি। সে মুসলমানদের দুশমন ছিলো। খেলাফতের দুশমন ছিলো। আপনি ছিলেন তার হাতে খেলনার পুতুল। আপনাকে অনেক নাচিয়েছে। অবশেষে সে নরপশু এই হিংস্র মোঙ্গলদের আহ্বান জানিয়েছে।

মোঙ্গলরা বাগদাদ আক্রমণ করেছে। মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে ও করছে। তারা কখনো নামায পড়তো না, কখনো মসজিদে যেতো না, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না, সর্বদা পাপে ডুবে থাকতো, আনন্দ-ফূর্তি আর উল্লাসে মেতে থাকতো। কিন্তু আমরা মুসলমান। কখনো আমাদের নামায কাজা হয়নি। আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। তারই উপর ভরসা করি। জিহাদের চেয়ে পবিত্র ইবাদত এবং শাহাদাতের চেয়ে বড় নেয়ামত আর নেই। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, মরতে হয় তো জিহাদ করে মরবো। কাপুরুষের ন্যায় মরবো না।

আলেমের এই তেজোদীপ্ত বক্তৃতা ভাষান্তর করে হালাকুখানকে শুনানো হলো। হালাকুখান নাসীরুদ্দীন তসীকে বললো, এরা হাতিয়ার ছাড়তে রাজি নয়?

নাসীরুদ্দীন তুসী বললো, এরা মোঙ্গল সৈন্যদের হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছে। এরা আর হত্যাকাণ্ড চায় না।

মুসলমানদের মনোবল দেখে নাসীরুদ্দীন তুসী ভয় পেয়ে গেছে। ভাবছে, বিজয় আবার পরাজয়ে যেনো রূপান্তরিত না হয়। তাই বললো, এরা আরব মুজাহিদ। এদের বীরত্বের কথাই আপনি শুনেছেন। তাই এটাই উত্তম যে, হত্যাকান্ড বন্ধ করে দেয়া হোক।

হালাকুখান 'আরব মুজাহিদ' নামটি শোনামাত্র ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু তা প্রকাশ করলো না।

বরং ঘোষণা করে দিলো, এখন থেকে আর কাউকে হত্যা করা হবে না। কয়েকজন প্রকৃত মুসলমানের কারণে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। রক্তের হোলিখেলা বন্ধ হয়ে গেলো।

বায়ান্ন.

হালাকু খান শাহী প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালো। সাথে রয়েছে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ। ইবনে আলকামী ও খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ প্রাসাদে পৌঁছে দেখলো, চারদিক খা খা করছে, কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। কোথায় সেই রূপসী সুন্দরী চিত্তহারী শাহজাদীরা, যাদের রূপসুধা, লাবণ্যময়তা আর অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের কথা বহু মুখে শুনেছে। কোথায় তারা? নেই নেই নেই। কেউ নেই। যেনো হাওয়ায় মিলে গেছে।

পাশবিক কামনার আগুন জ্বলছিলো হালাকুখানের অন্তরে। কিন্তু তা চরিতার্থ করতে না পেরে সে আগুন দ্বিগুণ হয়ে গেলো। কাঁপতে কাঁপতে খলীফাকে লক্ষ্য করে বললো, শাহী প্রাসাদের সেই রূপসী মনোহরী যুবতীরা কোথায়?

খলীফার কণ্ঠ শান্ত। বললেন, আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমি তো এখানে ছিলাম না। এখান থেকে যাওয়ার সময় তো তারা সবাই প্রাসাদেই ছিলো।

ইবনে আলকামীর অন্তরে দূরভিসন্ধির আনাগোনা শুরু হলো। হালাকুখানের নৈকট্য লাভের আশায় বললো, শাহজাদীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য খলীফা তাদের আগেই সরিয়ে রেখেছে বোধ হয়।

হালাকুখানের মাথাটা দুলে ওঠলো। বললো, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

খলীফা বললেন, ইবনে আলকামী মিথ্যা বলেছে।

হালাকুখান বললো, আমরা তো আপনার মেহমান। আমাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য কয়েকজনকে উপস্থিত করুন।

খলীফা হালাকুখান ও তার সঙ্গী সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে নিয়ে রাজকোষের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। খলীফার মানসিক অবস্থা এতো বিপর্যপ্ত যে, চাবির তোড়া থেকে রাজকোষের চাবিটি চিহ্নিত করতে পারলেন না। ফলে রাজকোষের দরজা ভেঙে ফেলা হলো। রাজকোষে ছিলো দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, দু'হাজার মূল্যবান পোশাক, কিছু মহামূল্যবান অলংকার। খলীফা সেগুলো নজরানারূপ হালাকুখানের হাতে তুলে দিলেন। হালাকুখান সেগুলো নিয়ে অফিসারদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে বললো, তুমি এগুলো আমাদেরকে না দিলেও আমরা তা খুঁজে নিতাম। কিন্তু সেই সব ধন-রত্ন কোথায়, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছো? কালবিলম্ব না করে সব বের করে দাও।

খলীফা বললেন, না, আর কোনো ধন-রত্ন আমার কাছে নেই।

ইবনে আলকামীর অধরে চাপা হাসি। বললো, মিথ্যা বলবে না। সেই কূপগুলোর সন্ধান দাও, যেগুলো রাতের অন্ধকারে তৈরি করে তাতে ধন-রত্ন লুকিয়ে রেখেছো।

খলীফা এবার থ হয়ে গেলেন। তার আর বলবার কিছুই রইলো না। তারই নিমকহারাম উজির আজম সব গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। এখন তো আর অস্বীকার করার জো নেই। খলীফা বাধ্য হয়ে হালাকুখানকে নদীর তীরে নিয়ে গেলেন এবং ঐ ধন-রত্নের সন্ধান দিলেন, যা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যার রহস্য জানার জন্য আহমার বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেছিলো আর খলীফা সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন, কেউ যেনো সে রাতের ঘটনা নিয়ে মাথা না ঘামায়।

খনন করে কূপের মুখ খোলা হলো। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিরাট ও গভীর কূপগুলো স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা আর মহামূল্যবান মণি-মুক্তা-হীরা-জহরতে ঝলমল করছে। বিস্ফারিত নয়নে সবাই দেখলো। হালাকুখানের চেহারায় বিজয়ের আনন্দ-আভা ছড়িয়ে পড়লো। মিষ্টিমধুর হাসির রেখা তার ওষ্ঠাধরে লেপ্টে আছে। নিমকহারাম চাটুকার ইবনে আলকামী বললো, আমি তো এই ধন-রত্ন আপনার হাতে তুলে দেবার জন্যই আপনাকে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হালাকু খান ভ্রু কুঁচকে বললো, নিঃসন্দেহে এ ধন-রত্ন অনেক। তবে আমার বিশ্বাস, আরো ধন-রত্ন আছে। সেগুলো বের করো।

খলীফার কণ্ঠে অসাহয়ত্ব। বললেন, আমি কসম করে বলছি, আমার নিকট আর কোনো ধন-রত্ন নেই।

হালাকুখান বললো, লুকায়িত অবশিষ্ট ধনরত্ন বের করতে আমার সময় লাগবে না। তবে আমি জানতে চাই, এ ধন-রত্ন তুমি কেনো সঞ্চয় করে রেখেছিলে?

খলীফা বললেন, প্রত্যেক বাদশাহরই রাজ কোষাগার থাকে। তারা ধন-রত্ন সঞ্চয় করে। ধন-সম্পদ ছাড়া রাজ্য চলে না। তাই এগুলো সঞ্চয় করেছিলাম।

হালাকুখান বললো, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। ধন-সম্পদ ব্যয়ের এটাই উত্তম পন্থা যে, তা মাটির নীচে পুতে রাখা হবে!

খলীফা বললেন, না এমন নয়; বরং বিপদের সময় কাজে আসবে এই ধারণায় তা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো।

হালাকুখান বললো, কিন্তু বিপদের সময়ের ব্যাখ্যা কী?

খলীফা বললেন, দুশমনের দ্বারা রাজ্য আক্রান্ত হলে যুদ্ধে ব্যয় করতে হবে। অন্যথায় তা নযরানা দিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করতে হবে।

হালাকুখান বললো, আমরা তোমার রাজ্য আক্রমণ করেছি। একের পর এক শহরের পতন ঘটিয়ে বাগদাদে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু তুমি তো আমাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য ভর্তি করোনি! যুদ্ধের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করোনি!

খলীফার শির অবনত। এখন তার বারংবার শাহজাদাদের কথা মনে পড়তে

লাগলো। তারা কতোভাবে ফৌজে সৈন্য ভর্তি করার কথা বলেছিলো। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ক্রয়ের তাগাদা দিচ্ছিলো। কিন্তু জবাবে তাদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো, অর্থ নেই, কোথা থেকে এসবের আয়োজন করবো। শহরে ধ্বংসলীলা নেমে এলে সকল মুসলমান তাতে আক্রান্ত হবে। তাই তারাই চাঁদা তুলে ফৌজে সৈন্য ভর্তি করুক, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করুক। মোকাবেলার জন্য তারাই তৈরি হোক। অতীতের সেই প্রত্যেকটি কথা তার কর্ণকুহরে বেজে উঠতে লাগলো। তারপর আক্ষেপের এক করুণ সুর তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠলো– হায়! কেনো আমি শাহজাদাদের কথা শুনলাম না। যদি তাদের কথামতো ফৌজে সৈন্য ভর্তি করতাম, অস্ত্রের আয়োজন করতাম, তাহলে আজ আমার এই পরিণতি হতো না। সামান্য ধন-রত্ন ব্যয় করলেই তা সম্ভব হতো। হায়! আজ আমার সব গেলো। কষ্টের সঞ্চিত সকল ধন-রত্ন হাতছাড়া হয়ে গেলো। চোখের সামনে পুত্র আবুবকরকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। অন্যান্য শাহজাদা-শাহজাদীরা ও শাহী মহলের নারী-পুরুষরা কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। হায় আমার কপাল! হায়, আমার নির্বুদ্ধিতা।

হালাকুখানের কণ্ঠে খলীফা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, বলো, দেরি করছো কেনো? এতো ধন-রত্ন থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে কেনো যুদ্ধের কোনো আয়োজন করোনি?

খলীফা বললেন, ইবনে আলকামী আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। লোকটা আমাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

হালাকুখান বললো, আসলে তুমি রাজ্য পরিচালনার যোগ্য নও। তুমি ইবনে আলকামীকে চিনতে পারোনি। কেনো তুমি তার কথা মতো চললে? কেনো তুমি নিজের বুদ্ধি একটুও ব্যয় করলে না?

খলীফা নীরব। কোনো কথা নেই তার কণ্ঠে। মাঝে মাঝে হৃদয় চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

হালাকু খান বললো, এখন থেকে তুমি আমাদের হাতে বন্দি।

খলীফাকে বন্দি করে তার খানাপিনা বন্ধ করে দেয়া হলো। দুঃসহ এক চিন্তার পাহাড় খলীফার মাথায় এসে ভিড় করলো। দুঃখ-বেদনা, বিষন্নতা আর আক্ষেপ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনস্তাপের তীব্রতায় মাঝে-মধ্যেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলছেন। প্রলাপ বকছেন।

কিন্তু জঠরজ্বালা সে এক অসম্ভব জ্বালা। সকল জ্বালার উপর এ জ্বালাই প্রবল হয়ে উঠে যদি কয়েক বেলা পেটে দানাপনি না পড়ে। খলীফার অবস্থাও তা-ই

হলো। কয়েক বেলা ক্ষুধার্ত থাকার পর অস্থির- বেচাইন হয়ে পড়লেন। হালাকু খানকে ক্ষুধার কথা জানালেন।

শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় হালাকু খানের কণ্ঠ। বললো, আচ্ছা, আমি এখনই তোমার আহারের ব্যবস্থা করছি। তারপর একটি তশতরিতে করে কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও মুক্তা-মাণিক্য রেখে বললো, নাও, এগুলো থেকে যতোটুকু পারো মনভরে খেয়ে নাও।

খলীফা তশতরির দিকে তাকিয়ে বললেন, এগুলো তো খাওয়া যায় না।

হালাকুখান বললো, যদি এগুলো খাওয়াই না যায়, তাহলে এতো কষ্ট-ক্লেশ করে সঞ্চয় করেছিলে কেনো?

খলীফা নীরব। কোনো উত্তর দিলেন না। হালাকুখান বললো, অভিশাপ তোমার উপর- গোটা জাতির অভিশাপ। যে ধন-রত্ন তুমি সঞ্চয় করেছিলে, আজ তা তোমার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারছে না। যদি তুমি এ সম্পদ প্রজাদের রক্ষার জন্য, খেলাফত রক্ষার জন্য ব্যয় করতে, তাহলে তোমার রাজত্ব শেষ হতো না। এই স্বপ্নময় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো না। তুমিও আমার হাতে বন্দি হতে না। তুমি বেকুব, নির্বোধ। তুমি লোভী, নিচু। এ ধরনের মানুষ দুনিয়াতে জীবিত থাকার কোনো অধিকার রাখে না।

হালাকুখান তার সামরিক অফিসারদের সাথে পরামর্শ করলো, খলীফাকে কী শাস্তি দেয়া যায়। সবার একমত, একে হত্যা করা হোক।

খলীফা তাদের সিদ্ধান্ত শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তার ওষ্ঠাধর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।

ইবনে আলকামী বললো, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, সে কিন্তু আব্বাসী খলীফা। সুতরাং তার রক্ত যেনো মাটিতে না পড়ে।

ইবনে আলকামী তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করে কথাটি বললেও সূর্যপূজারী হালাকুখান তা না বুঝে ভড়কে গেলো। বললো, আচ্ছা, তাহলে তাকে কীভাবে হত্যা করতে হবে?

ইবনে আলকামী একটু থমকে গেলো। পরে বললো, তাকে একটি পশমী বস্তায় ঢুকিয়ে পদাঘাত করে করে পিষে মারতে হবে।

হালাকুখান বললো, বেশ, তা-ই করা হোক। সে তো তোমাদেরই খলীফা। তোমাদেরই মহারাজা। তার জীবনের শেষ পর্বের এই খেদমতটুকু তোমাকেই অর্পণ করলাম। তুমি তা সুষ্ঠুভাবে পালন করো।

হালাকুখান সেখান থেকে প্রস্থান করলো। ইবনে আলকামী খলীফাকে বললো, আজ আমি তোমার থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। তুমি আমাকে অপমান করেছিলে। সে অপমানের শাস্তি তোমাকে এখনই ভোগ করতে হবে।

খলীফা বললেন, তুই নিমকহারাম। গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক। তুই-ই এই প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছিস্। বাগদাদ শহর ও তার অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিস্। হাজার হাজার নিষ্পাপ মানুষকে নির্মম হত্যার পথ সুগম করেছিস্। সত্যই আমি নির্বোধ ছিলাম। তোর মতো গাদ্দারকে চিনতে পারিনি। তোর কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছি। তবে শুনে রাখ, আমি আব্বাসী। আমার অভিশাপ কখনো ব্যর্থ হয় না। আমার পর তোর শাস্তি হবে আরো নির্মম, আরো বেদনাদায়ক।

ইবনে আলকামীর মুখে তখন পিশাচের অট্টহাসি। বললো, তোর মতো নির্বোধের দু'আ কখনো কবুল হবে না। সে ভয় আমাকে না দেখানোই ভালো।

ইবনে আলকামী আর দেরি করলো না। তার চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে একটা হিংস্রতা তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠলো। যেনো সে বনের নেকড়ে বা তারচে' হিংস্র কোনো পশু। দুর্বল শক্তিহীন হৃদয়মরা খলীফার কণ্ঠ থেকে আর্তচিৎকার পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তার কণ্ঠ থেকে মরণ-গোঙ্গানি বের হচ্ছিলো। তারপর বস্তাটা একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে তাতে পদাঘাত শুরু করলো। ভীষণ ও বিরামহীন পদাঘাত। আঘাতে আঘাতে থেতলে গেলো খলীফার আয়েশী শরীর। উড়ে গেলো তার প্রাণবায়ু। তারপর তার লাশকে পদদলিত করে করে আরো থেতলে দিলো।

আব্বাসী খেলাফতের সেই ইতিহাস, সেই ঐতিহ্য আর সেই গৌরবের রবি পৃথিরীর বুকে আলো বিকিরণ করতে করতে আজ অত্যন্ত নির্মমভাবে নিভে গেলো। ইতিহাস তার একটি পর্বের ইতি টানলো। আর মানুষের জন্য রেখে গেলো হাজারো উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও বাণীসম্ভার।

তেপ্পান্ন.

বাগদাদ নগরীতে প্রবেশের পর থেকে ইবনে আলকামী সর্বক্ষণ অনুগত দাসের মতো- বরং পালিত কুকুরের মতো লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে হালাকুখানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। মুহূর্তের জন্যও নিজ প্রাসাদে যেতে সময় পায়নি সে। স্ত্রী-পরিজন এমনকি প্রাণপ্রিয় কন্যা হাজেরারও কোনো সংবাদ নিতে পারেনি। তাই মনটা তার অস্থির-বেকারার। কিন্তু সে এই মুহূর্তে যেতে পারছে না। তার হাতে অনেক কাজ। আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেছে। বাগদাদের জনগণও প্রায় শেষ। তারা মোঙ্গল সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। ইবনে আলকামী তাতে আনন্দিত, উল্লসিত। বাগদাদের লোকেরাই তার বিরোধিতা করেছিলো। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। এমনকি শিয়ারা পর্যন্ত তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। তাই তারা শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু এখন তাকে বাগদাদের রাজা

হতে হবে। এর একটা বিহিত না করে সে কোথাও যেতে পারছে না। এ চিন্তা-ই তার মাথায় সারাক্ষণ ভন ভন করে ঘুরছে।

ইবনে আলকামী হালাকুখানের উজীরে আযম নাসীরুদ্দীন তুসীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলো। তার মনের কথা ব্যক্ত করলো। নাসীরুদ্দীন তুসী অত্যন্ত ধুরন্ধর। সে ইবনে আলকামীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো বলেছিলে, বাগদাদে আলী (রা.)-এর বংশের খেলাফত কায়েম করবে। কিন্তু তারা কোথায়? মনে হচ্ছে তুমিই খেলাফতের বাগডোর আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছো।

ইবনে আলকামীর কণ্ঠে জড়তা। আম্‌তা আম্‌তা করে বললো, না, না, বলছিলাম কি, আপাতত আমিই শাসনটা চালিয়ে যাই, পরে আলী (রা.)-এর বংশের যোগ্য কাউকে তা হস্তান্তর করবো।

নাসীরুদ্দীন তুসী শির দুলিয়ে বললো, বেশ, আমি চেষ্টা করে দেখবো।

ইবনে আলকামী প্রস্থান করলো। এদিকে নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট ইবনে আলকামীর ভণ্ডামী, নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা ও নিচুতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো অনেক আগেই। সবশেষে যখন দেখলো, ইবনে আলকামী আলী (রা.)-এর বংশের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে, তখন সে তার প্রতি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু মনের আগুন মনেই চাপা দিয়ে রাখলো। ইবনে আলকামীকে কিছুই বুঝতে দিলো না।

ইবনে আলকামী হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদের দিকে রওনা দিলো। ধ্বংসস্তূপের মাঝদিয়ে যাচ্ছে সে। এখানে-সেখানে মানুষের বিকৃত বীভৎস লাশ পড়ে আছে। রাস্তার উপরে জমে থাকা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় থেকে থেকে এখনো আগুন জ্বলছে। পথ-ঘাটে কোনো মানুষ নেই। এ এক মৃত্যুপুরী।

ইবনে আলকামী প্রাসাদে গিয়ে দেখলো, তার প্রাসাদও এ ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়নি। প্রাসাদের অধিকাংশই আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো, প্রাসাদের এখানে-সেখানে সেবক-সেবিকা আর পরিচারিকাদের লাশ পড়ে আছে। গোটা প্রাসাদের উপর দিয়ে লুটতরাজের এক ভয়াবহ তাণ্ডব বয়ে গেছে। প্রাসাদের কোনো একটি স্থানও অরক্ষিত নেই। হাজেরা! হাজেরা! বলে চিৎকার করতে করতে পুরো প্রাসাদটি ঘুরে এলো। কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। তার চিৎকারের প্রতিধ্বনি যেনো তাকে বারংবার ব্যঙ্গ করছে, তিরস্কার করছে। ইবনে আলকামী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

আজ কয়েকদিন যাবত ইবনে আলকামী কতো শত বিকৃত বীভৎস লাশ দেখেছে। নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের বিলাপ করে কাঁদতে দেখেছে। দাউ দাউ

আগুনে স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরীকে ধ্বংস হতে দেখেছে। রূপসী যুবতীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হতে দেখেছে। দেখেছে তাদের কৌমার্য লুটে-পুটে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করতে। কিন্তু এসব কিছুতে তার বোধোদয় ঘটেনি। বরং আনন্দিতই হয়েছে। কিন্তু এখন নিজের বিধ্বস্ত প্রাসাদ দেখে ও কন্যা হাজেরাকে খুঁজে না পেয়ে সে যেনো পাগল হয়ে গেলো। প্রলাপ বকতে লাগলো, হায়! আমার মজলুম কন্যা তোমার কী ঘটেছে তা আমি জানি না। হায়! তুমি কতোবার না আমাকে বলেছিলে, আমি যেনো তাতারীদের আক্রমণের আহ্বান না জানাই। কতোবার তুমি আমাকে বারণ করেছিলে। কিন্তু আমি তখন তা বুঝিনি। আমার চোখে ছিলো ক্ষমতা দখলের আগুন। হৃদয়ে ছিলো লালসার তরঙ্গ। হায়, যদি আমি তোমার কথা মেনে নিতাম, তাহলে বাগদাদ ধ্বংস হতো না! আমারও কোনো ক্ষতি হতো না। হায়! তুমি বলেছিলে, একবার যদি মোঙ্গলরা বাগদাদে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে আর তাদের বের করা যাবে না। তুমি সত্যই বলেছিলে। কিন্তু এখন আমার আর সেই ক্ষমতা নেই। হায়! এখন আমি কী করি। কী করি! অত:পর সম্বিৎ হারিয়ে ধপাস্ কর মাটিতে পড়ে গেলো।

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। সূর্যের আলোকরশ্মি তার যৌবন হারিয়ে দুর্বল-ফিকে হয়ে গেছে। বিদায়ের হাতছানি দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে।

রাতের এক প্রহর চলে যাওয়ার পর ইবনে আলকামী সম্বিৎ ফিরে পেলো। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার আঁতে যেনো আগুন জ্বলছে। কোথায় খাবার? কোথায় কী আছে সে কিছুই বলতে পারে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অনেকক্ষণ তালাশ করলো। কিছুই পেলো না। তার মনে পড়লো, খলীফার মতো সেও বহু ধন-সম্পদ প্রাসাদে লুকিয়ে রেখেছে। অনেক হিরা-জহরত, মণি-মুক্তা সঞ্চিত আছে তার গোপন স্থানে। এখনই তো তা বের করে আনতে পারে। কিন্তু তাতে তো আর তার ক্ষুধা দূর হবে না। পরিশেষে একটি সোফায় শুয়ে অনাহারেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু সারারাত তার ঘুম এলো না। বারংবার মনে হতে লাগলো, হায়! খলীফার পরিণতি কি আমার দিকেও ধেয়ে আসছে? ভাগ্যের লিপি কি আমাকে অনাহারে থাকার ফয়সালা করেছে? নানা দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নে বারংবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। শেষ রাতে ক্লান্ত অবসন্ন দু'চোখের পাতা দু'টি একটু বুজে এলো।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য উদিত হয়েছে। ভোরের আলোয় চারদিক ফকফক করছে। ইবনে আলকামী এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ দু'জন মোঙ্গল সৈন্যের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেলো। তারা চিৎকার করে কর্কষ কণ্ঠে বলছে, ইবনে আলকামী! হালাক খান তোমায় ডাকছেন, এক্ষুনি আমাদের সাথে যেতে হবে।

হালাকুখানের নাম শুনে তার অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। ভোরের আলোতে যেনো তার হৃদয় কন্দর আলোকিত হয়ে ওঠলো। ভাবলো, এই তো কিছুক্ষণ পরই আমি ইরাকের রাজা হয়ে যাবো। কালবিলম্ব না করে ইবনে আলকামী সৈন্য দু'জনের সাথে ছুটে বেরিয়ে এলো। হালাকুখানের দরবারে এসে উপস্থিত হলো। হালাকুখানের পাশে তখন নাসীরুদ্দীন তুসী ও মোঙ্গল বাহিনীর অফিসাররা উপবিষ্ট। হালাকুখান তাকে বসতে ইঙ্গিত করলো। সে বসে পড়লো। হালাকুখান বললো, তুমি এখন নিজেকে কি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য মনে করো?

ইবনে আলকামীর কণ্ঠ একেবারে বিনয়-বিগলিত। বললো, সারেতাজ, মুয়ায্যাম সরদার! আমি আপনাকে লিখে জানিয়েছিলাম, বাগদাদের অশেষ ধন-রত্ন আর রূপসী-সুন্দরী যুবতীরা আপনার অপেক্ষায় আছে। আপনি আসুন। সবকিছু আপনি পাবেন। আপনি এসে সবকিছুই পেয়েছেন। এখন আমারও অন্তরের একটি তামান্না আছে। আমি তা সম্মানিত উজীরে আযম নাসীরুদ্দীন তুসীর নিকট পেশ করেছি। আশা করি, আমার সে তামান্না পূরণ হবে।

হালাকুখানের কণ্ঠে অট্টহাসি। বললো, ইরাকের শাসনক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেবো এই তো?

ইবনে আলকামীর কণ্ঠ যেনো বিনয়ে গলে গলে পড়লো- জ্বি হুজুর জাঁহাপনা, এটাই আমার জীবনের তামান্না।

হঠাৎ হালাকুখানের চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরিয়ে এলো। কণ্ঠে অস্বাভাবিক ওজন। বললো, কী বললি হারামজাদা, গাদ্দার, নিকমহারাম-বেঈমান! খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তোর সাথে কী খারাপ আচরণটা করেছিলো? লোকটা ধূলি থেকে এনে তোকে উজীরে আযম বানিয়েছিলো। খেলাফতের সকল দায়িত্ব তোকে দিয়েছিলো। ক্ষমতা-সম্পদ আর ইজ্জত কোনোটারই তোর অভাব ছিলো না। কিন্তু গাদ্দারী করে আব্বাসী খেলাফতকে শেষ করেছিস্। ইরাক ও বাগদাদকে ধ্বংস করিয়েছিস্। খলীফার লুকায়িত সম্পদের সন্ধান দিয়েছিস্। সবশেষে তোর প্রতি যার ইহসান ও অনুগ্রহের শেষ ছিলো না, তাকে নিজে পদদলিত করে হত্যা করেছিস্। সুতরাং তোর মতো বেঈমান, অকৃতজ্ঞ ও গাদ্দার কীভাবে ভাবলো তোকে আমি এতো বিশাল পুরস্কার দেবো!

ইবনে আলকামী অত্যন্ত বিনয়-নম্রভাবে তার তামান্না পূরণ হওয়ার আবেদন করলো। তখন হালাকুখান তাকে কুকুরের মত শাসিয়ে বললো, নিশ্চয় তুই এই গাদ্দারী, এই বেঈমানী, এই নিমকহারামী এ জন্য করেছিস্ যে,

তোর নিকটও খলীফার মতো প্রচুর সঞ্চিত ধন-রত্ন আছে। অত্যধিক ধন-সম্পদের তাপেই তুই রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিস্। দেরি না করে তোর সেই সঞ্চিত লুকায়িত সম্পদ বের করে আন।

ইবনে আলকামীর মাথায় যেনো বাজ পড়লো। সে অনেক কান্নাকাটি করলো। অনেক তোষামোদ করলো। কিন্তু হালাকুখান একটুও নরম হলো না। বরং প্রবল চাপ দিয়ে তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ আদায় করে নিলো। সঞ্চিত লুকায়িত ধন-রত্ন হারিয়ে ইবনে আলকামী মৃতপ্রায় হয়ে গেলো।

এবার হালাকুখান তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোর সেই বিখ্যাত রূপসী সুন্দরী তন্বী মেয়েটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্?

ইবনে আলকামী হাজেরার কোনো সংবাদ জানতো না। তাই তার সন্ধান দিতে পারলো না। হালাকুখানও সৈন্য পাঠিয়ে তার অনুসন্ধান করলো। কিন্তু পেলো না। অবশেষে ইবনে আলকামীকে ছেড়ে দিলো।

ইবনে আলকামীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যে ধন-সম্পদের উপর তার ভরসা ছিলো, যে ধন-সম্পদের উত্তাপে গোটা ইরাককে ধ্বংস করে দিলো, এক কোটি ষাট লাখ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হলো; সেই সম্পদ, সে-ই ধন-রত্ন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। এই শোক, এই বঞ্চনা সে সহ্য করতে পারলো না। নিজ প্রাসাদে পৌঁছেই ধপাস্ করে সোফায় পড়ে গেলো। ভাগ্যের নির্মম শাস্তি তার দিকে এগিয়ে এলো। হাজারো পরিচারিকা পরিবেষ্টিত ইবনে আলকামী একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সোফায় পড়ে গোঙ্গাতে লাগলো। কেউ তার সেবা করার নেই। তার মুখে এক ফোঁটা পানি দেয়ার কেউ নেই। কেউ তাকে সান্ত্বনা দেয়ার নেই। পিপাসায় তার ছাতি ফাটার উপক্রম, কিন্তু পানি দেয়ার কেউ নেই। নিজেরও নড়াচড়ার শক্তি নেই। ফলে পিপাসায় ছটফট করতে করতে গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে মৃত্যুবরণ করলো। কুদরত তার নিকমহারামী, গাদ্দারী বেঈমানীর বিনিময়ে এই উপহার দিলো।

চুয়ান্ন.

আহমদ ও আহমারের নেতৃত্বে শাহী কাফেলাটি নির্জন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। আহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বিজন মরুর বুক চিরে, পাহাড়ের পাদদেশের লতাগুল্ম মাড়িয়ে, গিরিপথ অতিক্রম করে। কাফেলার সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ইতিমধ্যে কাফেলার সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তাদের আসল পরিচয় কারো কাছে প্রকাশ করবে না আর ইরাকের কোথাও দাঁড়াবে না। কারণ, তারা আশংকা

করছে, যদি মোঙ্গল হানাদারদের সঙ্গে সন্ধি না হয় আর না হওয়াটাই স্বাভাবিক; তাহলে তারা অত্যন্ত দ্রুত গোটা ইরাক দখল করে নেবে। শুধু তা-ই নয়, ইরাকের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও তারা আক্রমণ করবে এবং তাতেও ধ্বংসলীলা চালাবে। তাই তারা ইরাক ছেড়ে সোজা সিরিয়া গিয়ে পৌঁছলো।

সিরিয়া পৌছে তারা সেখানে বেশীদিন অবস্থান করলো না। সেখান থেকে আবার মিসরের পথে রওনা হলো। চলতে চলতে তারা মিসর ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় এক সবুজ-শ্যামল ছায়াঢাকা-পাখিডাকা পল্লীতে উপস্থিত হলো। পল্লীটি দারুণ চমৎকার। দূর পাহাড় থেকে ঝরনাধারা কল কল রবে পল্লীর পাশ দিয়ে দূর দেশে চলে গেছে। ফুল-ফল আর নৈসর্গিক অপার দানে বেশ সমৃদ্ধ। চারদিকে সবুজের সমারোহ, সুখ-শান্তি আর উল্লাসের আয়োজন। কাফেলাটি এই পল্লীতেই এসে যাত্রা বিরতি করলো। এখানেই তারা বসবাস শুরু করলো।

পল্লীতে তাদের জীবনযাত্রা ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছে। পল্লীর লোকেরা তাদের পেয়ে দারুণ আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই পল্লীবাসীদের সাথে তাদের উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠলো। পল্লীর পুরুষেরা এসে তাদের সাথে আন্তরিক খোশগল্প করতে লাগলো। আর নারীরা এসে নাজমা ও অন্যান্য শাহজাদীদের সাথে গল্পগুজব করতো।

পল্লীতে অবস্থান করার পর থেকে তাদের কেউ কারো নিকট বলেনি যে, তারা আব্বাসী খলীফার খান্দানের লোক, ইরাক থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু না বললেও পল্লীর লোকেরা চলাফেরা, কথাবার্তা ও রূপ-লাবণ্যে বিস্মিত হয়ে অনুমান করে, নিশ্চয় এরা শাহী খান্দানের লোক। নারীদের মাঝে এ আলোচনার যেনো শেষ নেই। নাজমা, হাজেরা ও অন্যান্য শাহজাদীদের রূপ-লাবণ্য আর সৌন্দর্যে পল্লীর নারীরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তাই নারীমহলে ঘরে ঘরে কানাঘুষা শুরু হলো, নিশ্চয় এরা আব্বাসী খলীফার বংশের লোক হবে। বনু হাশেমের নারী-পুরুষরাই এমন রূপ-লাবণ্য আর দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী হয়।

অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে নির্বিঘ্নে তারা ছয় মাস এই পল্লীতে বসবাস করলো। ইতিমধ্যে তারা বাগদাদের সকল সংবাদই পেয়েছে। জানতে পেরেছে, মোঙ্গলরা বাগদাদ শহর ধ্বংস করে দিয়েছে। খলীফা ও আবুবকরকে শহীদ করাসহ অনেক হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে তারা দারুণ ব্যথিত-মর্মাহত হলেও ধৈর্যহারা হয়নি, কান্নাকাটি করেনি। ফলে কেউ বুঝতে পারেনি, তাদের বংশের উপর দিয়ে কী ধ্বংসলীলা বয়ে গেছে, কী কেয়ামত ঘটে গেছে। ফলে কেউ নিশ্চিত হয়নি, এরা আব্বাসী খলীফার বংশের লোক। এরা বাগদাদ থেকে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছে।

এরপর আরো কিছু দিন কেটে গেলো। ইতিমধ্যে সংবাদ এলো, মোঙ্গলরা ফোরাত অতিক্রম করে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। শহরের পর শহর ধ্বংস করে এগিয়ে আসছে। এবার তারা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো। ভাবছে, এখন কি তারা মিসরে চলে যাবে, না এখানেই থাকবে! সিরিয়া থেকে লোকেরা দলে দলে পালিয়ে মিসরের দিকে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী এই পল্লী অতিক্রম করে তারা মিসরে যাচ্ছে। যারা এই পল্লীতে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করছে, তাদের থেকে আহমদ ও আহমার মোঙ্গলদের অনেক খবর সংগ্রহ করছে। মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তাদের হৃদয় কেঁদে কেঁদে আকুল। কিন্তু তাদের যে কিছুই করার নেই। সিরিয়া থেকে যারা মিসরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের কেউ কেউ সীমান্তবর্তী এই নির্জন পল্লীতে সাধারণ কৃষক-মজুরদের সাথে শাহজাদা আহমদ, আহমার ও অন্যান্যদের দেখে দারুণ বিস্মিত হলো। তাদের কেউ কেউ শাহজাদাদের সাথে এই পল্লীতেই রয়ে গেলো। আবার কেউ আরো অগ্রসর হয়ে মিসরে চলে গেলো।

মোঙ্গলরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী ও রক্তপিপাসু হয়ে ওঠেছে। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ও মানবতাবোধ বলতে কোনো কিছুই তাদের মাঝে নেই। বনের হিংস্র পশুর চেয়ে তারা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। একের পর এক শহর, নগর ও পল্লী আক্রমণ করছে। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। লুটপাট করে ধন-রত্ন ছিনিয়ে নিচ্ছে। সুন্দরী যুবতীদের টেনে বাইরে এনে প্রকাশ্যে কৌমার্য লুটে-পুটে রক্তাক্ত করছে। তারপর হত্যা করে শহীদ করছে। সবশেষে ঘর-বাড়ি আর অট্টালিকাগুলোতে আগুন দিচ্ছে। শহরের পর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এগিয়ে যাচ্ছে। আলেপ্পো শহর আক্রমণ করে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। দশ হাজার বালক-বালিকাকে বন্দি করে গোলাম-বাদী বানিয়ে বিক্রি করে দিলো।

মোঙ্গল সৈন্যরা এক কোটি ষাট লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। শহরের পর শহর, নগরের পর নগরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। যেসব ক্ষেত-খামারে মুসলমানরা চাষাবাদ করে সোনা ফলাতো, তা পতিত জমিনের ন্যায় পড়ে রইলো। শিল্প-কারখানাগুলো ধ্বংস হয়ে গেলো। শিল্পী, কারিগর ও মালিকদের হত্যা করা হলো। এভাবে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল, বহু নগর-বন্দর ধ্বংস হয়ে গেলো, লোকশূন্য হয়ে গেলো। ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলমানরা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলো।

অবশেষে তাদের বোধোদয় হলো, হেদায়াতের জ্যোতিতে তাদের হৃদয় আলোকিত হয়ে ওঠতে লাগলো। তারা আল্লাহর সামনে অবনত হলো। ইবাদত শুরু করলো। আল্লাহর জিকিরে তাদের জিহ্বা আবার সজীব হয়ে ওঠলো।

নামাযীশূন্য বিরান মসজিদগুলো আবার মুসল্লীতে ভরে গেলো। জুমা আর পাঞ্জেগানা জামাতে নামাযীর সংখ্যায় কোনো ব্যবধান দেখা গেলো না। মসজিদে মসজিদে নামাযের পর মুসলমানরা দোয়া-দরূদ পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে তওবা ও সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলো। বেপর্দা নারীরা পর্দানশীল হয়ে গেলো। গান-বাদ্য, মদ-জুয়া ইত্যাদি পাপ কাজ বন্ধ হয়ে গেলো।

দয়াময় আল্লাহ। রহমান-রহীম আল্লাহ। তিনি চান না, ধরাপৃষ্ঠ থেকে প্রিয় হাবীবের উম্মতরা নিঃশেষ হয়ে যাক। বরং পথহারা মুসলমানদের ফিরিয়ে হেদায়াতের পথে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই দুনিয়ার এক ঝাপ্টা শাস্তি আস্বাদন করিয়ে তিনি মুসলমানদের সচেতন করতে চাইলেন, ভ্রান্তপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তাই মুসলমানরা আল্লাহমুখী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন। ফলে মোঙ্গলদের বিজয়ের পথ চিররুদ্ধ হয়ে পরাজয়ের পালা শুরু হলো। গোটা মুসলিম বিশ্বে আবার স্বস্তির হাওয়া বইতে লাগলো।

মোঙ্গলদের ইচ্ছা হলো, তারা ফিলিস্তীন ধ্বংস করে মিসর আক্রমণ করবে। তখন মিসরে আইউবী দাসদের রাজত্ব। মালিক মুযাফফর পশ্চিম মিসরের শাসক। তাই মিসর আক্রান্ত হলে সর্বপ্রথম তার শাসিত অঞ্চলই আক্রান্ত হবে। তাই মালিক মুজাফফর রক্তপিপাসু বর্বর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। তার নিকট বারো হাজার দাস ও বারো হাজার মিসরী সৈন্য ছিলো। তিনি এই চব্বিশ হাজার সৈন্যকে ইসলামী বিশ্বের মহান বীর যোদ্ধা ও মুজাহিদ রুকনুদ্দীন বাইবার্সের সহায়তার জন্য মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মিসর থেকে চব্বিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য মার্চ করে ফিলিস্তীনের দিকে এগিয়ে চললো।

দুরন্ত মরু বাতাসের সাথে সাথে এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক ছড়িয়ে পড়া মুসলিম বীর যোদ্ধারা আবার সংগঠিত হতে লাগলো। দলে দলে এসে এ বাহিনীতে যোগ দিতে লাগলো। ইরাক ও সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানরাও এসে যোগ দিতে লাগলো। ফলে এ বাহিনীর সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারে পরিণত হলো। আহমদ, আহমারও এ বাহিনীতে এসে যোগ দিলো।

বীর মুজাহিদ রুকনুদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে এলো। নাহবে জালুত নামক স্থানে তারা তাতারীদের মুখোমুখি হলো। ক্লান্ত সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ডুবি ডুবি করছে। তাই সেদিন আর যুদ্ধ হলো না। দাস সৈন্যরা অত্যন্ত ইবাদতগুজার। সাধারণ মুসলমানরাও নামায-রোযায় একনিষ্ঠ। রাতের অন্ধকার নেমে এলে মুজাহিদ বাহিনীর তাঁবুতে তাঁবুতে নামায, যিকির আর কুরআন তেলাওয়াতের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো। রাতে ঘুমোতে কিছুটা দেরি হলেও সকাল সকাল তারা ঘুম থেকে ওঠে পড়লো। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে অযু করে

তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলো। তারপর একা একা বিনয় বিগলিত কণ্ঠে আল্লাহর নিকট দু'আ করলো। অনেকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে সাহায্যের আবেদন করলো। সবাই জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করার পর মুজাহিদে আজম মহান সিপাহসালার রুকনুদ্দীন বাইবার্স দু'আ করলেন–

"হে আল্লাহ! হে আমাদের মাওলা! হে পরওয়ারদেগারে আলম! তাতারীরা, হিংস্র মোঙ্গল সৈন্যরা আপনার বান্দাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করছে। ইসলামের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধূলির ধরা থেকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে। ইসলামের আলোক শিখাকে নির্বাপিত করতে চাচ্ছে। নিষ্পাপ মাসুম শিশুদের তরবারীর আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। হে আল্লাহ! সূর্যপূজারী এই কাফেররা আপনার ইবাদতগুজার বান্দাদের ধ্বংস করছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুটে নিচ্ছে। তারা ঘোষণা করছে, মুসলমানদের কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ নামে কোনো স্রষ্টা নেই। হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দারা আপনার রহমতের ভরসায় জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের সাহায্য করুন। মদদ করুন।"

চারদিকে কান্নার রোল পড়ে গেলো। কেঁদে কেঁদে তারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলো। তারপর মুজাহিদরা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তাঁবুতে ফিরে গেলো।

ইতিমধ্যে মোঙ্গল যোদ্ধারাও সশস্ত্র অবস্থায় রণক্ষেত্রে সমবেত হতে শুরু করেছে। পূর্বাকাশে যেই না সূর্য উঁকি দিলো, অমনি মোঙ্গল যোদ্ধারা সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। সূর্যপূজা শেষ হলে তারা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো।

মুসলিম মুজাহিদরাও এসে রণক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। অহংকারী মোঙ্গল সৈন্যদের গর্বের যেনো শেষ নেই। তুচ্ছতায় ভরা কণ্ঠে তারা মুসলমানদের আক্রমণের আহ্বান জানালো। ভাবখানা এমন, একবার এসে স্বাদ নিয়ে যা মোঙ্গলদের তরবারীর আঘাত কতো মধুর। সিপাহসালার রুকনুদ্দীনের ইশারায় মুজাহিদরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো। একেবারে মুখোমুখি হলে মোঙ্গলরা তরবারী কোষমুক্ত করে আক্রমণ করবে করবে অবস্থা, ঠিক তখন সিপাহসালারের কণ্ঠে ভীষণ গর্জন উত্থিত হলো, 'আল্লাহু আকবার'। সাথে সাথে অযুত কণ্ঠে বিঘোষিত হলো 'আল্লাহু আকবার'। কেঁপে ওঠলো আকাশ-বাতাস। কেঁপে ওঠলো মরু-প্রান্তর। কেঁপে ওঠলো মোঙ্গল সৈন্যদের পাষাণ অন্তর। সাথে সাথে ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় মুজাহিদরা ঝাঁপিয়ে পড়লো মোঙ্গল বাহিনীর ওপর। আক্রমণের তীব্রতায় মোঙ্গল সৈন্যরা কয়েক পা পেছনে সরে গেলো। কিন্তু দেখতে না দেখতে প্রথম সারির মোঙ্গল সৈন্যরা কুপোকাত হয়ে গেলো। মোঙ্গল সৈন্যরা কখনো মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড মোকাবেলার সম্মুখীন হয়নি। তাই তারা দারুণ

গর্বিত। যেনো বিজয় তাদের অনিবার্য। তাই তারা পাল্টা আক্রমণ করে বেশকিছু মুসলমানকে আহত করলো। আহত মুজাহিদরা এবার যেনো সাক্ষাৎ আহত সিংহ। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে মোঙ্গল সৈন্যদের হত্যা করতে লাগলো। মোঙ্গল সৈন্যরাও প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। মরণ আর মারণখেলায় তারা দিশেহারা। আহত-নিহত সৈন্যের রক্তে রক্তনদী বইতে লাগলো। মোঙ্গল সৈন্যরা ব্যূহ ভেদ করে নিজ সৈন্যদের মাঝে ঢুকে পড়লো আর মুসলমান সৈন্যরাও মোঙ্গলদের মাঝে ঢুকে পড়লো। স্থানে স্থানে মানুষের লাশ ও কর্তিত অঙ্গ। মোঙ্গলদের চিৎকার আর মুসলমানদের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে রণক্ষেত্র বারংবার প্রকম্পিত হয়ে ওঠতে লাগলো। সে এক ভয়ংকর, এক ভয়াবহ দৃশ্য।

মুজাহিদ বাহিনীর ডানপার্শ্বে আহমদ ও আহমার। তারা অফিসার। তারা অধীন সৈন্যদের নিয়ে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তারা মোঙ্গল সৈন্যদের কচুকাটা করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলো। স্বয়ং আহমদ ও আহমারের হাতে বহু সৈন্য ও অফিসার নিহত হলো।

এদিকে বাম পাশের মুজাহিদরাও প্রচণ্ড আক্রমণ করে মোঙ্গলদের দিশেহারা করে ফেলছে। একজন মুসলমান শহীদ হলে দশজন মোঙ্গল সৈন্য ধরাশায়ী হচ্ছে। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম হলেও তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, হয় শহীদ না হয় গাজী। এর অন্যথা তারা চিন্তাই করতে পারে না। তাই তারা যেনো আজ ঐশ্বরিক শক্তিতে লড়াই করছে। ভয় নেই, ভাবনা নেই। সাহসে টইটম্বুর তাদের অন্তর। ডান ও বামদিকের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে মোঙ্গল সৈন্যরা মাঝে এসে সমবেত হলো। অমনি সিপাহসালার রুকনুদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে একদল দুর্ধর্ষ মুজাহিদ সম্মুখ দিকে তাদের উপর আক্রমণ করলো। ডান-বাম ও সম্মুখ তিন দিক থেকেই মোঙ্গল সৈন্যরা আক্রান্ত হচ্ছে। একের পর এক লুটিয়ে পড়ছে।

সূর্য মধ্যাকাশে উঠে এসেছে। কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা এখনো কমেনি। মুসলমানরা বারংবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে মোঙ্গলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর সারির পর সারি হত্যা করে করে এগিয়ে চলছে।

এবার মোঙ্গলদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠলো। অহংকারের চূড়া থেকে বাস্তবতার সমতলে এসেই তারা হতবাক্, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। পলায়ন ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। অমনি রব ওঠলো 'পালাও পালাও'। কে কার আগে পালাবে, কে কার আগে প্রাণ নিয়ে বাঁচবে এবার যেনো তার প্রতিযোগিতা শুরু হলো।

মুজাহিদরা ছাড়বার পাত্র নয়। সাথে সাথে তাদের ধাওয়া করতে লাগলো। পথে পথে তাদের হত্যা করে আবার তাদের পেছনে ছুটতে লাগলো। কয়েক

মাইল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করলো।

এই তাতারী সৈন্যরা, এই মোঙ্গল সৈন্যরা রক্তপিপাসু। ধ্বংস, আগুন আর মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে খেলা করা তাদের পেশা। নির্দ্বিধায় মানুষকে হত্যা করা তাদের নেশা। কিন্তু আজ পালিয়েও তারা বাঁচতে পারলো না। অল্পসংখ্যক মোঙ্গল সৈন্য প্রাণ নিয়ে বাঁচলো। তবে তাদের অন্তরে মুজাহিদ-ভীতি এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, তারা এখন মুসলমান মুজাহিদদের নামে ভয়ে থর থর করে কাঁপে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি।

বীর মুজাহিদ সিপাহসালার রুকনুদ্দীন বাইবার্স ইরাক ও বাগদাদের লাখ লাখ মুসলমানের প্রতিশোধ যথার্থই নিতে সক্ষম হলেন। হালাকুখানের অন্তর মুজাহিদ ভীতিতে একেবারে চুপসে গেলো। সে আর পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সাহস পেলো না।

এ বিজয় মুসলিম বিজয়ের মাইলফলক, গর্বের স্মারক। দিশেহারা মুজাহিদরা এ বিজয় থেকেই বিজয়ের দিশা পেয়েছিলো। দীন ও ইসলামের জন্য প্রাণ দেয়ার দীক্ষা পেয়েছিলো।

পঞ্চান্ন.

মিসরের আইয়ুবী দাসদের হাতে মোঙ্গলরা এমন পর্যুদস্ত হলো যে, তারা আর মুসলিম বিশ্বের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস পেলো না। তাদের বিজয়-তাণ্ডব শুধু চিরতরে রুদ্ধ হয়েই গেলো না, বরং তারা মোঙ্গল রাজধানী খোরাসানের দিকেই ফিরে গেলো।

কুর্দী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী। তার পিতার নাম নাজমুদ্দীন আইয়ুব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বহু গুণে গুণান্বিত করেছিলেন– মনোবল, বাহুবল, দূরদর্শিতা, পারঙ্গমতা, রণকৌশল, বীরত্ব, সাহসিকতা ইত্যাদি সকল গুণের অপার সমাবেশ ঘটেছিলো তার ব্যক্তিত্বে। ফলে তিনি একটি সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন। একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাস তাকে আইয়ুবী সালতানাত নামে চেনে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর তার সন্তানরা সে সালতানাত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তার সপ্তম অধঃসন্তান মালিক সালেহ। তিনি দুর্দম-দুঃসাহসী ১২ হাজার দাস ক্রয় করে তাদের দ্বারা এক পদাতিক বাহিনী গঠন করলেন। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মনের মতো করে গড়লেন। ইতিমধ্যে এক যুদ্ধে তারা এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনলো, যা সবাইকে হতবাক ও বিস্মিত করলো।

ফ্রান্সের বাদশাহ যুদ্ধ জাহাজে করে বিপুল সৈন্য নিয়ে এসে মিসরের উপকূলে অবতরণ করলেন এবং অতর্কিত মিসর আক্রমণ করলেন। মালিক সালেহ সংবাদ শুনে তার দাস বাহিনীর ১২ হাজার সৈন্যকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করলেন। দাস বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলো। ফলে খৃষ্টান বাহিনীর ওপর চরম বিপর্যয় নেমে এলো। ফ্রান্সের বাদশাহ বন্দি হয়ে মিসরে নীত হলো। এ বিজয়ে গোটা মিসর আনন্দে উদ্বেলিত হলো। মালিক সালেহ'র আনন্দের সীমা রইলো না।

সুলতান দাস বাহিনীর সংখ্যা ১২ হাজারে সীমিত রাখার এক বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। যদি কোনো দাস সৈন্য আঘাত, অসুখ বা অন্য কোনো কারণে মারা যায়, তবে তার পরিবর্তে আরেকজন দাস ক্রয় করে তার স্থান পূরণ করা হয়। পরবর্তী সুলতানরাও এই পদ্ধতি বহাল রেখেছিলেন। ফলে সব সময়ই দাস বাহিনীর সংখ্যা ১২ হাজার থাকে। এরা ইতিহাসে 'আইয়ুবী দাস বাহিনী' নামে খ্যাত।

৬৫২ হিজরীতে মিসরে আইয়ুবী সালতানাতের পতন ঘটলে আইয়ুবী দাস বাহিনী মিসরের ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা তাদের মধ্য থেকে সুলতান নির্বাচনের এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা ১২ হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে ২০ জনকে নির্বাচন করে তাদেরকে সুলতান নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়। এই ২০ জন তাদের মধ্য থেকে কাউকে সুলতান নির্বাচন করতো। যিনি সুলতান নির্বাচিত হতেন, তিনি-ই রাজ্য পরিচালনায় তার সহায়তার জন্য কাউকে উজীরে আজম, কাউকে সিপাহসালার, কাউকে অর্থমন্ত্রী, কাউকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কাউকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত করে নিতেন। অন্যদেরকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করতেন। এভাবে ২০ সদস্যের এক বোর্ডের আওতায় রাজ্য পরিচালিত হতো।

এ ২০ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের সর্বপ্রথম নির্বাচিত সুলতান হলেন মালিক মুযাফ্ফর। তিনিই রুকনুদ্দীন বাইবার্সকে মোঙ্গলদের মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রুকনুদ্দীন বাইবার্স মোঙ্গলদের পরাজিত করে মিসরে ফিরে এলে তাকে বিশাল সংবর্ধনা দেয়া হলো। ৬৫৮ হিজরীতে মালিক মুযাফ্ফর নিহত হন। তারপর আইয়ুবী দাস বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যরা রুকনুদ্দীন বাইবার্সকে সুলতান নির্বাচিত করে।

রুকনুদ্দীন বাইবার্স অত্যন্ত দীনদার, পরহেজগার ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আব্বাসী বংশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ দুর্বল। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেন, তার অধীনে আব্বাসী বংশের কয়েকজন শাহজাদা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদে

অংশ নিয়েছিলো। তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জিহাদ করেছে। এ সংবাদ শোনার পরই রুকনুদ্দীন বাইবার্সের অন্তরে দারুণ ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি মিসরে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে করলেন।

২০ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের সভা আহ্বান করা হলো। বিভিন্ন আলোচনার পর আব্বাসী খেলাফতের বিষয়টি উপস্থাপিত হলো। বোর্ডের সবাই রুকনুদ্দীন বাইবার্সের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, মিসরে আব্বাসী খেলাফত কায়েম করা হবে।

সভা শেষ হওয়ার পর রুকনুদ্দীন বাইবার্স ১০ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। তাদের দায়িত্ব, তারা আব্বাসী শাহজাদাদের খুঁজে মিসরে নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তারা সংবাদ পান, আব্বাসী শাহী খান্দানের কিছু লোক শামের সীমান্তে এক পল্লীতে আত্মগোপন করে বসবাস করছে। আরো সংবাদ পেলেন, তাদের কয়েকজন শাহজাদা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছিলো। আরো খোঁজ-খবর নিয়ে এমন কিছু লোক পেয়ে গেলেন, যারা শাহজাদাদের চেনে এবং তারা কোথায় আত্মগোপন করে আছে, তারও সন্ধান জানে।

আব্বাসী শাহজাদারা নিজেদেরকে আত্মগোপন করে রাখতে চাইলো। কিন্তু তা আর হলো না। তাদের খবরাখবর চারদিক ছড়িয়ে পড়লো। তাই তারা সে পল্লী ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছে করলো। যাই-যাচ্ছি করতে করতে বেশকিছু দিন কেটে গেলো। ইতিমধ্যে মিসর সুলতানের প্রতিনিধিদল তাদের পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করলো।

সাক্ষাতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা হলো। এক উষ্ণ হৃদ্যতাময় পরিবেশ সৃষ্টি হলো। তখন প্রতিনিধিদল তাদের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো এবং সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্সের ঐকান্তিক বাসনার কথা তুলে ধরলো। কিন্তু শাহজাদারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিলো। কিছুতেই তারা আর খেলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজি হলো না। কিন্তু প্রতিনিধিদল নাছোড়বান্দা। সিদ্ধি তাদের অর্জন করতেই হবে। তারাও শাহজাদাদের ধরলো মজুবত করে। বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা, মিসরের অবস্থা, সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্সের ঐকান্তিক কামনা ও নিষ্ঠার কথা আলোচনা করে তাদের নানাভাবে বুঝালো।

অবশেষে তারা রাজি হলো। প্রতিনিধিদল তাদের নিয়ে মিসরের পথে ফিরে চললো। পূর্বেই মিসরের সুলতানকে জানানো হয়েছে। তারা মিসরে পৌঁছুলে আলেম-ওলামা, জ্ঞানী-গুণী ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদের পর্যাদাপূর্ণ অনেক লোক

তাদের সংবর্ধনা দিতে রাজধানীর বাইরে এগিয়ে এলো। তারা যখন রাজধানীতে পৌঁছলো, তখন যা ঘটলো তা অবর্ণনীয়। বিস্ময়কর সে দিনে যেনো গোটা মিসর তাদের স্বাগত জানাতে রাজধানীর পথে পথে জমায়েত হয়েছে। সকলের চোখে-মুখে আনন্দের ছড়াছড়ি, উল্লাসের অভিব্যক্তি। সবাই একনজর আব্বাসী শাহজাদাদের দেখতে চায়। তাদের নেতৃত্বে মিসরে আব্বাসী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সুলতানের বাসভবনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু কে খলীফা হবেন? আহমদ ও আহমার কেউ খলীফা হতে রাজি নয়। আহমদ বললো, আহমার খলীফা হবে আর আহমার বলে আহমদ খলীফা হবে। কয়েকদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হলো না। অবশেষে আহমদ আবুল কাসেমকে খলীফা নির্বাচিত করা হলো।

৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে খেলাফতের সর্বপ্রথম পরামর্শ সভা ডাকা হলো। সে সভায় তার উপাধি দেয়া হলো 'আল-মুস্তানসির বিল্লাহ'। জুমার দিবসে মসজিদে মসজিদে তার নামে খুতবা পাঠ করা হলো। তার দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা হলো। খেলাফতের স্থায়ীত্বের জন্য দু'আ করা হলো। অত:পর তার নামে মুদ্রা তৈরি করা হলো।

খলীফা আবুল কাসেম আল-মুস্তানসির বিল্লাহ রুকনুদ্দীন বীরসকে তার সহকারী পদে নিয়োগ দিলেন।

বাগদাদ ধ্বংসের আড়াই বৎসর পর আবার মিসরে আব্বাসী খেলাফতের অগ্রযাত্রা শুরু হলো।

তার কিছুদিন পর হাজেরা খলীফা আহমদ আবুল কাসেমের প্রাসাদে গিয়ে নাজমার বিয়ের আলোচনা তুললো। আহমদ যেনো এরই প্রতীক্ষায়ই ছিলো। সাথে সাথে আহমারকে ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করে শীঘ্রই বিয়ের আয়োজন করলো।

আজ বিয়ের দিন। নাজমাকে সুসজ্জিত করা হলো। বিয়ের সাজে সাজানো হলো। অনিন্দ্যসুন্দরী নাজমার রূপ-সৌন্দর্য যেনো হাজার গুণ বৃদ্ধি পেলো। বিয়ের অনুষ্ঠানে মিসরের আলেম-ওলামা, প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী লোকের প্রচুর সমাগম হলো। খেলাফতের উচ্চপদস্থ অনেক লোক এতে অংশগ্রহণ করলেন। পরে সবাই তাদের জন্য দু'আ করলেন।

আহমার ও নাজমার দাম্পত্যজীবন সুখের সাগরে ভেসে হেলে-দুলে চলতে লাগলো। কিন্তু এ অপার সুখের মাঝেও যেনো কোথাও একটু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। সে অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দানের জন্য নাজমা চেষ্টা শুরু করলো। খলীফা

আবুল কাসেমের নিকট হাজেরার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। খলীফা প্রস্তাব শুনে মিটিমিটি হাসলেন। এ মধুর হাসি আহমদ ভুলেই গিয়েছিলেন। আহমদের এই মধুর হাসি নাজমার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলো। সে আর কালবিলম্ব করলো না। সোজা হাজেরার নিকট চলে গেলো। হাজেরার নিকট থেকেও সে বিস্ময়কর হাসি উপহার পেলো। ফলে নির্দিষ্ট দিনে মহা-ধুমধামে খলীফা আহমদ আবুল কাসেম আল মুস্‌তাসির বিল্লাহর সাথে হাজেরার বিয়ে হলো।

নাজমার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ষোলকলায় পূর্ণ হলো। হাজেরার জীবনেও প্রাপ্তির কোনো সীমা রইলো না।

একদিন বিকালে হাজেরা নাজমার প্রাসাদে গিয়ে দেখে নাজমা নেই। বাগানে ফুল তুলতে গেছে। হাজেরা আর দেরি করলো না। গিয়ে দেখে নাজমা তন্ময় হয়ে বেলি ফুলের মালা গাঁথছে। হাজেরা পেছন থেকে ঝাপটে ধরে বললো– 'হ্যাঁ গো ভাবী! ভাইয়ার জন্য মালা তৈরি হচ্ছে বুঝি!'

নাজমা বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো। বললো, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আহমদকে তো কিছুই দেয়া হয়নি। এ ফুলের মালাটি বানিয়ে দিচ্ছি। তাই নিয়ে এখনি ওর নিকট যাও।'

ফুল বাগানে মধুর কলহাস্য ছড়িয়ে পড়লো।

[সমাপ্ত]

পরশমণি'র আরও বই

শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা উস্কে দিয়ে হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে চাইলেন আব্বাসী খেলাফতের উজিরে আজম ইবনে আলকামী। ষড়যন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করতে চাইলেন তিনি। এক পর্যায়ে বাগদাদ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন মোগল সম্রাট হালাকুখানকে। অদূরদর্শী আব্বাসী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে ভুল বুঝিয়ে সেনাসংখ্যা হ্রাস করে দেশের সামরিক শক্তি খর্ব করে হালাকুখানের বাগদাদ দখলের পথ সুগম করে দিলেন। দেশপ্রেমিক দূরদর্শী শাহজাদাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না নির্বোধ খলীফা। সামরিক শক্তি সুসংহত করে দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত রাখার পরিবর্তে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ভূত চেপে বসলো তাঁর মাথায়। দীন-ধর্ম ও আল্লাহ-রাসূলকে ভুলে নিয়ে ভোগ-বিলাসিতায় মেতে ওঠলো রাজ পরিবার ও বাগদাদবাসী। মদ-নারীতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠলেন খলীফা স্বয়ং।

কী হলো তার পরিণাম? কী পরিণতি ঘটলো ক্ষমতা পাগল বিশ্বাসঘাতক ইবনে আলকামীর? কী পরিণতি ভোগ করতে হলো অদূরদর্শী বিলাসী খলীফার? কী ভয়াবহ ধ্বংসলীলা নেমে এসেছিলো বিলাসী রাজ পরিবার ও বাগদাদের মুসলমানদের উপর? কী হলো আবুবকর-ফেরদাউস, আহমার-নাজমা ও আহমদ-হাজেরার ভালোবাসার? এসব নিয়ে রচিত হলো শ্বাসরুদ্ধকর ও রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক উপন্যাস **'পতনের ডাক'**

ISBN. 984-8754-01-6

মূল্য : ১৪০ টাকা